শ্রীগৌরাঙ্গ

প্রফুল্লকুমার সরকার

শ্রীগৌরাঙ্গ

শ্রীগৌরাঙ্গ

প্রফুল্লকুমার সরকার

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
ক লি কা তা ৯

প্রকাশক : শ্রীঅশোককুমার সরকার
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন
কলিকাতা-৯

মুদ্রক : শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন
কলিকাতা-৯

প্রথম সংস্করণ : জন্মাষ্টমী—২৭শে শ্রাবণ ১৩৪০
দ্বিতীয় সংস্করণ : রথযাত্রা—২৭শে আষাঢ় ১৩৭১

দাম : তিন টাকা

গ্রন্থকারের নিবেদন
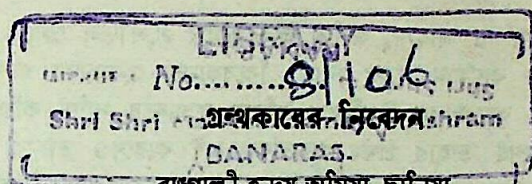
বাঙ্গালী-হৃদয়-অমিয়া ছানিয়া—
নিমাই লভেছে কায়া—

বাঙ্গালার কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এই কয়েকটি কথায় শ্রীগৌরাঙ্গের চরিত্র অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। বাস্তবিকপক্ষে, বাঙ্গালীর সভ্যতা, সাধনা ও সংস্কৃতি শ্রীগৌরাঙ্গের মধ্যে যেন মূর্তিমান হইয়া উঠিয়াছিল। তাই শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমধর্ম মানব-সভ্যতার ভান্ডারে বাঙ্গালী জাতির শ্রেষ্ঠ দান, বর্তমান ও অনাগত মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। শ্রীগৌরাঙ্গ বাঙ্গালী জাতির গর্ব ও গৌরব, আশা ও আনন্দ। গভীর দুঃখের বিষয়, সেই শ্রীগৌরাঙ্গের মহান্ জীবন ও চরিত্রের সঙ্গে শিক্ষিত বাঙ্গালীর যথার্থ পরিচয় নাই। তরুণ ও যুবকেরা তো সে সম্বন্ধে অজ্ঞ ও উদাসীন বলিলেই হয়। প্রধানতঃ তাঁহাদেরই জন্য এই ক্ষুদ্র পুস্তকে শ্রীগৌরাঙ্গের জীবন-কথা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। একদিকে কবি ভক্তের নিরঙ্কুশ কল্পনা ও অতিপ্রাকৃত বর্ণনা, অন্যদিকে শ্রদ্ধাহীন ও সংশয়াত্মার অবিশ্বাস, বিদ্রূপ ও উপেক্ষা—উভয়কেই পরিহার করিয়া ঐতিহাসিক সত্যের ভিত্তির উপরে আমি শ্রীগৌরাঙ্গের চরিত্র বর্ণনা করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। ভক্ত, সাধক, গুরু, লোকশিক্ষক, ধর্ম-প্রবর্তক মহাপুরুষ হিসাবেই তাঁহার জীবনকে আমি উপলব্ধি করিয়াছি। বলা বাহুল্য, ভক্তের শ্রদ্ধা ও ভক্তির উপরে আঘাত করিবার কোন ইচ্ছা আমার নাই, তাঁহাদের সঙ্গে আমার কোন বিরোধও নাই।

হিন্দুর ধর্ম ও সমাজ জীবনে, মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ ও তাঁহার প্রেমধর্মের স্থান অতি উচ্চে। হিন্দুর জাতীয় জীবনের এক সঙ্কটময় সন্ধিক্ষণে তাঁহার আবির্ভাব। সেই সময়ে তিনি না আসিলে ও তাঁহার প্রেমধর্ম প্রচারিত না হইলে, এতদিন বাঙ্গালা দেশে হিন্দুধর্ম ও হিন্দু জাতির কোন অস্তিত্ব থাকিত কিনা সন্দেহ। বাহ্য আচার অনুষ্ঠান, ছুঁৎমার্গ ও অস্পৃশ্যতা ব্যাধির আক্রমণে হিন্দু সমাজ যখন মুমূর্ষু—বাহিরে প্রচন্ড আঘাতে ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম—তখন মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গই প্রেমধর্মের মহীয়সী শক্তি সঞ্চার করিয়া নবজীবনের পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

'মুচি হয়ে শুচি হয় যদি কৃষ্ণ ভজে'—শ্রীগৌরাঙ্গেরই মহাবাণী। কেবল তাহাই নহে, কিরূপে হিন্দুধর্মকে জীবন্ত ও প্রচারশীল করা যায়, তাহারও পথ তিনি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। একদিকে গঞ্জাম ও দক্ষিণ ভারত, অন্যদিকে মণিপুর ও পার্বত্য আসাম পর্যন্ত, তাঁহার ধর্ম সর্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল।

বহু আদিম, অনার্য ও অহিন্দু জাতি হিন্দুধর্মের সুশীতল ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। বর্তমান যুগে স্বামী বিবেকানন্দ ও মহাত্মা গান্ধী যে অস্পৃশ্যতা বর্জন আন্দোলন উপস্থিত করিয়া যুগান্তর সৃষ্টি করিয়াছেন, মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গই তাহার প্রথম প্রবর্তক। এই কারণেও তাঁহার মহান্ জীবন ও ধর্ম প্রচারের কথা আলোচনা করা এ যুগের প্রত্যেক সমাজহিতকামীর অবশ্য কর্তব্য।

শ্রীগৌরাঙ্গের সমসাময়িক ভক্ত ও সহচরদের মধ্যেও অনেকে জগৎপাবন মহাপুরুষ। তাঁহাদের পবিত্র চরিত্রও এই গ্রন্থে যথাসম্ভব বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

প্রধানতঃ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্য-ভাগবত অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল ও স্বর্গীয় শিশিরকুমার ঘোষের 'অমিয় নিমাই চরিত' গ্রন্থের সাহায্যও স্থানে স্থানে লইয়াছি।

১৫ই আষাঢ়, ১৩৪০
কলিকাতা

বিনীত
শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার

সূচীপত্র

মহাপ্রভু ও ভক্তগণ

নবদ্বীপ

ভাগীরথীতীরে অবস্থিত নবদ্বীপ এখন নদীয়া জেলার অন্তর্গত একটি ছোট সহর, গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের তীর্থক্ষেত্ররূপে বিখ্যাত। নবদ্বীপের টোলের নামও সকলেই শুনিয়াছেন। নানা অবস্থা-বিপর্যয়ের মধ্য দিয়াও নবদ্বীপ তাহার প্রাচীন সংস্কৃত বিদ্যাশিক্ষার রীতি এখনও বজায় রাখিয়াছে। ভারতের নানা প্রদেশ হইতে এখনও বহু ছাত্র নবদ্বীপের টোলে ন্যায় পড়িবার জন্য আসে। এই ন্যায়শাস্ত্রে এখনও বাঙ্গালী ভারতের মধ্যে অপ্রাতিদ্বন্দ্বী।

কিন্তু নবদ্বীপের অতীত গৌরবের তুলনায় এ সমস্ত কিছুই নয় বলিলেই হয়। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে নবদ্বীপ বাঙ্গালার মধ্যমণি ছিল,—বিদ্যায়, ঐশ্বর্যে, গৌরবে ইহার তুল্য স্থান বাঙ্গালাদেশে তো ছিলই না, ভারতেও খুব কমই ছিল। ষোড়শ শতাব্দীর বৈষ্ণব গ্রন্থকার বৃন্দাবন দাস ঠাকুর তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে' নবদ্বীপের বর্ণনায় লিখিয়াছেন :

নবদ্বীপ সম্পত্তি কে বর্ণিবারে পারে।
এক গঙ্গাঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে॥
ত্রিবিধ বৈসে এক জাতি লক্ষ লক্ষ।
সরস্বতী প্রসাদে সবেই মহা দক্ষ॥
সবে মহা অধ্যাপক করি গর্ব ধরে।
বালকেও ভট্টাচার্য সনে কক্ষা করে॥
নানা দেশ হইতে লোক নবদ্বীপে যায়।
নবদ্বীপে পড়িলে সে বিদ্যারস পায়॥
অতএব পড়ুয়ার নাহি সমুচ্চয়।
লক্ষ কোটী অধ্যাপক নাহিক নিশ্চয়॥

এই বর্ণনায় কবিসুলভ কিছু অতিরঞ্জন থাকিলেও মোটের উপর ইহা হইতে তখনকার নবদ্বীপের ঐশ্বর্য ও গৌরব বেশ বুঝিতে পারা যায়।

নবদ্বীপ বাঙ্গালার শেষ রাজধানী। একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজা বল্লাল সেন বাঙ্গালার সিংহাসনে আরোহণ করেন। নবদ্বীপেই তাঁহার রাজধানী ছিল। বল্লাল সেনের পর তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণ সেন বাঙ্গালার রাজা হন। ইঁহারও রাজধানী নবদ্বীপেই ছিল। আবার এইখান হইতেই বাঙ্গালার স্বাধীনতা-সূর্য প্রথম অস্তমিত হয়। কিরূপে পাঠান বক্তিয়ার খিলিজী

লক্ষ্মণ সেনের নিকট হইতে বাঙ্গালা জয় করেন, তাহার শোচনীয় ইতিহাস আজ আমরা বলিব না, বলিবার স্থান এ নয়। রাজা বল্লাল সেন ও লক্ষ্মণ সেনের আর যে দোষই থাক, তাঁহারা উভয়েই পণ্ডিত ও শাস্ত্রবেত্তা ছিলেন। সুতরাং তাঁহাদের সময়েই নবদ্বীপ শ্রেষ্ঠ বিদ্যাকেন্দ্র ছিল,—বহু কবি, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত নবদ্বীপের রাজসভা অলংকৃত করিতেন। বাঙ্গালার অমর কবি জয়দেব, কবি ধোয়ী, পণ্ডিত হলায়ুধ লক্ষ্মণ সেনেরই সভাসদ ছিলেন।

কিন্তু বাঙ্গালায় হিন্দুরাজত্ব লোপের সঙ্গে সঙ্গে নবদ্বীপের এই অবস্থারও পরিবর্তন হইল। ১২০৩ খৃষ্টাব্দে বক্তিয়ার খিলিজী বাঙ্গালা জয় করেন। লক্ষ্মণ সেন রাজপরিবারবর্গ ও পাত্র মিত্র সহ নবদ্বীপ ত্যাগ করেন। তাহার পর হইতেই নবদ্বীপের দুরবস্থা আরম্ভ হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতে পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত নবদ্বীপের ইতিহাস অন্ধকারময়। অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মত নবদ্বীপে বিদ্যাচর্চা ছিল বটে, কিন্তু তাহাতে স্রোত বা তরঙ্গ ছিল না। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতে নবদ্বীপ আবার নূতন ভাবে প্রধান বিদ্যাকেন্দ্র রূপে গড়িয়া উঠে, আবার নবদ্বীপের যশঃসৌরভ চারিদিকে বিস্তীর্ণ হইতে থাকে।

যাঁহার অসাধারণ প্রতিভাবলে নবদ্বীপ আবার স্বীয় গৌরব প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হয়, সমগ্র ভারতের বিদ্বজ্জনসমাজে যাঁহার খ্যাতি ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে,—তাঁহার নাম পণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌম। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে নবদ্বীপেই তিনি জন্মগ্রহণ করেন। এই সময়ে মিথিলা পূর্ব ভারতে সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যাকেন্দ্ররূপে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। বেদ, বেদান্ত, দর্শন, স্মৃতি, ন্যায় সমস্ত বিষয়েই মিথিলার টোলে শিক্ষা দেওয়া হইত। মিথিলার অধ্যাপকদের প্রদত্ত উপাধি খুবই সম্মানজনক বলিয়া গণ্য হইত। মিথিলার পণ্ডিতেরাও তাঁহাদের এই প্রাধান্য নানা উপায়ে বজায় রাখিতে চেষ্টা করিতেন। তাঁহাদের এই একটা নিয়ম ছিল যে, ছাত্রেরা শিক্ষা শেষ করিয়া উপাধি লইয়া ফিরিয়া আসিবার সময় কোন হস্তলিখিত গ্রন্থ বা গ্রন্থের কোন অংশ বা লিখিত কোন কিছু লইয়া আসিতে পারিবে না। বলা বাহুল্য, ইহার ফলে মিথিলার বিদ্যা মিথিলাতেই থাকিয়া যাইত, তাহার বাহিরে কেহ উহার প্রচার করিতে পারিত না। মিথিলার পণ্ডিতেরা অপরাজেয় ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াই থাকিতেন। পণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌমই সর্বপ্রথম স্বীয় অসাধারণ ক্ষমতাবলে মিথিলার এই অপ্রতিদ্বন্দ্বিতা ভঙ্গ করেন।

পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মহামহোপাধ্যায় পক্ষধর মিশ্র ছিলেন মিথিলার সর্বপ্রধান পণ্ডিত ও অধ্যাপক। বাসুদেব সার্বভৌম পক্ষধর মিশ্রের নিকটেই ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে মিথিলায় যান। সর্বশ্রেষ্ঠ মেধাবী ছাত্র বলিয়া সেখানে তাঁহার খ্যাতিও হয়। কিন্তু শিক্ষা শেষ করিয়া অন্যান্য ছাত্রদের মত

কেবলমাত্র উপাধি লইয়া তিনি দেশে ফিরিলেন না। তিনি ছিলেন "শ্রুতিধর" অর্থাৎ একবার যাহা শুনিতেন তাহাই তিনি কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিতেন। তাঁহার স্মৃতিপটে গুরুদত্ত বিদ্যা সমুজ্জ্বল হইয়া থাকিত। সুতরাং বাসুদেব সার্বভৌম যখন নবদ্বীপে ফিরিলেন, তখন মিথিলার সমগ্র ন্যায়শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করিয়া লইয়া আসিলেন এবং গ্রন্থাকারে তাহা লিপিবদ্ধ করিলেন। তারপর নিজে টোল খুলিয়া সেই বিদ্যা শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তীক্ষ্ণধী বাঙ্গালী ছাত্রেরা শীঘ্রই ন্যায়শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিল। বাসুদেব সার্বভৌমের সর্বশ্রেষ্ঠ শিষ্য বিশ্ববিখ্যাত নৈয়ায়িক পণ্ডিত রঘুনাথ শিরোমণি। ইনিই বাঙ্গালার গৌরব নব্য-ন্যায়ের জন্মদাতা। তাঁহার সময় হইতে বাঙ্গালার ন্যায়-শিক্ষার্থী ছাত্রদিগকে আর মিথিলায় যাইতে হইত না। এইরূপে মিথিলার গৌরব ম্লান হইয়া গেল, বাঙ্গালার গৌরব বাড়িতে লাগিল। অন্যান্য শাস্ত্রেও নবদ্বীপের পণ্ডিতগণ খ্যাতিসম্পন্ন হইয়া উঠিলেন। যাঁহার 'ব্যবস্থা' এখনও বাঙ্গালার হিন্দুসমাজ শাসন করিতেছে, নব্য স্মৃতির প্রবর্তক সেই পণ্ডিত-শ্রেষ্ঠ স্মার্ত রঘুনন্দন এই সময়েই বর্তমান ছিলেন। তন্ত্রশাস্ত্র সংগ্রহকর্তা প্রসিদ্ধ পণ্ডিত কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশও এই সময়েরই লোক। ইঁহাদের অভ্যুদয়ে নবদ্বীপের পাণ্ডিত্য-খ্যাতি সমগ্র ভারতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

কিন্তু পাণ্ডিত্য ও ঐশ্বর্যে নবদ্বীপ বাঙ্গালার শীর্ষস্থান অধিকার করিলেও, একটি কারণে এ সবই ব্যর্থপ্রায় হইয়াছিল। নবদ্বীপের সবই ছিল, ছিল না শুধু ধর্ম, প্রেম ও ভক্তি—আর ধর্মহীন শুষ্ক জ্ঞান বা পাণ্ডিত্য কোন জাতিকে যথার্থ বড় করিতে পারে না।

নবদ্বীপের তৎকালীন অবস্থা সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য-ভাগবতকার লিখিয়াছেন :—

"রমা দৃষ্টিপাতে সর্বলোক সুখে বসে।
ব্যর্থ কাল যায় মাত্র ব্যবহার-রসে॥
কৃষ্ণরাম-ভক্তিশূন্য সকল সংসার।
প্রথম কলিতে হইল ভবিষ্য আচার॥
ধর্ম কর্ম লোক সবে এই মাত্র জানে।
মঙ্গল চণ্ডীর গীত করে জাগরণে॥
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জন।
পুত্তলি করয়ে কেহ দিয়া বহু ধন॥
ধন নষ্ট করে পুত্র কন্যার বিভায়*।
এই মত জগতের ব্যর্থ কাল যায়॥

---

* বিবাহে।

বাঙ্গালাদেশ তখন প্রায় তিন শত বৎসর মুসলমান পাঠানদের অধীনে। তাহাদের সঙ্গে সংঘর্ষে, কতক বা তাহাদের অত্যাচারে বহু হিন্দুর জাতিনাশ হইয়াছে, অনেকে ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়াছে। একটা বিজাতীয় বিলাস ও উচ্ছৃঙ্খলতা হিন্দুর সমাজ-জীবনকে আক্রমণ করিয়াছে। কিন্তু তৎকালে হিন্দুর অধঃপতনের সর্বাপেক্ষা প্রধান কারণ ছিল, তাহার উপেক্ষা এবং সহানুভূতির অভাব। একদিকে মুসলমান শাসকদের প্রলোভন, অন্যদিকে উচ্চবর্ণীয়দের প্রাণহীন আচার-ব্যবহার,—নিম্নবর্ণের প্রতি উচ্চবর্ণীয়দের এই নিষ্ঠুর ব্যবহারের ফলে নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা দলে দলে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিতে লাগিল,—হিন্দুসমাজ বিপন্ন ও ধ্বংসোন্মুখ হইয়া উঠিল।

হিন্দুসমাজের উচ্চস্তরে যখন এই শুষ্ক পাণ্ডিত্য, ধর্মহীন বিলাস ও উচ্ছৃঙ্খলতা,—নিম্নস্তরে সমাজ ছাড়িয়া ধর্মান্তর গ্রহণের প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, সেই ঘোর দুর্দিনে এমন একজন মহাপুরুষ আসিয়া নবদ্বীপে আবির্ভূত হইলেন, যিনি প্রেম ও ভক্তির বন্যায় সমগ্র দেশ প্লাবিত করিয়া দিলেন,—যাঁহার সাম্য ও মৈত্রীর উদার আদর্শে উচ্চনীচ ভেদাভেদ লুপ্ত হইয়া গেল। তিনি শিখাইলেন—

"মুচি হয়ে শুচি হয় যদি কৃষ্ণ ভজে।"

চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ।
হরিভক্তিবিহীনশ্চ ব্রাহ্মণশ্চণ্ডালাধমঃ॥*

আচণ্ডাল ব্রাহ্মণে তিনি প্রেমভক্তি বিতরণ করিলেন, যাহারা অতিহীন, দরিদ্র, অন্ত্যজ—তাহারাও তাঁহার প্রেমালিঙ্গন পাইল। সেই প্রেমের মহা-প্লাবনে সমাজে নূতন ভাব, নূতন শক্তি, নূতন মনুষ্যত্বের আদর্শ জাগরিত হইল; হিন্দুসমাজ ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা পাইল, বাঙ্গালী ভারত তথা জগতের কাছে, এক নূতন যুগের উদ্বোধন করিল।

এই যুগ-প্রবর্তক মহাপুরুষই শ্রীগৌরাঙ্গ বা শ্রীচৈতন্য। তিনি বাঙ্গালার গৌরব—ভারতের গৌরব, বিশ্বমানবের গৌরব। তাঁহারই পুণ্য জীবনের কয়েকটি কথা শুনাইবার জন্য আমরা আজ প্রবৃত্ত হইয়াছি।

---

* চণ্ডালও হরিভক্ত হইলে দ্বিজশ্রেষ্ঠ রূপে গণ্য আর হরিভক্তিহীন যে ব্রাহ্মণ সে চণ্ডালাধম।

শ্রীগৌরাঙ্গের জন্ম ও বাল্যলীলা

শ্রীগৌরাঙ্গের পূর্বপুরুষেরা নবদ্বীপবাসী ছিলেন না, তাঁহাদের আদি নিবাস ছিল শ্রীহট্ট জেলার ঢাকাদক্ষিণ গ্রামে। এই গ্রামের বৈদিক ব্রাহ্মণ উপেন্দ্র মিশ্র তাঁহার তৃতীয় পুত্র জগন্নাথ মিশ্রকে নবদ্বীপে বিদ্যাশিক্ষার জন্য পাঠাইয়া দেন।

জগন্নাথ নবদ্বীপে আসিয়া সেই সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত মহেশ্বরের টোলে অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। জগন্নাথ যেমন মেধাবী, তেমনি বিনয়ী ও সচ্চরিত্র ছিলেন। সুতরাং অল্পকাল মধ্যেই তিনি নবদ্বীপের পণ্ডিত-সমাজে সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া উঠিলেন। নীলাম্বর চক্রবর্তী নবদ্বীপের একজন সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন। জগন্নাথ পাঠ সমাপ্ত করিয়া উপাধি লাভ করিলে, নীলাম্বর চক্রবর্তী স্বীয় কন্যা শচীদেবীর সঙ্গে তাঁহার বিবাহ দিলেন এবং নীলাম্বরের অনুরোধেই জগন্নাথ নবদ্বীপে গৃহ নির্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

জগন্নাথ মিশ্র ও শচীদেবীর ক্রমে ক্রমে আটটি সন্তান হইয়া মারা যায়। নবম সন্তান পুত্র—নাম বিশ্বরূপ। বিশ্বরূপের জন্মের বার বৎসর পরে শচীদেবী আর একটি পুত্র প্রসব করিলেন। ইনিই বিশ্ববিখ্যাত শ্রীগৌরাঙ্গ। ১৪০৭ শকাব্দা ফাল্গুন মাসে বা ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে শ্রীগৌরাঙ্গ ভূমিষ্ঠ হন। সন্ধ্যাকাল—পূর্ণিমা তিথি, আকাশে চন্দ্রগ্রহণ লাগিয়াছে। গ্রহণের জন্য লক্ষ লক্ষ লোক গঙ্গাস্নান ও উচ্চকণ্ঠে হরিধ্বনি করিতেছে। সকলেরই মন হর্ষোৎফুল্ল,—আকাশ, বাতাস, দিক সকল প্রসন্ন। চারিদিকে এই আনন্দ উল্লাস ও হরিধ্বনির মধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গ ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন। চৈতন্যচরিতামৃতকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী এই সময়ের বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন :—

> অকলঙ্ক গৌরচন্দ্র দিলা দরশন।
> সকলঙ্ক চন্দ্রে আর কোন প্রয়োজন॥
> এত জানি রাহু কৈল চন্দ্রের গ্রহণ।
> কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরি নামে ভাসে ত্রিভুবন॥
> জগৎ ভরিয়া লোকে বলে হরি হরি।
> সেইক্ষণে গৌর কৃষ্ণ ভূমে অবতরি॥

প্রসন্ন হইল সর্বজগতের মন।
হরি বলি হিন্দুকে হাস্য করয়ে যবন॥
প্রসন্ন হইল দশদিক্ প্রসন্ন নদীর জল।
স্থাবর জঙ্গম হৈল আনন্দে বিহ্বল॥

অপূর্ব সুন্দর শিশু। তপ্ত কাঞ্চনের মত তাঁহার দেহের দ্যুতি, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সর্বসুলক্ষণাক্রান্ত। প্রতিবাসীরা দলে দলে আসিয়া সেই পরম সুন্দর শিশু দেখিয়া হৃষ্ট হইলেন। নারীরা শিশুকে দেখিয়া স্নেহে বিগলিত হইয়া আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন। শান্তিপুরের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও সমাজপতি অদ্বৈতাচার্যের গৃহিণী সীতাদেবী শিশুর জন্মের সংবাদ পাইয়া স্বয়ং দোলায় চড়িয়া নানা উপহার সহ আগমন করিলেন, যথা :—

সুবর্ণের কড়ি বৌলি রজত মুদ্রা পাশুলি
সুবর্ণের অঙ্গদ কঙ্কণ।
দুবাহুতে দিব্য শঙ্খ রজতের মলবঙ্ক
স্বর্ণমুদ্রা নানা হারগণ॥
ব্যাঘ্রনখ হেমজড়ি কটি পট্টসূত্র ডোরী
হস্তপদের যত আভরণ।
চিত্রবর্ণ পট্টশাড়ী ভুনিফোতা পট্টশাড়ী
স্বর্ণ রৌপ্য মুদ্রা বহু ধন॥
দূর্বাধান্য গোরোচন হরিদ্রা কুঙ্কুম চন্দন
মঙ্গলদ্রব্য পাত্রেতে ভরিয়া।
বস্ত্রগুপ্ত দোলা চড়ি সঙ্গে লঞা দাসী চেড়ী
বস্ত্রালঙ্কার পেটারী ভরিয়া॥*—(চরিতামৃত)

সীতাদেবী শিশুকে দেখিয়া পরম আনন্দিত হইলেন এবং তাঁহাকে ধান-দূর্বা দিয়া 'চিরজীবী হও' বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন। জগন্নাথ মিশ্র পুত্রজন্মে আনন্দিত হইয়া ব্রাহ্মণ সজ্জন ও দরিদ্রদিগকে বহু দান করিলেন। নর্তক, গায়ক, ভাট প্রভৃতিও বঞ্চিত হইল না।

শিশুর মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্তী জ্যোতিষশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন।

---

* সুবর্ণের কড়ি বৌলি—সুবর্ণ নির্মিত কণ্ঠের অলঙ্কার। রজত মুদ্রা পাশুলী—রূপার মুদ্রা সমূহ একত্র গাঁথিয়া যে হার তৈয়ারী হইয়াছে। অঙ্গদ—তাড়ু। রজতের মলবঙ্ক—রূপার বাঁকা মল। স্বর্ণমুদ্রা—সোনার মুদ্রা বা অঙ্গুরী। ব্যাঘ্রনখ হেমজড়ি—সুবর্ণজড়িত বাঘনখ, সেকালে ইহা বালকদের কাণের অলঙ্কার রূপে ব্যবহৃত হইত। কটি............ডোরী—কোমরে পরিবার জন্য রেশমের সূতা। চিত্রবর্ণ পট্টশাড়ী—বহু বিচিত্রবর্ণযুক্ত রেশমের শাড়ী। ভুনিফোতা পট্টশাড়ী—রেশমের পাড়যুক্ত ভুনিফোতার চাদর, উৎকৃষ্ট সূক্ষ্ম চাদর (অল্পদিন পূর্বেও বাঙ্গালাদেশে প্রস্তুত ও ব্যবহৃত হইত)।

তিনি শিশুর জন্মলগ্ন, রাশি ও লক্ষণ বিচার করিয়া বলিলেন, এ শিশু কালে মহাপুরুষ হইবে ও জগৎ উদ্ধার করিবে। নীলাম্বর চক্রবর্তীর এই ভবিষ্যৎ-বাণী যে পরবর্তী কালে অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইয়াছিল, তাহা কে অস্বীকার করিবে?

* * * *

মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্তী শিশুর নাম রাখিয়াছিলেন 'বিশ্বম্ভর'। কিন্তু পিতামাতা ও পাড়াপ্রতিবাসী সকলেই তাঁহাকে 'নিমাই' বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিমাই অত্যন্ত দুরন্ত হইয়া উঠিলেন। দুষ্টামিতে তিনি ছিলেন পাড়ার ছেলেদের সর্দার। প্রায়ই একদল বালক জোটাইয়া তিনি নানা স্থানে উপদ্রব করিয়া বেড়াইতেন। পাড়াপড়শীদের বাড়ী হইতে খাবার চুরি করিয়া খাইতেন। অন্য বালকদের উপর মারধরও করিতেন। পাড়া-প্রতিবাসীরা ইহা লইয়া শচীদেবীর নিকট স্বভাবতঃই নালিশ করিতেন। ফলে শচীদেবী অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া নিমাইকে কঠোর তিরস্কার করিতেন। নিমাই ক্রুদ্ধ হইয়া ঘরে ঢুকিয়া বাসনপত্র ভাঙিয়া উপদ্রব করিতেন।

গঙ্গার ঘাটে এক দল বালকের সঙ্গে স্নান করিতে যাইয়া লোকের উপর দৌরাত্ম্য করা নিমাইয়ের একটা নিত্য কর্মের মধ্যে ছিল। লোকের পূজার দ্রব্য, নৈবেদ্য প্রভৃতি গোপনে সরাইয়া ফেলা, স্নানার্থী স্ত্রী-পুরুষের কাপড় বদল করা, কেহ স্নান করিয়া উপরে উঠিলে, তাহার গায়ে জল ছিটান, এই সব কার্যে নিমাই ও তাঁহার সঙ্গীদের বিশেষ উৎসাহ ছিল। যে সব বালিকারা গঙ্গার ঘাটে বসিয়া শিবপূজা করিত, তাহাদের উপর নিমাইয়ের উপদ্রবের পরিমাণটা কিছু বেশী হইত। তাহাদের নিকট যাইয়া তিনি বলিতেন, "শিবপূজা করিয়া কি হইবে, তাহার বদলে আমাকেই পূজা কর, আমি বর দিব।" কুমারীদের দেবপূজার মালা লইয়া নিজে গলায় পরিতেন, নৈবেদ্যের চাল-কলা সন্দেশ প্রভৃতি খাইয়া ফেলিতেন। কুমারীরা ক্রুদ্ধ হইয়া তিরস্কার করিত, নিমাই কিছু মাত্র অপ্রতিভ না হইয়া হাসিতেন। কখনও বা কাহারও উপর প্রসন্ন হইয়া বর দিতেন,—"তোমার পণ্ডিত, রূপবান্, ধনবান্ স্বামী হোক",—যাহার উপর বিরক্ত হইতেন, তাহাকে বলিতেন "তোমার বুড়া বর হোক, আর অনেকগুলি 'সতীন' হোক।"। বালিকাদের মধ্যে বল্লভ আচার্যের কন্যা লক্ষ্মীদেবী নিমাইয়ের উপদ্রব শান্তভাবে সহ্য করিতেন, এইজন্য নিমাই তাঁহার উপর বিশেষ প্রসন্ন ছিলেন।

একদিন লোকের অনুযোগে ক্রুদ্ধ হইয়া শচীদেবী পুত্রকে ধরিয়া প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন। নিমাই পলাইয়া উচ্ছিষ্ট হাঁড়ি ফেলিবার গর্তের মধ্যে

গিয়া বসিয়া রহিলেন। অবশেষে শচীদেবী ক্ষোভে দুঃখে কাঁদিতে আরম্ভ করিলে, নিমাই মাতার দুঃখ দেখিয়া উঠিয়া স্নান করিয়া আসিলেন।

আর একদিন স্নানার্থী প্রতিবাসী ও কুমারীগণের নিকট গঙ্গার ঘাটে পুত্রের দুরন্তপনার কথা শুনিয়া পিতা জগন্নাথ মিশ্র বিষম ক্রুদ্ধ হইলেন এবং একগাছা লাঠি হাতে লইয়া নিমাইকে শাস্তি দিবার জন্য ঘাটের দিকে চলিলেন। চতুর নিমাই পূর্ব হইতে এই সংবাদ পাইয়া জল হইতে উঠিয়া অন্য পথে একেবারে বাড়ীতে গিয়া হাজির। তাঁহার হাতে পুঁথি, গায়ে কালির চিহ্ন, স্নানের কোন লক্ষণ নাই। মাতা দেখিয়া আশ্চর্য হইলেন, ভাবিলেন—প্রতিবাসীরা কি নিমাইয়ের নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়াছে? এদিকে জগন্নাথ মিশ্র গঙ্গার ঘাটে গিয়া দেখিলেন, নিমাই সেখানে নাই। সঙ্গী বালকগণ পূর্ব শিক্ষামত কহিল, নিমাই আজ স্নান করিতে আসে নাই, পাঠশালা হইতে বাড়ী ফিরিয়া গিয়াছে। জগন্নাথ মিশ্র অপ্রতিভ ভাবে বাড়ী আসিয়া দেখিলেন, নিমাই দিব্য ভাল মানুষের মত সবেমাত্র স্নান করিতে যাইতেছে। জগন্নাথ মিশ্র পুত্রকে প্রহার করিতে পারিলেন না, বরং তাঁহাকে কোলে করিয়া আদর করিয়া চুমা খাইলেন।

এইরূপে নানা দুরন্তপনা করিয়া নিমাইয়ের শৈশব কাটিতে লাগিল, পঞ্চম বর্ষ বয়সে জগন্নাথ মিশ্র পুত্রের হাতে খড়ি দিয়া তাঁহার বিদ্যারম্ভ করাইলেন।

৩

শ্রীগৌরাঙ্গের বিদ্যাশিক্ষা ও প্রথম বিবাহ

শৈশবে দুরন্তপনায় নিমাই যেমন অদ্বিতীয় ছিলেন,—বিদ্যারম্ভ করিয়াও তিনি তেমনি অসাধারণ প্রতিভা ও তীক্ষ্নবুদ্ধির পরিচয় দিতে লাগিলেন। অতি অল্পকালের মধ্যেই তিনি বর্ণপাঠ সাঙ্গ করিয়া উচ্চতর বিষয় অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু তাঁহার বালসুলভ চাঞ্চল্য ও উপদ্রব কিছুমাত্র কমিল না, বরং তাহা আরও বৃদ্ধি পাইল। ছেলের দলের সঙ্গে মিশিয়া পূর্বের মতই তিনি নবদ্বীপ তোলপাড় করিয়া বেড়াইতেন। পিতামাতাকে দেখিয়া তিনি বড় একটা ভয় করিতেন না, তাঁহাদের তাড়না ও ভর্ৎসনা অম্লানবদনে হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন। নিমাই সত্যকার ভয় ও সম্ভ্রম করিতেন, একমাত্র তাঁহার অগ্রজ বিশ্বরূপকে। বিশ্বরূপ বাল্যকাল হইতে গম্ভীরপ্রকৃতির ছিলেন, অল্পবয়সেই তিনি নানা শাস্ত্র পড়িয়া পরম পণ্ডিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কেবল শুষ্ক পণ্ডিত ছিলেন না, কৈশোরেই ভগবানে ভক্তি ও প্রেম লাভ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণকথা কৃষ্ণনাম লইয়াই তিনি থাকিতেন। অদ্বৈতাচার্যের সভায় যাইয়া ভক্তিশাস্ত্রের আলোচনায় যোগ দিতেন। প্রভাতে স্নান করিয়াই তিনি অদ্বৈতাচার্যের গৃহে যাইতেন এবং বেলা দ্বিপ্রহর পর্যন্ত বৈষ্ণব ভক্তদের সঙ্গে শাস্ত্রালোচনায় সময় কাটাইতেন। কোন কোন দিন আলোচনায় এমনই তন্ময় হইয়া উঠিতেন যে, আহারের কথা ভুলিয়া যাইতেন। শচীদেবী রন্ধন করিয়া বসিয়া থাকিতেন, অবশেষে বিশ্বরূপকে ডাকিবার জন্য নিমাইকে পাঠাইয়া দিতেন। নগ্নদেহ বালক নিমাই দাদাকে ডাকিয়া আনিবার জন্য যখন অদ্বৈতাচার্যের গৃহে গিয়া দাঁড়াইতেন, তখন তাঁহার অনুপম রূপ-মাধুরী দেখিয়া বৈষ্ণবমণ্ডলী মুগ্ধ ও পুলকিত হইতেন।

বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন :—

প্রতি অঙ্গে নিরুপম লাবণ্যের সীমা।
কোটি চন্দ্র নহে এক নখের উপমা॥
দিগম্বর সর্ব অঙ্গ ধূলায় ধূসর।
হাসিয়া অগ্রজ প্রতি করেন উত্তর॥
ভোজনে আইস ভাই, ডাকয়ে জননী।
অগ্রজ বসন ধরি চলয়ে আপনি॥
দেখি সে মোহনরূপ সর্বভক্তগণ।
চকিত হইয়া সবে করে নিরীক্ষণ॥

এই শিশুই যে এককালে বৈষ্ণবধর্মের শ্রেষ্ঠ প্রবর্তক হইবেন, কে তখন তাহা কল্পনা করিয়াছিল?

নিমাই যেমন দাদা বিশ্বরূপকে ভয় ও সম্ভ্রম করিতেন, বিশ্বরূপও তেমনি ছোট ভাইকে প্রাণতুল্য ভালবাসিতেন। কিন্তু এহেন অগ্রজের সংগ-সুখ লাভ বেশী দিন নিমাইয়ের ভাগ্যে ঘটে নাই—বিশ্বরূপ ভক্তিশাস্ত্র চর্চা করিতে করিতে শীঘ্রই সংসারের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং একদিন রাত্রে গোপনে সন্ন্যাসী হইয়া গৃহত্যাগ করিলেন। অদ্বৈতাচার্য ও তাঁহার বৈষ্ণবমণ্ডলী, নবদ্বীপবাসী সকলে দুঃখিত ও মর্মাহত হইলেন। জগন্নাথ মিশ্র ও শচীদেবী উপযুক্ত পুত্রের গৃহত্যাগে একেবারে ভাঙিয়া পড়িলেন। নিমাই বয়সে বালক হইলেও পিতামাতাকে বুঝাইয়া সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন,—বলিলেন, "দাদা সন্ন্যাস লইয়াছেন, আমি তো আছি। আমিই দাদার হইয়া তোমাদের দুই জনের সেবা করিব।" বলা বাহুল্য, ইহাতে পিতামাতার মন প্রবোধ মানিল না। নিমাই চপলতা পরিত্যাগ করিয়া পড়াশুনাতে বেশী করিয়া মন দিলেন, খেলাধুলা ছাড়িয়া গৃহে বসিয়া সব সময়ে অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন, সংগী বালকেরা নানারূপ প্রলোভন দেখাইলেও, তিনি আর তাহাদের সংগে মিশিয়া দুরন্তপনা করিয়া বেড়াইতেন না। শচীদেবী পুত্রের স্বভাবের এই পরিবর্তন দেখিয়া বিস্মিত ও আনন্দিত হইলেন।

কিন্তু জগন্নাথ মিশ্রের মন শান্ত হইল না। তিনি ভাবিলেন, বেশী পড়াশুনা করিলে, নিমাই হয়ত তত্ত্বজ্ঞানী হইয়া বিশ্বরূপের মতই সন্ন্যাস লইয়া গৃহত্যাগ করিবে। তিনি নিমাইয়ের পড়াশুনা বন্ধ করিয়া দিলেন। শচীদেবী পুত্রকে মূর্খ করিয়া রাখিবার এই অন্যায় ব্যবস্থায় ঘোরতর আপত্তি করিলেন, কিন্তু জগন্নাথ মিশ্রের মতের পরিবর্তন হইল না।

বালক নিমাই মুখে পিতার আদেশের প্রতিবাদ করিলেন না বটে, কিন্তু মনে মনে তিনি অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া উঠিলেন। তাঁহার চপলতা পুনরায় বৃদ্ধি পাইল, দুষ্ট বালকদের সংগে মিশিয়া আবার তিনি সর্বত্র উপদ্রব করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। পাড়া-প্রতিবাসীরা নিমাই ও তাঁহার সংগীদের দৌরাত্ম্যে পুনরায় অস্থির হইয়া উঠিলেন। শচীদেবী পুত্রকে অনেক বুঝাইয়া শান্ত করিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু নিমাই উত্তর দিতেন,—আমাকে মূর্খ করিয়া ঘরে বসাইয়া রাখিয়াছ, মূর্খ পুত্রের নিকট তোমরা ইহা ছাড়া আর কি প্রত্যাশা কর?

শচীদেবী জগন্নাথ মিশ্রকে এই কথা জানাইলেন। বন্ধু-বান্ধবেরাও একথা শুনিয়া জগন্নাথ মিশ্রের নিন্দা করিতে লাগিলেন। অবশেষে জগন্নাথ মিশ্র আবার নিমাইয়ের বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করিলেন।

নিমাই এতদিন গৃহে বসিয়া লেখাপড়া করিতেন। এইবার গংগাদাস

পণ্ডিতের টোলে ভর্তি হইলেন। গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নবদ্বীপে খুব খ্যাতি, ব্যাকরণ ও শব্দশাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। নানা স্থান হইতে ছাত্রেরা নবদ্বীপে তাঁহার টোলে ব্যাকরণ পড়িতে আসিত। পরম পণ্ডিত ও বৈয়াকরণ গঙ্গাদাসের টোলে প্রবেশ করিয়া নিমাই একান্ত মনোযোগ সহকারে বিদ্যাভ্যাস করিতে লাগিলেন, অসাধারণ ধীশক্তিবলে অল্পকাল মধ্যেই ছাত্রদের মধ্যে প্রধান স্থান গ্রহণ করিলেন এবং গুরুর অতি প্রিয়পাত্র হইলেন। এই সময়ে সমস্ত খেলাধূলা ভুলিয়া নিমাই অধ্যয়নেই ডুবিয়া গেলেন। বাড়ীতে যতক্ষণ থাকিতেন, এক মুহূর্তও তিনি পুস্তক ছাড়িতেন না, গঙ্গার ঘাটে গিয়াও সহাধ্যায়ীদের সঙ্গে শাস্ত্রালোচনা করিতেন। টোলে বসিয়াও তিনি অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে শাস্ত্র বিচার করিতেন। গুরু গঙ্গাদাস তাঁহার অসাধারণ ধীশক্তি দেখিয়া মুগ্ধ ও চমৎকৃত হইতেন। নিমাইয়ের সঙ্গে কোন ছাত্রই তর্কে পারিত না, সকলের ব্যাখ্যা খণ্ডন করিয়া তিনি স্বমত স্থাপন করিতেন। বৃন্দাবনদাস ঠাকুর তাঁহার বিদ্যাভ্যাসের বর্ণনায় লিখিয়াছেন :—

না ছাড়েন শ্রীহস্তে পুস্তক এক ক্ষণ।
পড়েন গোষ্ঠীতে যেন প্রত্যক্ষ মদন॥
ললাটে শোভয়ে ঊর্ধ্ব তিলক সুন্দর।
শিরে শ্রী চাঁচর কেশ সর্ব মনোহর॥
স্কন্ধে উপবীত ব্রহ্মতেজ মূর্তিমন্ত।
হাস্যময় শ্রীমুখ প্রসন্ন দিব্য দন্ত॥
কিবা সে অদ্ভুত দুই কমল নয়ন।
কিবা সে অদ্ভুত শোভে ত্রিকচ্ছ বসন॥
যেই দেখে সেই এক দৃষ্টে রূপ চায়।
হেন নাহি ধন্য ধন্য বলি যে না যায়॥
হেন সে অদ্ভুত ব্যাখ্যা করেন ঠাকুর।
শুনিয়া গুরুর হয় সন্তোষ প্রচুর॥
সকল সভার মধ্যে আপনে ধরিয়া।
বসায়েন গুরু সর্বপ্রধান করিয়া॥
গুরু বলে বাপ তুমি মন দিয়া পড়।
ভট্টাচার্য হৈবা তুমি বলিলাম দঢ়॥
প্রভু বলে তুমি আশীর্বাদ কর যারে।
ভট্টাচার্য পদ কোন দুর্লভ তাহারে॥

এইরূপে নিমাই আনন্দে বিদ্যাশিক্ষা করিতে লাগিলেন। কয়েক বৎসর পরে জগন্নাথ মিশ্র পরলোক গমন করিলেন। নিমাই প্রথমতঃ পিতৃশোকে

বিহ্বল হইলেন। কিন্তু তিনি মাতার একমাত্র পুত্র; শোকাকুলা জননীর মুখ চাহিয়া শীঘ্রই তাঁহাকে নিজের শোক সংযত করিতে হইল।

কিছুকাল পরে শচীদেবী পুত্রকে বিবাহ দিয়া সংসারী করিতে ইচ্ছুক হইলেন। জ্যেষ্ঠপুত্র বিশ্বরূপ গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন,—সেই কারণেই তিনি কনিষ্ঠ নিমাইয়ের বিবাহ দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। নবদ্বীপবাসী সুব্রাহ্মণ বল্লভাচার্যের কন্যা লক্ষ্মীদেবীকে শচীদেবী পুত্রবধূ করিতে মনস্থ করিলেন। নিমাই বাল্যকাল হইতেই লক্ষ্মীকে চিনিতেন, উভয়ের মধ্যে প্রীতির ভাবও জন্মিয়াছিল। নিমাইও এই বিবাহে আপত্তি করিলেন না। মহাসমারোহে লক্ষ্মীর সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হইয়া গেল। পুত্রবধূ পাইয়া শচীদেবীও পরম আনন্দিতা হইলেন।
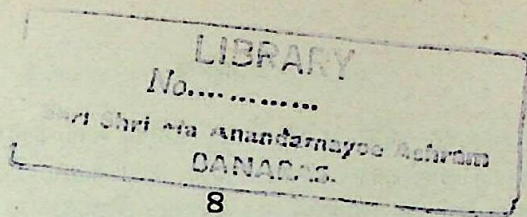
শ্রীগৌরাঙ্গের বিদ্যাবিলাস ও গৃহধর্ম

এইরূপে শ্রীগৌরাঙ্গ বিবাহ করিয়া সংসারী হইলেন এবং গৃহ-ধর্ম পালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার বয়স এই সময় ১৮ বৎসরের বেশী হয় নাই। কিন্তু এই অল্প বয়সেই তিনি গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলের পাঠ সমাপন করিয়াছিলেন। ব্যাকরণ ও শব্দশাস্ত্রে তিনি প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোল ছাড়িয়া নিজেই একটি টোল খুলিয়া ছাত্র পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। মুকুন্দসঞ্জয় নামে জনৈক ধনী ব্যক্তি এই সময়ে নবদ্বীপে ছিলেন। তিনি খুব বিদ্যানুরাগী এবং তাঁহার গৃহ পণ্ডিতসমাজের প্রধান মিলনক্ষেত্র ছিল। মুকুন্দসঞ্জয় তরুণ অধ্যাপক শ্রীগৌরাঙ্গের টোলের জন্য নিজের বহির্বাটীর এক অংশ ছাড়িয়া দিলেন। অধ্যাপনাতেও তরুণ "নিমাই পণ্ডিত" শীঘ্রই যশস্বী হইয়া উঠিলেন। অধ্যাপক হইয়াও কিন্তু তাঁহার চাপল্য ও পরিহাস-প্রিয়তা দূরীভূত হইল না। তিনি এখন শিষ্যবৃন্দ পরিবেষ্টিত হইয়া নবদ্বীপে বিচরণ করিতে লাগিলেন। সুযোগ পাইলেই তিনি পণ্ডিতদের সঙ্গে তর্ক করিতেন। বিচারে তাঁহার সঙ্গে কেহ আঁটিয়া উঠিতে পারিত না। 'ফাঁকি'* জিজ্ঞাসা করিতে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন এবং তাঁহার 'ফাঁকির' পাল্লায় পড়িয়া তরুণ পণ্ডিতেরা, এমন কি অনেক প্রবীণও হতবুদ্ধি হইয়া পড়িতেন। সেইজন্য তাঁহাকে দেখিয়া অনেকে 'ফাঁকির' ভয়ে পাশ কাটিয়া সরিয়া পড়িতেন। সন্ধ্যাকালে তিনি শিষ্যবৃন্দ লইয়া গঙ্গার ঘাটে সভা করিয়া জাঁকিয়া বসিতেন। আরও অনেক পণ্ডিত ও ছাত্র প্রভৃতি আসিয়া সেখানে জুটিতেন। ঘোর তর্কবিতর্ক ও আলোচনা চলিত। সকলেই তরুণ নিমাই পণ্ডিতের তীক্ষ্ন মেধা, পাণ্ডিত্য ও তর্কশক্তি দেখিয়া চমৎকৃত হইত।

পরবর্তীকালে যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গের পরম ভক্ত ও সহকর্মী হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার বন্ধু ছিলেন এবং তাঁহাদের সঙ্গে তাঁহার প্রায়ই খিটিমিটি বাধিত ও তর্কের লড়াই চলিত। ইহাদের মধ্যে একজন ছিলেন মুকুন্দ। মুকুন্দ অলঙ্কারশাস্ত্রে পরম পণ্ডিত ও কৃষ্ণভক্ত। কীর্তনেও তিনি সুদক্ষ ছিলেন। অদ্বৈত আচার্যের গৃহে বৈষ্ণব সভায় তিনি প্রায়ই গান করিতেন। মুকুন্দকে শ্রীগৌরাঙ্গ মনে মনে ভালবাসিতেন, কিন্তু বাহিরে সে ভাব দেখাইতেন না। পথে ঘাটে মুকুন্দের সঙ্গে দেখা হইলেই তাঁহাকে 'ফাঁকি'

---

* শাস্ত্রের কূট প্রশ্ন। "ন্যায়ের ফাঁকি" ন্যায়শাস্ত্র সম্বন্ধে জটিল কূট প্রশ্ন। টোলে এখনও এই সব "ফাঁকি" চলিয়া থাকে।

জিজ্ঞাসা করিতেন, পাঁজি, বৃত্তি, টীকা ইত্যাদির নানা প্রশ্ন তুলিয়া তাঁহাকে বিব্রত করিয়া তুলিতেন। মুকুন্দ নিরীহ, ভাল মানুষ, শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গে তর্কে তিনি জিতিতে পারিতেন না। অবশেষে শ্রীগৌরাঙ্গকে দেখিলেই তিনি অন্য পথ দিয়া পলাইতেন। শ্রীগৌরাঙ্গ হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে বলিতেন, "ওহে বৈষ্ণব, পলাইয়া তুমি আমাকে এড়াইতে পারিবে না। আমিও একদিন এমন মস্ত বড় বৈষ্ণব হইব যে, তোমাকে আমার কাছে আসিতেই হইবে।"

মুরারি গুপ্ত জাতিতে বৈদ্য, টোলের পাঠ সমাপ্ত করিয়া আয়ুর্বেদের চর্চা করিতেন। শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহাকে দেখিলেই বিদ্রূপ করিয়া বলিতেন—"ওহে মুরারি, তুমি কবিরাজ; লতাপাতা ঘাঁটাই তোমার পেশা, শাস্ত্রের তুমি কি জান?" মুরারি গুপ্ত এই কথায় বিষম চটিয়া যাইতেন এবং শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গে শাস্ত্রের তর্কে প্রবৃত্ত হইতেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত জিতিতে পারিতেন না।

শ্রীবাস পণ্ডিত বয়সে প্রবীণ এবং পরম বৈষ্ণব ছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গকে তিনি খুব ভালবাসিতেন, কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহাকে দেখিলেই 'ফাঁকি' জিজ্ঞাসা করিতে ছাড়িতেন না। শ্রীবাস হাসিয়া বলিতেন—"ওহে উদ্ধতের শিরোমণি, তোমার কি কোন কালেই বুদ্ধিশুদ্ধি হইবে না? তুমি এখন অধ্যাপক হইয়াছ, এখন এসব চাপল্য তোমার শোভা পায় না।" শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবাস পণ্ডিতের কথায় কিছুমাত্র লজ্জিত বা অপ্রতিভ হইতেন না।

গদাধর ন্যায় পড়িতেন, ন্যায়শাস্ত্রে তিনি পাণ্ডিত্যলাভও করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহাকে দেখিলেই নানারূপ 'ফাঁকি' জিজ্ঞাসা করিতেন। গদাধর প্রত্যুত্তরে বলিতেন, "ওহে নিমাই, তুমি তো ব্যাকরণের পণ্ডিত, ন্যায়ের কি জান যে, আমার সঙ্গে তর্ক করিতে চাও?" কিন্তু শেষ পর্যন্ত গদাধরকে তর্ক করিতে হইত এবং তর্কে তিনি হারিয়া যাইতেন।

বৈষ্ণব ভক্তদের দেখিলে শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহাদিগকে নানারূপ পরিহাস করিতেন। তাঁহারা উত্যক্ত হইয়া পাল্টা জবাব দিতেন,—"এত বয়স হইল, তবুও তোমার চাপল্য দূর হইল না, পণ্ডিত! এই ভাবে শুধু পাণ্ডিত্যে বৃথা সময়ক্ষেপ না করিয়া তুমি যদি কৃষ্ণভক্তিতে মন দিতে, তাহা হইলে তোমার ভাল হইত।" শ্রীগৌরাঙ্গ রহস্য করিয়া বলিতেন, "আমারও ইচ্ছা যে, কিছুদিন অধ্যাপনা করিয়া, অবশেষে ভাল বৈষ্ণবের কাছে বৈষ্ণব ধর্ম শিক্ষা করিব।" তখন কে জানিত, তাঁহার এই রহস্যই এক দিন জীবনের বাস্তব সত্যে পরিণত হইবে?

শ্রীগৌরাঙ্গ বাহিরে এইরূপ চপল, উদ্ধত ও পরিহাসপ্রিয় হইলেও, তাঁহার প্রবৃত্তিতে এমন এক মধুর গুণ ছিল যে, সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিত, সকলেরই চিত্ত তিনি আকর্ষণ করিতেন। নবদ্বীপের আপামর সাধারণের তিনি প্রিয় ছিলেন, উচ্চ নীচ সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গেই তিনি অবাধে মিশিতেন।

আভিজাত্য গর্ব বলিয়া কিছু তাঁহার ছিল না। এক দিন হয়ত তন্তুবায়দের গৃহেই উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"ভাল কাপড় কি আছে দাও দেখি।" তন্তুবায় শ্রীগৌরাঙ্গকে দেখিয়া মুগ্ধ, আস্তেব্যস্তে ভাল ভাল কাপড় আনিয়া হাজির করিল। শ্রীগৌরাঙ্গ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কাপড়ের কত মূল্য চাও, বল?" তন্তুবায় সানন্দে কহিল,—তোমার যে মূল্য ইচ্ছা দিও, আর এখনই দাম দিতে হইবে না, কয়েক পক্ষ পরে দিলেও চলিবে।

তন্তুবায়ের ঘর হইতে শ্রীগৌরাঙ্গ গোপগৃহে গেলেন। তাহারাও তাঁহাকে দেখিয়া মহা সন্তুষ্ট হইয়া উত্তম দুগ্ধ, দধি প্রভৃতি উপহার দিল। সেখান হইতে গন্ধবণিক (গন্ধদ্রব্যবিক্রেতা), শঙ্খবণিক, মালাকার, তাম্বূলী প্রভৃতির গৃহেও শ্রীগৌরাঙ্গ যাইতেন এবং তাহারাও তাঁহাকে সম্মান করিয়া, স্ব স্ব উপহার দ্রব্য দিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইত।

এই প্রসঙ্গে শ্রীধরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শ্রীধর পণ্ডিতও কৃষ্ণভক্ত, শান্ত, নিরহঙ্কার। তাঁহার প্রকৃতি বড়ই মধুর। কিন্তু তিনি বড় দরিদ্র ছিলেন, কলার খোলা, থোড়, মোচা ইত্যাদি বিক্রয় করিয়া জীবিকানির্বাহ করিতেন। এইজন্য সকলে তাঁহাকে "খোলা-বেচা শ্রীধর" বলিত। এই খোলা-বেচা শ্রীধরের সঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গের বড়ই প্রীতি ছিল। তিনি কোন না কোন ছলে তাঁহার গৃহে প্রত্যহ একবার যাইতেন এবং নানারূপে তাঁহার উপর উপদ্রব করিতেন। শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীধরকে পরিহাস করিয়া বলিতেন,—"ওহে শ্রীধর, তুমি সর্বদা মুখে "হরি হরি" বল, লক্ষ্মীকান্তের পূজা কর, তবু তোমার এত দারিদ্র্য কেন?"

শ্রীধর উত্তর দিতেন—কই আমার তো কোন দুঃখ বা অভাব নাই, খোলা বেচিয়া যাহা পাই, তাহাতেই আমার দিন বেশ চলে।

শ্রীগৌরাঙ্গ—নিশ্চয়ই তোমার অনেক টাকা পোতা আছে, তুমি লুকাইয়া তাহা ভোগ কর।

শ্রীধর—ঠাকুর, তুমি এখন বাড়ী যাও, আমার সঙ্গে এরূপ কলহ করা তোমার উচিত হয় না।

শ্রীগৌরাঙ্গ—বেশ, তুমি আমাকে কি দিবে বল, তাহা হইলে আর তোমার সঙ্গে ঝগড়া করিব না।

শ্রীধর বড় সরল, নিরীহ মানুষ—মনে মনে ভাবিলেন, এই তরুণ পণ্ডিত বড়ই উদ্ধত, যদি ইহাকে কিছু না দিই, তবে হয়ত অন্ধকারে আমাকে ধরিয়া প্রহার দিবে, পথে দেখা হইলেই ঝগড়া করিবে। মুখে বলিলেন—না পণ্ডিত, আমি গরীব মানুষ তোমাকে কিছু দিতে পারিব না।

শ্রীগৌরাঙ্গও ছাড়িবার পাত্র নহেন, বলিলেন, তোমার মোচা, পাতা, থোড় প্রভৃতি আমাকে 'বিনা কড়িতে' দিতে হইবে।

অবশেষে তাহাই রফা হইল। শ্রীধর প্রত্যহ শ্রীগৌরাঙ্গকে খোলা, মোচা, থোড় প্রভৃতি যোগাইতে লাগিলেন।

এইরূপে পরম আনন্দে শ্রীগৌরাঙ্গ গৃহধর্ম করিতে লাগিলেন। তাঁহার সুন্দর রূপ, প্রফুল্ল ভাব, অল্প বয়সেই পাণ্ডিত্য, খ্যাতি ও যশ, গৃহে কোন অভাব নাই, স্নেহময়ী মাতা, নবপরিণীতা কিশোরী পত্নী,—শ্রীগৌরাঙ্গের দিন আনন্দে কাটিতে লাগিল। এই সময়ে এমন একজন সাধু পুরুষের সঙ্গে তাঁহার দেখা হইল, যিনি উত্তরকালে তাঁহার জীবনের গতি ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। ইঁহার নাম শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী, ইনি ভক্তিধর্মের অন্যতম প্রবর্তক শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য, পরম বৈষ্ণব, গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী। ঈশ্বরপুরী দীনবেশে, নিতান্ত সাধারণ লোকের ন্যায় নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন। তাঁহার বাহ্যবেশ দেখিয়া কেহ তাঁহাকে চিনিতে পারিত না। একদিন তিনি অদ্বৈতাচার্যের গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন। অদ্বৈতাচার্য তাঁহার দীনবেশ সত্ত্বেও তাঁহার মহত্ত্ব অনুভব করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"হে মহাজন, তুমি কে?" ঈশ্বরপুরী বিনীতভাবে উত্তর দিলেন—"আমি অধম, তোমার চরণ দর্শন করিতে আসিয়াছি।"

এইরূপে ঈশ্বর পুরীর সঙ্গে অদ্বৈতাচার্যের প্রথম সম্ভাষণ হইল। মুকুন্দ সেখানে ছিলেন। তিনি তাঁহার সুমধুর কণ্ঠে কৃষ্ণলীলা গান আরম্ভ করিলেন। শুনিবামাত্রই ঈশ্বরপুরী কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। তাঁহার দুই নয়ন দিয়া ধারা বহিতে লাগিল। অদ্বৈত তাঁহাকে আস্তেব্যস্তে কোলে তুলিয়া লইয়া সেবা করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই অপূর্ব প্রেমের ভাব দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত হইল, পরে যখন তাঁহারা জানিলেন, তিনিই বিখ্যাত ঈশ্বর পুরী, তখন আনন্দে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন।

একদিন শ্রীগৌরাঙ্গ টোল হইতে বাড়ী ফিরিতেছিলেন, পথে দৈবক্রমে ঈশ্বর পুরীর সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। এই পরম সুন্দর কিশোরকে দেখিয়া ঈশ্বর পুরীর মন মুগ্ধ হইল। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে বাবা?"

শ্রীগৌরাঙ্গ নিজের পরিচয় দিলে, ঈশ্বর পুরী আনন্দিত হইলেন এবং তাঁহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহাকে গৃহে লইয়া গিয়া পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে সেবা করিলেন।

ঈশ্বর পুরী নবদ্বীপে পণ্ডিত গোপীনাথ আচার্যের গৃহে কিছুকাল রহিয়া গেলেন। বৈষ্ণব ভক্ত ও পণ্ডিতেরা অনেকেই তাঁহাকে দেখিতে যাইতেন এবং তাঁহার মুখে ধর্মকথা শুনিয়া প্রীতিলাভ করিতেন। শ্রীগৌরাঙ্গও গদাধরের সঙ্গে প্রত্যহ ঈশ্বর পুরীর নিকটে যাইতেন। গদাধর পণ্ডিত বাল্যকাল হইতেই কৃষ্ণভক্ত ও বিষয়বিমুখ। ঈশ্বর পুরী তাঁহাকে বড় স্নেহ করিতেন এবং নিজকৃত কৃষ্ণলীলামৃত পড়িয়া শুনাইতেন। শ্রীগৌরাঙ্গের

উপরও ঈশ্বর পুরীর গভীর ভালবাসা হইয়াছিল। অল্পবয়সেই যে শ্রীগৌরাঙ্গ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন, তাহাও তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। একদিন ঈশ্বর পুরী হাসিয়া শ্রীগৌরাঙ্গকে বলিলেন, তুমি পরম পণ্ডিত, আমি কৃষ্ণ-চরিত রচনা করিয়াছি, তোমাকে শুনাইতে চাই। শুনিয়া তুমি তাহাতে যে সব দোষ আছে, নিঃসঙ্কোচে আমাকে বলিবে।

শ্রীগৌরাঙ্গ বিনীতভাবে উত্তর দিলেন—"ভক্তের রচনায় আবার দোষ কি? ভক্ত প্রেমভাবের বশবর্তী হইয়া ভগবানের কথা কীর্তন করেন। তাহাতে দোষ ধরিবে, এমন সাহস কার?"

ঈশ্বর পুরী এই উত্তরে সন্তুষ্ট হইলেন;—তবু হাসিয়া পুনরায় বলিলেন—"তুমি ঠিক কথাই বলিয়াছ। কিন্তু আমার অনুরোধ, তুমি আমার রচনায় দোষ থাকিলে অকপটে বলিবে, ইহাতে আমি অধিক সন্তুষ্ট হইব।"

শ্রীগৌরাঙ্গ ঈশ্বর পুরীর কৃষ্ণ-চরিত শুনিলেন। দুই একটা ব্যাকরণের দোষও দেখাইলেন। ঈশ্বর পুরী তাহাতে অসন্তুষ্ট হইলেন না, তরুণ পণ্ডিতের তীক্ষ্ণধী ও বিচারশক্তি দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন।

এইরূপে ঈশ্বর পুরীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে শ্রীগৌরাঙ্গের মনে ভক্তির ভাব জাগরিত হইল না বটে, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে একটা গভীর রেখাপাত হইল।

৫

পূর্ববঙ্গ-বিজয় ও 'দিগ্বিজয়ী' পরাজয়

নবদ্বীপে 'নিমাই পণ্ডিতের' খুবই নাম হইল। বড় বড় বিষয়ী লোকেরা তাঁহাকে সম্মান করিতে লাগিলেন। নবদ্বীপে যাহারা ক্রিয়াকর্ম, পূজাপার্বণ, ব্রত, অনুষ্ঠান ইত্যাদি করিত, তাহারা সকলেই অন্যান্য প্রধান পণ্ডিতদের ন্যায় 'নিমাই পণ্ডিতের' বাড়ীতেও ভোজ্য, বস্ত্র প্রভৃতি উপহার পাঠাইত। কিন্তু তাঁহার আয়ের সঙ্গে ব্যয়ও বাড়িতে লাগিল। অতিথি অভ্যাগতের সেবায় নিমাই পণ্ডিত মুক্তহস্ত ছিলেন, সাধুসন্ন্যাসীদের প্রায়ই নিমন্ত্রণ করিয়া তিনি খাওয়াইতেন। গৃহে নিতান্ত অভাব হইলেও অতিথি সেবায় তিনি পরাঙ্মুখ হইতেন না। এই কারণে শচীদেবী ও লক্ষ্মীদেবী সময় সময় বিব্রত হইয়া পড়িতেন। নবদ্বীপে নিমাই পণ্ডিতের যখন পাণ্ডিত্যের এইরূপ খ্যাতি, সেই সময়ে পূর্ববঙ্গে গমন করিবার জন্য তাঁহার নিমন্ত্রণ হইল। তিনি বহু শিষ্য সঙ্গে লইয়া পূর্ববঙ্গে চলিলেন। পূর্ববঙ্গের কোন কোন স্থানে শ্রীগৌরাঙ্গ গমন করিয়াছিলেন, তাহার সঠিক বিবরণ সমসাময়িক কোন বৈষ্ণব গ্রন্থে পাওয়া যায় না। তবে তিনি যে পদ্মার তীরে কতকগুলি স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, এইটুকু বোঝা যায়। কোন কোন গ্রন্থে আছে যে তিনি তাঁহার পূর্বপুরুষদের আদিভূমি শ্রীহট্ট পর্যন্ত গিয়াছিলেন, কিন্তু ইহার কোন নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় না।

পূর্ববঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গের খুব সমাদর হইল। বহুলোক শিক্ষার্থী হইয়া তাঁহার নিকট আসিতে লাগিল। তাঁহারা পূর্বেই নিমাই পণ্ডিতের নাম শুনিয়াছিলেন, এখন তাঁহাকে সাক্ষাৎ নিজেদের মধ্যে পাইয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন। তাঁহাদের অনুরোধে শ্রীগৌরাঙ্গ কিছুদিন বঙ্গদেশে রহিয়া গেলেন। ফিরিবার সময় লোকে বহু সমাদর করিয়া তাঁহাকে নানা উপহার দিল :—

তবে গৃহে প্রভু আসিবেন হেন শুনি।
যার যত শক্তি সবে ধন দিলা আনি॥
সুবর্ণ রজত জল পাত্র দিব্যাসন।
সুরঙ্গ কম্বল বহু প্রকার বসন॥
উত্তম পদার্থ যার যত ছিল ঘরে।
সবাই সন্তোষে আনি দিলেন প্রভুরে॥

—(চৈতন্য-ভাগবত)

শ্রীগৌরাঙ্গও তাঁহাদিগকে আশীর্বাদ করিয়া নবদ্বীপে প্রত্যাবর্তন করিলেন,

সঙ্গে বহু ছাত্র নবদ্বীপে তাঁহার নিকট পড়িবার জন্য আসিল। এদিকে শ্রীগৌরাঙ্গের অনুপস্থিতি সময়ে নবদ্বীপে লক্ষ্মীদেবী সর্পাঘাতে প্রাণত্যাগ করেন। গৃহে ফিরিয়া বালিকাপত্নীর শোকে শ্রীগৌরাঙ্গ মনে বড় আঘাত পাইলেন। কিন্তু মাতা শচীদেবীর মুখ চাহিয়া তিনি আত্মসম্বরণ করিলেন এবং পূর্বের মতই মুকুন্দসঞ্জয়ের গৃহে নিজ টোলে শিষ্যমণ্ডলী পরিবৃত হইয়া অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন। সমস্ত দিন ও রাত্রিরও অধিকাংশ সময় তিনি অধ্যয়ন অধ্যাপনা, শাস্ত্রালোচনা লইয়াই মগ্ন থাকিতেন। তাঁহার যশ ক্রমেই বর্ধিত হইতে লাগিল এবং নানাস্থান হইতে ছাত্রেরা তাঁহার নিকট পড়িতে আসিতে লাগিল।

কিন্তু তাঁহার সেই চাপল্য ও পরিহাসপ্রিয়তা তখনও দূর হয় নাই। পূর্ববঙ্গ হইতে ফিরিয়া "বাঙ্গালদের" বিশেষতঃ "শ্রীহট্টিয়াদের" কথা লইয়া তিনি নানারূপ বিদ্রূপ ও রঙ্গরস করিতেন।

অবশেষে চালেন প্রভু দেখি শ্রীহট্টিয়া।
কদর্থেন সেই মত বচন বলিয়া॥
ক্রোধে শ্রীহট্টিয়াগণ বলে হয় হয়।
তুমি কোন দেশী তাহা কহত নিশ্চয়।
পিতামাতা আদি করি যতেক তোমার।
বল দেখি শ্রীহট্টে না হয় জন্ম কার॥
আপনি হইয়া শ্রীহট্টিয়ার তনয়।
তবে গোল কর কোন যুক্তি ইথে হয়॥
যত তত বলে প্রভু প্রবোধ না মানে।
নানা মত কদর্থেন সে দেশী বচনে॥

'শ্রীহট্টিয়াগণ' মহাক্রুদ্ধ হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গকে মারিবার জন্য ধাইয়া যাইত এবং শেষ পর্যন্ত দুই চারিজন মধ্যস্থ জুটিয়া বুঝাইয়া সুঝাইয়া তাহাদিগকে শান্ত করিত।

শচীদেবী পুনরায় পুত্রের বিবাহ দিতে মনস্থ করিলেন। এই সময়ে নবদ্বীপে সনাতন নামে একজন ভক্ত বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া 'সুচরিতা, মূর্তিমতী লক্ষ্মী প্রায়।' শচীদেবী তাঁহাকেই পুত্রবধূ-রূপে মনোনীত করিলেন। মহা সমারোহে বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে নিমাই পণ্ডিতের বিবাহ কার্য সুসম্পন্ন হইল। নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলী এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিরা, সহস্র সহস্র পড়ুয়ার দল এ বিবাহে মহানন্দে যোগ দিয়াছিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়াও গৃহে আসিয়া নিজের মধুর স্বভাব ও সেবাগুণে স্বামী ও শাশুড়ীর মন শীঘ্রই জয় করিয়া লইলেন। প্রথমা পত্নী লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গের বেশীদিন পরিচয়ের সুযোগ ঘটে নাই, কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে তাঁহার প্রেম

গাঢ়তর হইল এবং উভয়ের দাম্পত্য জীবন সুখেই কাটিতে লাগিল।

এই সময়ে তাঁহার অধ্যাপক-জীবনের সর্বপ্রধান কীর্তি দিগ্বিজয়ী কেশব কাশ্মীরীকে বিচারে পরাজয়। তখনকার দিনে বড় বড় পণ্ডিতেরা 'দিগ্বিজয়ে' বাহির হইতেন, যে সব স্থান বিদ্যাকেন্দ্র রূপে প্রসিদ্ধ ছিল, সেই সব স্থানে যাইয়া তাঁহারা প্রসিদ্ধ পণ্ডিতদের বিচারে আহ্বান করিতেন,—যদি বিচারে তাঁহাদিগকে হারাইতে পারিতেন, তবেই তিনি 'দিগ্বিজয়ী' আখ্যা পাইতেন, সঙ্গে বহু সম্মান ও উপাধি প্রভৃতিও লাভ করিতেন। এইরূপ কোন কোন পণ্ডিত দিগ্বিজয়ী রাজা বা সেনাপতিদের মতই হস্তী, অশ্ব, দলবল প্রভৃতি লইয়া ডঙ্কা বাজাইয়া দেশ ভ্রমণ করিতেন।

কাশ্মীর প্রদেশের কেশব পণ্ডিত এইরূপ একজন 'দিগ্বিজয়ী' ছিলেন। তিনি কাশী, কাঞ্চী, মিথিলা, গুজরাট, তৈলঙ্গ, ওড্র প্রভৃতি দেশের পণ্ডিতদিগকে অনায়াসে জয় করিয়া অবশেষে প্রসিদ্ধ বিদ্যাকেন্দ্র নবদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ডঙ্কা বাজাইয়া পণ্ডিতদিগকে বিচারে আহ্বান করিলেন। নবদ্বীপের পণ্ডিতেরা পূর্ব হইতেই তাঁহার পাণ্ডিত্যের প্রতাপ শুনিয়াছিলেন, সুতরাং নিজেদের প্রতিষ্ঠা রক্ষার জন্য তাঁহারা একটু উদ্বিগ্ন হইয়াই উঠিলেন।

এমন সময়ে এক অঘটন ঘটিল। কয়েক জন শিষ্য যাইয়া নিমাই পণ্ডিতের নিকট 'কাশ্মীর কেশবের' কথা নিবেদন করিল। কাশ্মীর কেশব দিগ্বিজয়ী, তাহাতে সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত, আর তরুণ নিমাই পণ্ডিত মাত্র ব্যাকরণ ও শব্দ-শাস্ত্রের অধ্যাপক। সুতরাং উভয়ের মধ্যে বিচারের কল্পনা আসিতেই পারে না। কিন্তু দৈবক্রমে, সেইরূপ ব্যাপারই ঘটিল। শ্রীগৌরাঙ্গ কাশ্মীর কেশবের কথা শুনিয়া বলিলেন, এই দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের অহঙ্কার খুবই বাড়িয়াছে, কিন্তু ভগবান কাহারও এত অহঙ্কার সহ্য করেন না, তিনি শীঘ্রই ইহার দর্পচূর্ণ করিবেন।

সন্ধ্যাকালে নিমাই পণ্ডিত শিষ্যবর্গ বেষ্টিত হইয়া গঙ্গার ঘাটে আসিয়াছেন, নানারূপ তর্ক বিতর্ক ও শাস্ত্রালোচনা করিতেছেন। এমন সময় কাশ্মীরী কেশব সেই স্থানে আসিলেন। শিষ্যবর্গ বেষ্টিত নিমাইয়ের অপরূপ রূপ দেখিয়া, ততোধিক তাঁহার শাস্ত্রালোচনা শুনিয়া তিনি মুগ্ধ হইলেন। একজন শিষ্যকে একান্তে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন ইনিই তরুণ নিমাই পণ্ডিত। কাশ্মীর কেশব তখন নিমাই পণ্ডিতের নিকটে গিয়া তাঁহাকে সম্ভাষণ করিলেন। তিনিও কাশ্মীরী কেশবের পরিচয় জানিয়া তাঁহাকে মহা-সমাদরে বসাইলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ বহু সম্মান করিয়া কাশ্মীরী কেশবকে বলিলেন, আপনি দিগ্বিজয়ী, মহা পণ্ডিত, সর্বত্রই আপনার কবিত্ব ও প্রতিভার খ্যাতি। আপনি গঙ্গার মহিমা বর্ণনা করুন, আমরা শুনিয়া ধন্য হই।

দিগ্বিজয়ী আনন্দে সম্মত হইলেন এবং অসাধারণ কবিত্বশক্তি বলে ঝড়ের মত বেগে মুখে মুখে এক শত শ্লোক রচনা করিয়া গঙ্গার মহিমা কীর্তন করিলেন। স্বয়ং শ্রীগৌরাঙ্গ ও ছাত্রগণ তাঁহার অসাধারণ শক্তিতে মুগ্ধ হইলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ সবিনয়ে দিগ্বিজয়ীকে বলিলেন,—আপনার কবিত্বের তুলনা নাই, এরূপ কার্য কেবল আপনার দ্বারাই সম্ভব, আপনি স্বয়ং সরস্বতীর বরপুত্র। আপনি স্বমুখে আপনার একটি শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করুন। এই বলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ দিগ্বিজয়ী কৃত একটি শ্লোক আবৃত্তি করিলেন। দিগ্বিজয়ী পরম বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—আমি ঝড়ের মত শ্লোক বলিয়া গেলাম, তুমি তাহার মধ্য হইতে এই একটি শ্লোক কিরূপে অবিকল উদ্ধার করিলে?

শ্রীগৌরাঙ্গ হাসিয়া বলিলেন, আপনি সরস্বতীর বরে কবিত্ব শক্তির অধিকারী, আর কেহ হয়ত তাঁহারই বরে শ্রুতিধর।

দিগ্বিজয়ী চমৎকৃত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ কর্তৃক উদ্ধৃত নিজকৃত শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন এবং স্বাভাবিক পাণ্ডিত্য বলে তাহার নানা অর্থ প্রকাশ করিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ মৃদু হাসিয়া বিনীত ভাবে বলিলেন,—আপনার শ্লোক যেমন অপূর্ব, ব্যাখ্যাও তেমনি চমৎকার। কিন্তু ইহাতে কয়েকটি ব্যাকরণ ও অলঙ্কারের দোষ আছে, না থাকিলে শ্লোকটি আরও সুন্দর, নিখুঁত হইত। এই বলিয়া তিনি দিগ্বিজয়ীর শ্লোকের মধ্যে একে একে কয়েকটি গুরুতর দোষ প্রদর্শন করিলেন।

দিগ্বিজয়ী নিমাই পণ্ডিতের বিচারশক্তি দেখিয়া অবাক্ স্তম্ভিত হইলেন। তিনি নিমাইয়ের যুক্তি খণ্ডন করিতে নানা চেষ্টা করিলেন, অনেক কুতর্ক উঠাইলেন, কিন্তু কিছুতেই সফলকাম হইলেন না। অবশেষে নিমাই পণ্ডিতের নিকট বিচারে পরাজিত হইয়া তাঁহাকে গৃহে ফিরিতে হইল। নিমাই পণ্ডিতও দিগ্বিজয়ীকে পরাজিত করিয়া স্নানান্তে শিষ্যবৃন্দসহ গঙ্গাতীর হইতে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

সে রাত্রিতে দিগ্বিজয়ীর চোখে নিদ্রা আসিল না। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, এই নিমাই পণ্ডিত 'শিশু' ব্যাকরণশাস্ত্রের অধ্যাপক, বালক মাত্র, আর আমি দিগ্বিজয়ী কাশ্মীর কেশব, অথচ ইহার হাতেই আমার পরাজয় হইল। সরস্বতী নিশ্চয়ই আমার প্রতি বিমুখ। সরস্বতীও যেন স্বপ্নে দেখা দিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—বৎস, ইহার জন্য তুমি দুঃখ করিও না, এই নিমাই পণ্ডিত সাধারণ মানুষ নহেন, স্বয়ং ভগবানের প্রকাশ, ইঁহার নিকট তোমার পরাজয় কিছুই আশ্চর্যের বিষয় নহে।

পর দিন অতি প্রত্যুষে উঠিয়াই দিগ্বিজয়ী গোপনে নবদ্বীপ ত্যাগ

করিলেন। তাঁহার আর নবদ্বীপের বিদ্যাকেন্দ্র জয় করা হইল না। মনে মনে তাঁহার যে পাণ্ডিত্য গর্ব ছিল, তাহাও চূর্ণ হইল।

এই সময়ের আর একটি ঘটনা বড়ই চমৎকার কৌতূহলপ্রদ। নিমাই পণ্ডিত কিছুদিন বাসুদেব সার্বভৌমের টোলে ন্যায়শাস্ত্র পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। বাসুদেব সার্বভৌম মিথিলাবিজয়ী, নবদ্বীপের গৌরব, বহু ছাত্র তাঁহার নিকট পড়িতে আসিত। প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক রঘুনাথও বাসুদেবের একজন ছাত্র ছিলেন। সেই সময়েই তিনি তীক্ষ্ণধী ছাত্ররূপে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ ও রঘুনাথ উভয়েই প্রত্যহ একত্র বাসুদেবের টোলে যাইতেন। বাসুদেবের টোলে যাইতে হইলে বর্ষাকালে গঙ্গার একটা সোঁতা খেয়া নৌকায় পার হইতে হইত। একদিন নৌকায় যাইতে যাইতে শ্রীগৌরাঙ্গ রঘুনাথকে বলিলেন,—"রঘুনাথ, আমি ন্যায়সূত্রের একখানি টীকা রচনা করিয়াছি, তোমাক শোনাই",—এই বলিয়া তাল পাতায় লেখা পুঁথি বাহির করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ রঘুনাথকে নিজের টীকা শুনাইতে লাগিলেন। রঘুনাথ যতই শুনিতে লাগিলেন, ততই বিস্মিত চমৎকৃত হইতে লাগিলেন, অবশেষে মনোদুঃখে বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ ব্যথিতচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন—"রঘুনাথ, আমার টীকা শুনিয়া তুমি এমন কাঁদিতেছ কেন, কি হইয়াছে তোমার?" রঘুনাথ অতি কষ্টে আত্ম-সম্বরণ করিয়া বলিলেন—"আমিও ন্যায়ের একখানি টীকা বহু পরিশ্রমে রচনা করিয়াছি, আমার বিশ্বাস ছিল, তেমন পাণ্ডিত্যপূর্ণ টীকা আর কেহ রচনা করিতে পারে নাই এবং ইহাতেই আমার যশ চিরস্থায়ী হইবে। কিন্তু তোমার টীকা শুনিয়া মনে হইতেছে, ইহার নিকট আমার টীকা তুচ্ছ, ইহা প্রকাশিত হইলে লোকে আমার টীকা গ্রাহ্যও করিবে না।"

শ্রীগৌরাঙ্গ ধীর গম্ভীর ভাবে রঘুনাথের কথা শুনিলেন, তাহার পর বলিলেন,—"এইজন্য তোমার এত দুঃখ! তুচ্ছ ন্যায়ের টীকা, আমি সে যশ চাই না, তুমিই সেই যশের অপ্রতিদ্বন্দ্বী অধিকারী হও।" এই বলিয়া তিনি তাঁহার তাল পাতার পুঁথিখানি খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া গঙ্গার সোঁতার মধ্যে ফেলিয়া দিলেন। রঘুনাথ অবাক হইয়া এই অদ্ভুত মানুষটির দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন।

ইহার পর শ্রীগৌরাঙ্গ আর সার্বভৌমের টোলে ন্যায় শাস্ত্র পড়িতে যান নাই। রঘুনাথই নব্যন্যায়ের প্রবর্তকরূপে জগতে অমর হইয়া রহিয়াছেন। যিনি উত্তরকালে বিশ্বের মঙ্গলের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহার পক্ষে এই সামান্য বিদ্যার প্রতিষ্ঠা ত্যাগ আর বেশী কথা কি?

৬

গয়ায় গমন ও ঈশ্বরপুরীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ

কিছুদিন পরে শ্রীগৌরাঙ্গ গয়াতীর্থে গমন করিলেন সঙ্গে সঙ্গে নবদ্বীপ-বাসী কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবও চলিলেন। গয়াতীর্থে স্নান করিয়া তিনি যথাবিধি পিতৃকার্য সম্পাদন করিলেন। তার পরে গদাধরের পাদপদ্ম দর্শন করিবার জন্য চক্রবেড়ের ভিতরে প্রবেশ করিলেন। সেখানে যে অপূর্ব দৃশ্য দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার হৃদয় দ্রবীভূত হইল। সহস্র সহস্র লোক পাদপদ্ম ঘেরিয়া পূজা ও স্তব পাঠ করিতেছে, গন্ধ ধূপ, দীপ, মাল্যদামে মনোহর শোভা হইয়াছে। শ্রীভগবানের পাদপদ্মের মহিমা শুনিতে শুনিতে শ্রীগৌরাঙ্গের মনে প্রেমের উদয় হইল, তাঁহার দুই চোখে ধারা বহিতে লাগিল, তিনি তন্ময় হইয়া একদৃষ্টে সেই পাদপদ্ম দর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই অপূর্ব ভাব দেখিয়া উপস্থিত সকলেই চমৎকৃত হইলেন। দৈবক্রমে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী এই এই সময়ে সেখানে আগমন করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গকে দেখিয়াই তিনি চিনিতে পারিলেন এবং তাঁহার মধ্যে এই অপূর্ব ভাবের সঞ্চার দেখিয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হইলেন। যে উদ্ধত, চপল তরুণ পণ্ডিতকে তিনি নবদ্বীপে দেখিয়াছিলেন, ইনিই কি সেই? ইঁহার এরূপ আকস্মিক পরিবর্তন কিরূপে সম্ভবপর হইল,—ঈশ্বরপুরী এইরূপ ভাবিতে লাগিলেন। এদিকে শ্রীগৌরাঙ্গও ঈশ্বরপুরীকে দেখিয়া চিনিতে পারিলেন এবং পরম শ্রদ্ধাভরে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। ঈশ্বরপুরী তাঁহাকে আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করিয়া আনন্দে মগ্ন হইলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, "আমার গয়া যাত্রা সফল, কেন না আপনার মত সাধু-পুরুষের দর্শন লাভ করিলাম। আমি আপনার নিকট আত্মসমর্পণ করিলাম, আপনি আমাকে ভগবৎ প্রেম দান করুন।" ঈশ্বরপুরী তাঁহাকে মধুর বচনে আশ্বস্ত করিয়া তখনকার মত বিদায় হইলেন।

তীর্থের কাজ শেষ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ বাসস্থানে ফিরিয়া রন্ধন করিতে বসিয়াছেন, এমন সময় ঈশ্বরপুরী আগমন করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাসমাদরে তাঁহাকে সম্বর্ধনা করিলেন এবং নিজের জন্য প্রস্তুত অন্ন তাঁহাকে দিয়া ভক্তিভরে অতিথি-সেবা করিলেন।

এইরূপে শীঘ্রই ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠতা হইল, আর ঈশ্বর-পুরীও তাঁহার প্রতি পরম প্রীত হইলেন। একদিন শ্রীগৌরাঙ্গ নির্জনে ঈশ্বরপুরীর নিকট মন্ত্র দীক্ষা চাহিলেন। ঈশ্বরপুরীও প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে শিষ্যরূপে দীক্ষা দান করিলেন।

দীক্ষা লাভ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের নবজীবন আরম্ভ হইল। তাঁহার পূর্বের চাপল্য, পরিহাসপ্রিয়তা, পাণ্ডিত্যের গর্ব সমস্ত দূর হইল। শান্ত মধুর ভগবদ্‌ভক্তিতে তাঁহার সমস্ত অন্তর পূর্ণ হইয়া উঠিল। সর্বক্ষণ নির্জনে বসিয়া তিনি ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। ভগবানের নাম জপ করিতে করিতে তিনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য তন্ময় হইয়া গেলেন, অবশেষে প্রেমে বিহ্বল হইয়া ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন।

সঙ্গে যে সব শিষ্য ও বন্ধুবান্ধব ছিলেন, তাঁহারা নানারূপে প্রবোধ দিয়া তাঁহাকে শান্ত করিলেন এবং নবদ্বীপে ফিরাইয়া আনিলেন।

নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিলে বন্ধুবান্ধবেরা তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন এবং তাঁহার প্রকৃতির পরিবর্তন দেখিয়া পরম সন্তুষ্ট হইলেন। নম্র, বিনয়ী, শান্ত, মধুরভাষী এই তরুণ যুবককে দেখিয়া কাহার না মনে আনন্দ হয়? বয়োজ্যেষ্ঠ ও গুরুজনেরা তাঁহাকে আশীর্বাদ করিলেন, তিনিও তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য সম্মান করিলেন।

এদিকে শ্রীগৌরাঙ্গ কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধুকে নিভৃতে ডাকিয়া নিজের মনের অবস্থা জানাইলেন। তাঁহারাও শ্রীগৌরাঙ্গের নূতন ভাব দেখিয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহাদিগকে কহিলেন—"সমস্ত বৈষ্ণব ও ভক্ত বন্ধুদিগকে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর গৃহে আসিতে বলিও, সেইখানে আমি আমার মনের কথা ভাল করিয়া কহিব।"

শীঘ্রই বৈষ্ণবদের মধ্যে প্রচার হইল যে, নিমাই পণ্ডিত গয়া হইতে ভগবদ্‌ভক্ত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন, তাঁহার আর সে পূর্বভাব নাই। সকলেই শুনিয়া চমৎকৃত হইল, যাঁহারা তাঁহাকে দেখেন নাই, তাঁহারা দেখিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইলেন। পরদিন কথামত শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর গৃহে বৈষ্ণব বন্ধুগণ আসিলেন। সদাশিব, মুরারি, শ্রীমান পণ্ডিত, শুক্লাম্বর প্রভৃতি অনেকে সমবেত হইলেন। গদাধর পণ্ডিতও আসিলেন, কিন্তু তিনি সকলের সম্মুখে না আসিয়া গৃহমধ্যে লুকাইয়া রহিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ সকলের মধ্যে বসিয়া, গয়ায় তাঁহার জীবনে যে নূতন ভাবের সঞ্চার হইয়াছে, তাহার বর্ণনা করিতে লাগিলেন। বলিতে বলিতে তাঁহার মনে প্রেমের আবির্ভাব হইল, তিনি 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং ধূলায় লুটাইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি আত্মসম্বরণ করিয়া আবার কৃষ্ণকথা বলিতে লাগিলেন। গদাধর পণ্ডিত গৃহমধ্যে লুকাইয়া ছিলেন, এই সময়ে তিনি সম্মুখে আসিয়া হেঁট-মুখে দাঁড়াইলেন, তাঁহার নয়নেও ধারা বহিতে লাগিল। শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, "গদাধর, তুমিই ভাগ্যবান্, কেননা বাল্যকাল হইতেই তুমি কৃষ্ণনাম লইতেছ, আমি মহাপাপী।"

গদাধর ও সকলে মিলিয়া তাঁহাকে প্রবোধ দিলেন।

শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর গৃহে সমবেত বৈষ্ণবদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া তিনি গুরু গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে যাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। গুরু গঙ্গাদাসও বিদেশ-প্রত্যাগত শিষ্যকে সমাদরে সম্বর্ধনা করিলেন। গঙ্গাদাস বলিলেন—"বাবা, তোমার চরিত্রে আমি আনন্দিত, তুমি পিতৃকুল মাতৃকুল দুইই ধন্য করিয়াছ। তোমার শিষ্যদের তোমার উপর প্রগাঢ় নিষ্ঠা, তোমাকে ছাড়িয়া আর কাহারও নিকট তাহারা পড়িতে চায় না। আবার তুমি নিজের টোলে অধ্যাপনা আরম্ভ কর।"

গঙ্গাদাসের নিকট বিদায় লইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ স্বগৃহে আসিলেন। সেখানেও তাঁহার প্রেমবিহ্বল তন্ময়ভাব দূর হইল না। একমনে বসিয়া কৃষ্ণনাম জপ করেন ও উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকেন। শচী পুত্রের এই অবস্থা দেখিয়া ভীত হইলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া চিন্তিত হইলেন। রাত্রিতেও শ্রীগৌরাঙ্গ অধিকাংশ সময় ঘুমাইতেন না, জাগিয়া বসিয়া কৃষ্ণনাম করিতেন। সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণুপ্রিয়াও উৎকণ্ঠিতচিত্তে জাগিয়া থাকিতেন।

প্রভাতে উঠিয়া গঙ্গাস্নান করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ মুকুন্দ সঞ্জয়ের গৃহে নিজের টোলে গিয়া শিষ্যদিগকে পড়াইতে বসিলেন। কিন্তু পড়াইতে বসিয়া কৃষ্ণনাম ছাড়া আর কিছু তাঁহার মুখে আসে না, সমস্ত সূত্র, বৃত্তি, টীকার মধ্য দিয়া তিনি কেবল কৃষ্ণনামেরই ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। শিষ্যগণ অবাক্ হইয়া শুনিতে লাগিল। পাঠ শেষ করিয়া প্রভু যখন জিজ্ঞাসা করিলেন "যাহা পড়াইলাম, বুঝিতে পারিয়াছ তো?" শিষ্যগণ কহিল, তাহারা কিছুই বুঝে নাই। প্রভু তখন পুঁথি গুটাইয়া হাসিয়া কহিলেন, "আজ পাঠ থাক্ চল সকলে গঙ্গাস্নান করিয়া আসি, কাল ভাল করিয়া পড়াইব।"

প্রভু শিষ্যগণ সঙ্গে গঙ্গাস্নান করিতে চলিলেন এবং শীঘ্রই তাহাদের সঙ্গে মিলিয়া সাঁতার ও জল খেলায় প্রবৃত্ত হইলেন।

কিন্তু পরদিন টোলে আসিয়া যখন শ্রীগৌরাঙ্গ পড়াইতে বসিলেন, তখনও ঐরূপ ব্যাপার ঘটিল। প্রথম প্রথম সূত্র, বৃত্তি প্রভৃতি তিনি নিপুণভাবেই ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বলিতে বলিতে আবার সেই পূর্বভাব জাগিয়া উঠিল, শব্দের ব্যাখ্যা ছাড়িয়া শিষ্যদের নিকট তিনি কৃষ্ণনামের মহিমা বলিতে লাগিলেন। শিষ্যগণ হতাশ হইয়া সদলবলে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট গিয়া হাজির হইল এবং কহিল—"নিমাই পণ্ডিত গয়া হইতে ফিরিয়া আসা অবধি শিষ্যদিগকে আর কিছু পড়াইতেছেন না, কেবল কৃষ্ণনামের ব্যাখ্যা করিতেছেন।" গঙ্গাদাস পণ্ডিত হাসিয়া শ্রীগৌরাঙ্গকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি নানারূপে বুঝাইয়া শ্রীগৌরাঙ্গকে বলিলেন—"বাপু, তোমার বাপ, মাতামহ প্রভৃতি পরম পণ্ডিত, তুমি নিজেও পণ্ডিত। তুমি অধ্যাপনা ছাড়িয়া এ কি করিতেছ? অধ্যয়ন অধ্যাপনা না ছাড়িলে কি কৃষ্ণভক্ত হওয়া যায় না? তোমার বাপ

পিতামহ পণ্ডিত বলিয়া কি ভক্ত নহেন? অতএব এসব খেয়াল ছাড়িয়া মন দিয়া ছাত্রদের পড়াও।"

শ্রীগৌরাঙ্গ লজ্জিতভাবে গুরুর কাছে স্বীকার করিলেন যে, পরদিন হইতে ছাত্রদিগকে যথারীতি পড়াইবেন।

পরদিন টোলে বসিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ খুব পাণ্ডিত্য সহকারে শিষ্যদিগকে পড়াইতে লাগিলেন। শিষ্যেরাও সন্তুষ্ট হইলেন। এই সময়ে রত্নগর্ভ আচার্য নামক একজন পণ্ডিত নিকটবর্তী গৃহে ভাগবত পাঠ করিতেছিলেন। সহসা ভাগবতের শ্লোক কর্ণে আসিবা মাত্র, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেমে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পুনরায় কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন। তাঁহার দুই নয়নে ধারা বহিতে লাগিল। শিষ্যগণ অবাক্ হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে আত্মসম্বরণ করিয়া পুঁথি গুটাইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ শিষ্যগণকে বলিলেন,—"ভাই সব, আমাকে ক্ষমা কর, আমার আর পড়াইবার শক্তি নাই, কৃষ্ণ বিনা অন্য কথা আমার মুখে আসে না। আমি তোমাদিগকে সানন্দে অনুমতি দিতেছি, তোমরা ইচ্ছামত অন্য গুরুর নিকটে গিয়া অধ্যয়ন কর।"

শিষ্যগণ তাহাদের এই তরুণ গুরুকে বড়ই ভালবাসিত। তাঁহার ভাবান্তর দেখিয়া তাহারা অত্যন্ত ব্যথিত হইল, কহিল,—"আমরা আর কাহারও কাছে পড়িতে চাই না, অতএব আজ হইতে আমাদের পাঠও সাঙ্গ হইল।" এই বলিয়া তাহারা নিজ নিজ পুঁথির ডোর বাঁধিল।

শ্রীগৌরাঙ্গ তখন পরম আনন্দিত চিত্তে শিষ্যদের নিকট কৃষ্ণকথা কহিতে লাগিলেন। বলিলেন—এতদিন ধরিয়া তো অনেক পড়াশুনা করিলাম, এখন এস, সকলে মিলিয়া হরিনাম সঙ্কীর্তন করি। এই বলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ হাতে তালি দিয়া কীর্তন আরম্ভ করিলেন—

হরি হরয়ে নম কৃষ্ণ যাদবায় নম।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন।

শিষ্যগণও সঙ্গে সঙ্গে হাত তালি দিয়া কীর্তন করিতে লাগিল। এইরূপে শ্রীগৌরাঙ্গ সর্বপ্রথম হরিনাম সঙ্কীর্তনের সূত্রপাত করিলেন।

৭

অদ্বৈতাচার্য, নিত্যানন্দপ্রভু ও হরিদাস ঠাকুর

শ্রীবাস পণ্ডিত ও তাঁহার পরিবারবর্গ সকলেই ছিলেন ভক্ত বৈষ্ণব। শ্রীবাস শ্রীগৌরাঙ্গকে বাল্যকাল হইতেই স্নেহ করিতেন, তাঁহাকে ঔদ্ধত্য ও চাপল্য ত্যাগ করিতে উপদেশ দিতেন। সুতরাং শ্রীগৌরাঙ্গের এই পরিবর্তনে শ্রীবাস পরম আনন্দিত হইলেন। শ্রীবাসের গৃহই এখন বৈষ্ণবদের প্রধান মিলনস্থান হইয়া উঠিল। সন্ধ্যার পর শ্রীগৌরাঙ্গ ও অন্যান্য বৈষ্ণব ভক্তেরা এইখানে আসিয়াই সমবেত হইতেন এবং কৃষ্ণকথা, কীর্তন ভজন প্রভৃতি অনেক রাত্রি পর্যন্ত চলিত। কখন কখন তাঁহারা সমস্ত রাত্রি জাগিয়া কীর্তন করিতেন এবং পরদিন প্রভাতে গঙ্গাস্নান করিয়া গৃহে ফিরিতেন। নবদ্বীপের অধিকাংশ লোক—বিশেষতঃ পণ্ডিতেরা তখন ভক্তিশূন্য ছিলেন, সঙ্কীর্তন জিনিষটা তাঁহারা মোটেই পছন্দ করিতেন না। সুতরাং শ্রীগৌরাঙ্গের এই নূতন বৈষ্ণব-গোষ্ঠী তাঁহাদের দুই চোখের বিষ হইয়া উঠিল। তাঁহারা বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন—এই বৈষ্ণবেরা অহিন্দু, পাষণ্ড, ইহারা সনাতন শাস্ত্র ও আচার পরিত্যাগ করিয়া যথেচ্ছাচার করিতেছে। ইহাদের আচরণে ধর্ম দেশ ছাড়িয়া পলাইবে। শ্রীবাসের গৃহে কীর্তন বন্ধ করিবার জন্য এই সব বিরোধীরা নানারূপ উপদ্রব অত্যাচার করিতে ত্রুটি করিল না। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ ও তাঁহার সঙ্গীরা তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না, বিরোধীদের উপদ্রবে শেষে তাঁহারা গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া কীর্তন ভজন করিতে লাগিলেন।

ক্রমে এই বৈষ্ণবগোষ্ঠী, বিশেষতঃ শ্রীগৌরাঙ্গের কথা শান্তিপুরের অদ্বৈতাচার্যের কর্ণগোচর হইল। পূর্বেই বলিয়াছি, অদ্বৈতাচার্য ছিলেন তখনকার দিনে সম্ভ্রান্ত ধনী গৃহস্থ, ব্রাহ্মণসমাজের সমাজপতি, তাঁহার প্রভাব ও প্রতিপত্তি যথেষ্ট ছিল। তাঁহার উপাধিতেই বুঝা যায়, তিনি বেদান্তশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার আসল নাম ছিল কমলাক্ষ মিশ্র। কিন্তু বৈদান্তিক পণ্ডিত হইলেও তিনি ভক্তবৈষ্ণব ছিলেন। যখন নবদ্বীপে কেহই ভক্তির কথা বলিত না, তখন তাঁহারই গৃহে শ্রীবাস, মুকুন্দ, গদাধর প্রভৃতি মুষ্টিমেয় বৈষ্ণবেরা সমবেত হইয়া কৃষ্ণকথা আলোচনা করিতেন। কথিত আছে, লোক সকলকে ভক্তিহীন ও অসার আচার অনুষ্ঠানে রত দেখিয়া অদ্বৈতাচার্য মনে বড়ই ব্যথা পাইতেন এবং প্রত্যহ গঙ্গাজল তুলসী দিয়া শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিয়া প্রার্থনা করিতেন, হে ভগবান্, লোকের হৃদয়ে ভক্তি দাও, জগৎকে উদ্ধার কর। শ্রীগৌরাঙ্গ ও তাঁহার বৈষ্ণবগোষ্ঠীর কথা শুনিয়া অদ্বৈতাচার্যের

পরম আনন্দ হইল, মনে হইল তাঁহার প্রার্থনা বুঝি এতদিনে সফল হইল। অদ্বৈতাচার্য শ্রীগৌরাঙ্গকে দেখিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। একদিন শ্রীগৌরাঙ্গ নিজেই গদাধরের সঙ্গে অদ্বৈতাচার্যের গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন। অদ্বৈতাচার্য তাঁহাকে দেখিয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হইলেন, ভাবিলেন,—এই সেই মনোহর শিশু, জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র, নীলাম্বর চক্রবর্তীর দৌহিত্র, তাহার দাদা বিশ্বম্ভরকে ডাকিবার জন্য কতদিন আমার গৃহে আসিয়াছেন। কে জানিত, সেই শিশুই যৌবনে এমন কৃষ্ণভক্ত হইবে! অদ্বৈতাচার্য গভীর স্নেহে শ্রীগৌরাঙ্গকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন এবং পরম সমাদরে তাঁহাকে সম্বর্ধনা করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ সবিনয়ে কহিলেন, আমাকে এমন সম্মান প্রদর্শন করা আপনার উচিত হয় না। আপনি আমার পরম পূজ্য গুরুতুল্য, আমাকে আপনি শিষ্যের মত ভক্তি ধর্ম উপদেশ দিবেন। এই বলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ অদ্বৈতাচার্যকে সসম্ভ্রমে প্রণাম করিলেন।

এই সময় হইতে অদ্বৈতাচার্যের সঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গের যে গভীর সম্বন্ধ স্থাপিত হইল, আজীবন তাহা অটুট ছিল। অদ্বৈতাচার্য সকল অবস্থাতেই শ্রীগৌরাঙ্গের অনুরাগী ও সমর্থক ছিলেন এবং বয়সে প্রবীণ হইলেও নিজেকে শ্রীগৌরাঙ্গের প্রধান শিষ্যরূপে গণ্য করিতেন। শ্রীগৌরাঙ্গও সর্বদা গুরুর ন্যায় অদ্বৈতাচার্যকে অশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করিতেন।

এই সময়ে আর একজন মহাপুরুষ নবদ্বীপে আসিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত মিলিত হইলেন। ইনিই বিশ্ববিখ্যাত শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু। জগতে যে সব অশেষ শক্তিশালী মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ইনি তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম সন্দেহ নাই।

বীরভূমের একচাকা গ্রাম নিত্যানন্দ প্রভুর জন্মস্থান। তাঁহার পিতার নাম হাড়াই পণ্ডিত, মাতার নাম পদ্মাবতী। নিত্যানন্দ বাল্যকাল হইতেই একটু উদাসীনভাবাপন্ন ছিলেন, লেখাপড়াতে তাঁহার বিশেষ মনোযোগ ছিল না, নানাস্থানে দুরন্তপনা করিয়া বেড়াইতেন। একবার এক সন্ন্যাসী আসিয়া হাড়াই পণ্ডিতের গৃহে অতিথি হইলেন। তিনি বালক নিত্যানন্দকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং তাঁহার দুরন্তপনার কাহিনী শুনিয়া হাড়াই পণ্ডিতকে বলিলেন—"আমি তীর্থ পর্যটনে যাইব, সঙ্গে একটি ব্রাহ্মণ বালকের প্রয়োজন। যদি তোমার পুত্রকে আমার সঙ্গে দাও, তবে আমার বড় উপকার হয়।" হাড়াই পণ্ডিত পুত্রের বিরহাশঙ্কায় কাতর হইলেও, নানা কথা ভাবিয়া পরিশেষে এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

সেই হইতে নিত্যানন্দ সন্ন্যাসীর সঙ্গে তীর্থে তীর্থে ঘুরিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে সন্ন্যাসীর নিকট তিনি সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষা লইলেন। গৃহে ফিরিবার ইচ্ছা তাঁহার মনে আদৌ রহিল না। সন্ন্যাসীর তিরোভাবের পর

নিত্যানন্দ স্বাধীনভাবে তীর্থে তীর্থে যথেচ্ছ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ভারতের এমন তীর্থ ছিল না, যেখানে নিত্যানন্দ যান নাই। উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে কুমারিকা, পূর্বে কামাখ্যাপীঠ হইতে পশ্চিমে দ্বারকা তীর্থ পর্যন্ত সর্বত্রই তিনি পর্যটন করিয়াছিলেন। এইরূপে নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া, নানা শ্রেণীর লোকের সঙ্গে মিশিয়া নিত্যানন্দ প্রভু যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহার তুলনা নাই। তিনি পরমভক্ত, পরম দয়ালু ও মহাপ্রাণ ছিলেন,—লোকহিত করাই ছিল তাঁহার জীবনের ব্রত। জাতিভেদ ও বাহ্য আচার তিনি মানিতেন না, আচণ্ডাল ব্রাহ্মণে তাঁহার সমভাব ছিল। বৈষ্ণব গ্রন্থে নিত্যানন্দের স্বভাববর্ণনায় বলা হইয়াছে—

অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়।
অভিমানশূন্য নিতাই নগরে বেড়ায়।

এই অক্রোধ, ক্ষমা ও দয়ার মূর্তি নিত্যানন্দ প্রভু বাঙ্গালাদেশে আপামর সাধারণের মধ্যে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারে যত কাজ করিয়াছেন, এমন বোধ হয় আর কেহ করেন নাই। তাঁহার চরিত্রের উদারতা যতই আমরা স্মরণ করি, ততই আমাদের মন শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে নত হইয়া পড়ে।

নিত্যানন্দ যখন বৃন্দাবন তীর্থ পর্যটন করিয়া নবদ্বীপে আসিলেন, তখন তাঁহার বয়স ৩২ বৎসরের কম নহে। আসিয়া তিনি নন্দন আচার্যের গৃহে রহিলেন। তখন শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার বৈষ্ণবগোষ্ঠী লইয়া কীর্তন ভজন আরম্ভ করিয়াছেন। ক্রমে উভয়ে উভয়কে জানিতে পারিলেন এবং একদিন নন্দন আচার্যের গৃহে দুইজনের মিলন হইল। এ মিলন বাঙ্গালার তথা ভারতের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন।

নিত্যানন্দকে কেমন দেখাইতেছিল?

দেখি মহাতেজো রাশি যেন সূর্যসম।
মহা অবধূত বেশ প্রকাণ্ড শরীর।
নিরবধি গভীরতা দেখি মহাধীর॥
অহর্নিশি বদনে বলয়ে কৃষ্ণনাম।

আর শ্রীগৌরাঙ্গের রূপ?

বিশ্বম্ভর মূর্তি যেন মদন সমান।
দিব্য গন্ধ মাল্য দিব্য বাস পরিধান॥
কি হয় কনকদ্যুতি সে দেহের আগে।
সে বদন দেখিতে চান্দের সাধ লাগে॥

দুইজন দুইজনকে দেখিয়া হর্ষে স্তম্ভিত হইলেন, অপলক নেত্রে উভয়ে উভয়ের প্রতি চাহিয়া রহিলেন, যেন দুইজনের মধ্যে কতকালের পরিচয়, কত গভীর আত্মীয়তা! এই সময়ে শ্রীবাস পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করিয়া

ভাগবত হইতে একটি শ্লোক পড়িলেন। শুনিবামাত্র নিত্যানন্দ প্রভু প্রেমে বিহ্বল হইয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ আস্তেব্যস্তে তাঁহার সেই প্রকান্ড দেহ কোলে তুলিয়া সেবা করিতে লাগিলেন। কতক্ষণ পরে নিত্যানন্দের চৈতন্য হইলে তিনি প্রেমভরে শ্রীগৌরাঙ্গকে আলিঙ্গন করিলেন। এইরূপে শ্রীগৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দের মধ্যে যে প্রেমের বন্ধন হইল, সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে কোন অবস্থায়, কখনও তাহার ক্ষয় হয় নাই।

শ্রীগৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাচার্য এই তিনজনেই—বাঙ্গালায় নূতন বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক। শ্রীগৌরাঙ্গই মূলশক্তি এবং আর দুইজন তাঁহার প্রধান সহায়কারী ছিলেন। এইজন্য বৈষ্ণবেরা শ্রীগৌরাঙ্গকে "মহাপ্রভু" এবং নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতকে "প্রভু" আখ্যায় অভিহিত করিয়া থাকেন।

আরও একজন মহাপুরুষ এই সময়ে আসিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গে মিলিত হইয়াছিলেন, যাঁহার কথা না বলিলে, বর্তমান প্রসঙ্গ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। তিনি পুণ্যশ্লোক ঠাকুর হরিদাস। তাঁহার মহৎ জীবন কথা আলোচনা করিলে দেহ পবিত্র, মন উন্নত হয়। হরিদাসের জন্মস্থান যশোর জেলায় বূঢ়ন গ্রামে। কেহ কেহ বলেন, তিনি ব্রাহ্মণ-তনয়, শিশুকালে পিতৃমাতৃহীন অবস্থায় মুসলমান গৃহে পালিত হইয়াছিলেন। আবার কেহ কেহ বলেন যে, তিনি মুসলমানের ঘরেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এইজন্য তিনি যবন হরিদাস ও ব্রহ্মহরিদাস এই উভয় নামেই খ্যাত। প্রকৃতপক্ষে হরিদাসের জন্মসম্বন্ধে কিছুই সঠিক জানা যায় না। হরিদাসের জন্মবৃত্তান্ত যাহাই হউক, তিনি যে বাল্যকাল হইতে পরম ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রথম যৌবনেই গৃহত্যাগ করিয়া তিনি নানাস্থানে নির্জনে সাধন ভজন করিতে থাকেন। যশোর জেলার বেণাপোল গ্রামের বনমধ্যে তিনি কিছু দিন থাকিয়া সাধন ভজন করেন। কিন্তু স্থানীয় বৈষ্ণবদ্বেষী জমিদার রামচন্দ্র খাঁর অত্যাচারে তাঁহাকে সে স্থান ত্যাগ করিতে হয়। রামচন্দ্র খাঁ অন্য উপায়ে হরিদাসকে জব্দ করিতে না পারিয়া শেষে তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য এক বেশ্যাকে নিয়োজিত করে। বেশ্যা প্রতিদিন হরিহাসের কুটীরে আসিয়া বসিয়া থাকিত, কিন্তু হরিদাস তন্ময় চিত্তে ভগবানের নাম জপ করিতেন, তাহার দিকে ভ্রূক্ষেপও করিতেন না। কয়েকদিন এইরূপ হওয়ার পর, বেশ্যার মন ফিরিয়া গেল. সে অনুতপ্ত হইয়া বেশ্যাবৃত্তি ত্যাগ করিয়া হরিদাসের চরণে আশ্রয় লইল। হরিদাস বেশ্যাকে দীক্ষাদান করিয়া নিজের ভজনকুটীর তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া বেণাপোল গ্রাম ত্যাগ করিলেন।

তবে সেই বেশ্যা গুরুর আজ্ঞা লইল।
গৃহবিত্ত যেবা ছিল ব্রাহ্মণেরে দিল॥

মাথামুড়ি একবস্ত্রে রহিলা সেই ঘরে।
রাত্রি দিনে তিনলক্ষ নাম জপ করে॥
প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবী হইল পরম মহান্তী।
বড় বড় বৈষ্ণব তার দর্শনেতে যান্তি॥
বেশ্যার চরিত্র দেখি লোকে চমৎকার।
হরিদাসের মহিমা কহে করি নমস্কার॥ —(চৈতন্যচরিতামৃত)

বেণাপোল হইতে হরিদাস সপ্তগ্রাম পরগণায় চাঁদপুর গ্রামে আসিলেন। হিরণ্য ও গোবর্ধন দুই ভাই তখন সপ্তগ্রাম পরগণার মজুমদার বা জমিদার। তাঁহাদের পুরোহিত ব্রাহ্মণ বলরামের গৃহে অতিথিরূপে তিনি রহিলেন এবং মধ্যে মধ্যে মজুমদারের সভায় যাইয়া নাম-মাহাত্ম্য কীর্তন করিতে লাগিলেন। সেইখানেই বালক রঘুনাথ দাসের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হয়, ও ভক্তির বীজ বপন করেন। রঘুনাথ গোবর্ধনের পুত্র ও হিরণ্যের ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। ভক্তশ্রেষ্ঠ রঘুনাথ দাস যৌবনকালেই রাজার ন্যায় ঐশ্বর্য ত্যাগ করিয়া নীলাচলে গমন করেন এবং সমস্ত জীবন কঠোর বৈরাগ্য ও সাধনভজন করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন। মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের তিনি একজন প্রধান শিষ্য ও সহচর।

চাঁদপুরে কিছুদিন থাকিয়া হরিদাস শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্যের নিকটে আসিলেন। অদ্বৈত পরমসমাদরে ভক্ত হরিদাসকে সম্বর্ধনা করিলেন এবং শান্তিপুরের নিকটবর্তী ফুলিয়ায় গঙ্গাতীরে সাধনভজন করিবার জন্য তাঁহার জন্য একটি গুহা নির্মাণ করাইয়া দিলেন। হরিদাস এই নির্জন স্থানে থাকিয়া সর্বক্ষণ নাম জপ করিতেন। অদ্বৈতাচার্য যাইয়া তাঁহার সঙ্গে কৃষ্ণকথা আলোচনা করিতেন, তাঁহাকে গীতা ও ভাগবত ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইতেন এবং পরম শ্রদ্ধাভরে তাঁহাকে অন্নপান যোগাইতেন। হরিদাস একদিন কহিলেন,—গোঁসাই, আমি পতিত যবন, আর তুমি ব্রাহ্মণসমাজের চূড়ামণি, আমাকে অন্ন দিলে ব্রাহ্মণসমাজে তোমার নিন্দা হইবে যে! তোমার যাহাতে নিন্দা হয়, এরূপ কার্য করা উচিত নয়।

অদ্বৈত হাসিয়া বলিলেন—"আমি শাস্ত্র অনুসারেই আচরণ করি। তুমি মহাভক্ত, তুমি খাইলে কোটী ব্রাহ্মণভোজনের ফল হয়।" এই বলিয়া অদ্বৈতাচার্য ব্রাহ্মণের ভোজ্য শ্রাদ্ধপাত্র আনিয়া হরিদাসকে ভোজন করাইলেন। "পতিত যবন" অপবাদ সত্ত্বেও, ভগবদ্ভক্তিতে হরিদাস কতদূর পূজ্য হইয়াছিলেন, এই একটি ঘটনাই তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ। সমাজপতি ব্রাহ্মণ হইয়াও অদ্বৈতাচার্যের কত বড় মনের বল ছিল, এই ঘটনায় তাহাও বুঝা যায়।

হরিদাস ঠাকুরের মহিমার অন্ত নাই। বৈষ্ণব "যবন হরিদাসের" নাম

চারিদিকে প্রচারিত হইলে, স্থানীয় মুসলমান মুলুকপতি সুবাদার তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি নানাপ্রকারে হরিদাসকে বুঝাইয়া বলিলেন,—"তুমি মুসলমান ধর্ম ছাড়িয়া হিন্দু বৈষ্ণব হইয়াছ, এর চেয়ে লজ্জা ও দুঃখের কথা কি আছে? অতএব আমার অনুরোধ, তুমি হিন্দুধর্ম ত্যাগ করিয়া পুনর্বার কলমা পড়িয়া মুসলমান হও।" হরিদাস হাসিয়া কহিলেন, "এক ঈশ্বর, তাঁহার চক্ষে সকল ধর্মই সমান।"

শুন বাপ সবারই একই ঈশ্বর,
নাম মাত্র ভেদ করে হিন্দুতে যবনে।
পরমার্থে এক কহে কোরাণে পুরাণে॥ —(চৈতন্য-ভাগবত)

"আমি যদি বৈষ্ণবধর্ম বিশ্বাস করি, ইহাতে কাহার কি ক্ষতি? আমি কিছুতেই হিন্দুধর্ম ছাড়িয়া মুসলমান হইতে পারিব না।"

সুবাদার কয়েকদিন ধরিয়া হরিদাসকে অনেক বুঝাইলেন। কিন্তু হরিদাস অটল অচল, কহিলেন—

খন্ড খন্ড যদি হই যায় দেহ প্রাণ।
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম॥ —(চৈতন্য-ভাগবত)

অবশেষে সুবাদার ক্রুদ্ধ হইয়া আদেশ দিলেন যে, "হরিদাসকে বাইশ বাজারে কোড়া মার,—অর্থাৎ রাজধানীর বাইশটি বাজারে একে একে তাহাকে লইয়া গিয়া সর্বজনসমক্ষে বেত্রাঘাত কর।" সুবাদারের হুকুম পালিত হইল, রক্ষীরা তাঁহাকে একে একে প্রত্যেকটি বাজারে লইয়া নির্মমভাবে প্রকাশ্যে বেত্রাঘাত করিল। তাঁহার সর্বাঙ্গ দিয়া রক্তের ধারা বহিতে লাগিল। কিন্তু হরিদাস নীরবে শান্তভাবে সেই বেত্রাঘাত সহ্য করিলেন, বেত্রাঘাতকারীদের প্রতি একটুও রুষ্ট হইলেন না। বরং মনে মনে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, "হে ভগবান, এরা অজ্ঞান, কি অপরাধ করিতেছে, কিছুই জানে না। তুমি নির্বোধদের ক্ষমা কর, তাহাদের মনে প্রেম ও ভক্তি দাও।"

এসব জীবের প্রভু করহ প্রসাদ।
মোর দ্রোহে নহু এ সবার অপরাধ॥ —(চৈতন্য-ভাগবত)

জগতে একবার ক্রুশবিদ্ধ যীশুখৃষ্ট এইরূপ কথা বলিয়াছিলেন। হরিদাসের মহিমা যীশুখৃষ্টেরই সমতুল্য।

বেত্রাঘাত করিতে করিতে শেষে হরিদাস অচেতন হইয়া পড়িলেন। তাঁহার শ্বাসরুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। রক্ষীরা তাঁহাকে মৃত মনে করিয়া নদীর জলে ফেলিয়া দিল। কিন্তু হরিদাস মরিলেন না। নদীর জলে ভাসিতে ভাসিতে পরদিন চেতনা লাভ করিয়া উঠিয়া আসিলেন। সুবাদার এই ব্যাপার শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন এবং হরিদাসকে পুনর্বার ডাকিয়া আনিয়া কহিলেন— "তুমি যথার্থই ভগবানের ভক্ত, তোমার উপর এরূপ অত্যাচার করিয়া আমি

অত্যন্ত অন্যায় করিয়াছি। আজি হইতে তুমি স্বাধীন। তুমি যেখানে ইচ্ছা যাইবে, যে ধর্ম ইচ্ছা ভজনা করিবে, কেহ তোমাকে বাধা দিবে না।”

ফুলিয়া শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্যের আশ্রয়ে হরিদাস বহুদিন বাস করিয়াছিলেন। সেখানকার ব্রাহ্মণ সজ্জনেরা সকলেই তাঁহাকে পরম শ্রদ্ধা করিতেন। অবশেষে শ্রীগৌরাঙ্গ যখন তাঁহার বৈষ্ণব গোষ্ঠী লইয়া প্রচার আরম্ভ করিলেন, হরিদাস নবদ্বীপে আসিয়া তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইলেন। এমন একজন ভক্তশ্রেষ্ঠকে পাইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ পরমসমাদরে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। সেই হইতে হরিদাস জীবনের শেষদিন পর্যন্ত মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের অনুসরণ করিয়াছিলেন ও তাঁহার ধর্ম প্রচারের সহায় হইয়াছিলেন।

৮

কাজী দমন ও জগাই মাধাই উদ্ধার

শ্রীবাসের গৃহে প্রতি রাত্রে কীর্তন হইতে লাগিল। শ্রীগৌরাঙ্গের অসাধারণ প্রেম ও ভক্তি ক্রমে সমস্ত লোককে আকর্ষণ করিতে লাগিল, নানা অলৌকিক ভাব তাঁহার মধ্যে প্রকাশিত হইতে লাগিল। তাঁহার বন্ধু, শিষ্য ও ভক্তেরা তাঁহাকে ভগবানের অবতার বলিয়াই মনে করিতে লাগিলেন। অদ্বৈতাচার্য, নিত্যানন্দ ও হরিদাস আসিয়াও এই সময়ে শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গে যোগ দিলেন। খুব উৎসাহের সঙ্গে নূতন ধর্ম প্রচারের কার্য চলিতে লাগিল। মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ কীর্তনের দল লইয়া নগরের সর্বত্র কীর্তন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। গৃহে গৃহে কীর্তনের দল গড়িয়া উঠিল এবং ভগবানের নাম হইতে লাগিল। কিন্তু নবদ্বীপের কতকগুলি কুলোকের এই ধর্মপ্রচার ও সংকীর্তন সহ্য হইল না। তাহারা নিজে সংকীর্তনে বাধা দিবার জন্য নানারূপ চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য না হইয়া কাপুরুষের ন্যায় অবশেষে মুসলমান কাজী বা স্থানীয় শাসনকর্তার শরণাপন্ন হইল। কাজীকে তাহারা বুঝাইয়া দিল যে, নিমাই পণ্ডিত ও তাহার দলবল অহিন্দু, পাষণ্ড, সংকীর্তন করিয়া তাহারা দেশের সর্বনাশ করিতেছে। তাহাদের উচ্চ কীর্তন ও চীৎকার শুনিয়া ভগবান দেশ ছাড়িয়া পলাইয়াছেন এবং সেই কারণেই দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি হইতেছে। অতএব ইহারা যাহাতে এই অধর্মাচরণ আর না করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। বহু মুসলমানও কাজীর কাছে গিয়া কুচক্রী হিন্দুদের এই কথা সমর্থন করিল। কাজী এই সব কথা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন। একদিন নিকটে একজন হিন্দুর গৃহে কীর্তন হইতেছিল, এমন সময় কাজী উত্তেজিত ভাবে সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া কীর্তন থামাইয়া দিলেন, তাহাদের খোল করতাল ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন।

মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া লোকে কহিতে লাগিল।
এতকাল কেহ নাহি কৈল হিন্দুয়ানী।
এবে যে উদ্যম চালাও কোন্ বল জানি॥
সেহ কীর্তন না করিহ সকল নগরে।
আজি আমি ক্ষমা করি যাইতেছি ঘরে॥
আর যদি কীর্তন করিতে লাগ পাইমু।
সর্বস্ব দণ্ডিয়া তার জাতি যে লইমু॥

—(চৈতন্যচরিতামৃত)

নগরের সর্বত্র কাজীর আদেশ ঘোষিত হইল, কেহ আর কীর্তন করিতে পারিবে না। লোকে ভীত ও উদ্বিগ্ন হইল। নগরবাসীরা শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট গিয়া বিষণ্ণচিত্তে এই সব কথা নিবেদন করিল। শ্রীগৌরাঙ্গ ধীরস্থির ভাবে কাজীর অত্যাচার শুনিলেন এবং বলিলেন,—তোমরা গৃহে গিয়া স্বচ্ছন্দে কীর্তন কর, কাজীর ভয় করিও না। নগরবাসিগণ মহাপ্রভুর কথা শুনিয়া নিজ নিজ গৃহে কীর্তন করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাদের মনের ভয় দূর হইল না। মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ তাহা বুঝিতে পারিয়া প্রকাশ্যে ঘোষণা করিলেন—

নগরে নগরে আজি করিব কীর্তন।
সন্ধ্যাকালে কর সবে নগর মণ্ডন॥
সন্ধ্যাতে দেউটী সব জ্বাল ঘরে ঘরে।
দেখ কোন্ কাজী আসি মোরে মানা করে॥

তাহাই হইল। নগরবাসীরা সাহস পাইয়া তাহাদের ঘরদ্বার পত্রপুষ্পে সাজাইল,—দীপাবলী জ্বালিল,—চারিদিকে একটা উৎসাহ ও উত্তেজনার সাড়া পড়িয়া গেল।

মহাপ্রভু তিনটি কীর্তনের দল গঠন করিয়া নগরকীর্তনে বাহির হইলেন। প্রথম দলে থাকিলেন হরিদাস, দ্বিতীয় দলে অদ্বৈতাচার্য এবং তৃতীয় দলে স্বয়ং মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ। এই তিন দলে বিভক্ত হইয়া মহা সমারোহে নগর সঙ্কীর্তন চলিল, নগরের সর্বত্র ভ্রমণ করিয়া তাঁহারা কীর্তন করিতে লাগিলেন। লোকে কাজ কর্ম ফেলিয়া মহোৎসাহে কীর্তনের দলে যোগ দিল এবং দেখিতে দেখিতে একটি একটি দল বিশাল জনারণ্যে পরিণত হইল। মৃদঙ্গ ও করতালের বাদ্যে ও হরিধ্বনিতে চারিদিক্ মুখরিত হইতে লাগিল। ক্রমে কীর্তনের দলসহ সেই বিশাল লোকারণ্য লইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ কাজীর গৃহের দিকে চলিলেন। কাজী পূর্ব হইতেই ব্যাপার দেখিয়া একটু ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি বাহিরে না আসিয়া গৃহমধ্যে অন্তরালে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার কীর্তনের দল ও বিশাল জনসঙ্ঘের সহিত আসিয়া কাজীর গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন এবং সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকদের দ্বারা কাজীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। কাজী আসিলে তাঁহাকে যথোচিত সম্মানসহকারে বসাইয়া কহিলেন—"আমি তোমার গৃহে অভ্যাগতরূপে আসিয়াছি, অতএব আমার উপর তোমার বিরূপ ভাব থাকা উচিত নহে।"

কাজীও একটু লজ্জিত হইয়া বলিলেন, তোমার মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্তী গ্রাম সম্বন্ধে আমার "চাচা" হন, অতএব সে হিসাবে তুমি আমার ভাগিনেয়। তোমার উপর আমার কোন রাগ নাই।

শ্রীগৌরাঙ্গ কহিলেন—তুমি কাজী হিন্দুধর্মবিরোধী, নগরে সংকীর্তন নিষেধ করিয়া দিয়াছ। কিন্তু এখন যে আমি এত লোক লইয়া নগরের সর্বত্র সংকীর্তন করিয়া আসিলাম, আমাদের কিছু বলিতেছ না কেন?

কাজী কহিলেন,—হিন্দুদের সংকীর্তন বন্ধ করিবার আমার তেমন ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু কয়েকজন হিন্দুই আসিয়া তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কাছে নালিশ করিয়াছে।

আসি কহে হিন্দুর ধর্ম ভাঙ্গি নিমাই।
যে কীর্তন প্রবর্তাই কভু শুনি নাই॥

* * *

উচ্চ করি গায় গীত দেয় করতালি।
মৃদঙ্গ করতাল শব্দে কর্ণে লাগে তালি॥
কি জানি কি খাঞা মত্ত হৈয়া নাচে গায়।
হাসে কাঁদে পড়ে উঠে গড়াগড়ি যায়॥
নগরীয়াকে পাগল কৈল সদা সংকীর্তন।
রাত্রে নিদ্রা নাহি যাই করি জাগরণ॥
নিমাই নাম ছাড়ি এবে বলায় গৌরহরি।
হিন্দু ধর্ম নাই কৈল পাষণ্ডী সঞ্চারি॥
কৃষ্ণের কীর্তন করে নীচ বার বার।
এই পাপে নবদ্বীপ হইবে উজাড়॥—(চৈতন্যচরিতামৃত)

"তাহাদের কথা শুনিয়াই আমি সংকীর্তন বন্ধের আদেশ দিয়াছিলাম। কিন্তু এখন আমি আমার ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছি। আমার সে আদেশ প্রত্যাহার করিলাম। নগরে হিন্দুরা স্বচ্ছন্দে সংকীর্তন করিতে পারিবে।"

এই বলিয়া কাজী শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট ক্ষমাভিক্ষা করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গও প্রসন্নমনে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। সেই হইতে কাজীর স্বভাবের সম্পূর্ণ পরিবর্তন হইল। তিনিও ক্রমে ক্রমে মহা কৃষ্ণভক্ত হইয়া উঠিলেন। নবদ্বীপে কাজীর সমাধিভূমি এখনও বৈষ্ণবেরা পবিত্র স্থান বলিয়া গণ্য করেন।

এইরূপে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেমের বলে সংকীর্তনবিরোধী মুসলমান কাজীকে জয় করিয়া লইলেন। অন্যায়কে অধর্মকে তিনি মাথা পাতিয়া কিছুতেই মানিয়া লন নাই, অকুতোভয়ে সেই অন্যায় আদেশ লঙ্ঘন করিয়া সত্যের মহিমা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

কাজীর চিত্তকে এই ভাবে জয় করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ সদলবলে মহোৎসাহে নূতন ধর্মপ্রচারে ব্রতী হইলেন। নিত্যানন্দ ও হরিদাসের উপর নগরের সর্বত্র

হরিনাম প্রচারের আদেশ দিলেন, নিজেও সংকীর্তনের দল লইয়া প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

নিত্যানন্দ ও হরিদাসের চেষ্টায় বহু নাস্তিক পাষণ্ড ভগবদ্ভক্ত হইল, অনেক পাপী দুরাচারের মন ফিরিয়া গেল। ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য "জগাই মাধাই"য়ের নাম। ইহারা দুই সহোদর ভাই, ভাল নাম জগন্নাথ ও মাধব, নবদ্বীপেই বাড়ী। উভয়েই সদ্‌ব্রাহ্মণ-বংশজাত। কিন্তু হইলে কি হয়, ভদ্রবংশে জন্মগ্রহণ করিলেও ইহাদের স্বভাব চরিত্র ও আচরণ অতি জঘন্য ছিল। ইহারা মদ খাইত ও নানারূপ কুকার্য করিয়া বেড়াইত। চুরি, দস্যুবৃত্তি, গৃহদাহ, নারীহরণ প্রভৃতি ঘোর অপরাধ করিতেও ইহাদের বাধিত না। নবদ্বীপের সাধু ও ভক্ত লোকেরা ইহাদিগকে দেখিয়া ভয় পাইত। ইহারা যে পথে থাকিত, সে পথ এড়াইয়া চলিত; সন্ধ্যার পর ইহাদের ভয়ে সাধু ব্যক্তিরা, বিশেষতঃ নারীরা গঙ্গার ঘাটে যাইতে সাহস পাইত না। এক কথায় নবদ্বীপের লোকেরা ইহাদের অত্যাচারে ও উপদ্রবে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল।

নিত্যানন্দ ও হরিদাস শ্রীগৌরাঙ্গের নির্দেশ মত ঘরে ঘরে কৃষ্ণ ভজনের উপদেশ দিয়া বেড়াইতেন।

নিত্যানন্দ হরিদাস বলে এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কর কৃষ্ণ শিক্ষা॥

যাহারা সৎলোক, তাহারা এই উপদেশ শুনিয়া সন্তোষ লাভ করিত, কিন্তু দুষ্ট লোকেরা নানারূপ কটু কথা শুনাইয়া দিত। নিত্যানন্দ হরিদাস তাহাতে বিচলিত হইতেন না, তাঁহারা সমস্ত বিদ্রূপ ও নিন্দা সহ্য করিয়া হাসি মুখে ঘরে ঘরে হরিনাম প্রচার করিতেন।

একদিন নিত্যানন্দ ও হরিদাস এইরূপে নগরে ভ্রমণ করিতেছেন, পথে জগাই মাধাইয়ের সঙ্গে তাঁহাদের দেখা হইল। জগাই মাধাই দুই জনে মাতাল হইয়া রাস্তায় মারামারি করিতেছে এবং নানারূপ কুৎসিত কথা চীৎকার করিয়া বলিতেছে। কখন কখন গড়াইয়া রাস্তার উপরে পড়িতেছে, আবার উঠিয়া চীৎকার করিতেছে। তাহাদের এই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া নিত্যানন্দের মনে করুণা হইল, হরিদাসকে চুপি চুপি বলিলেন, "হরিদাস, প্রভুর (শ্রীগৌরাঙ্গের) আজ্ঞা, হরিনাম দিয়া পাপী তাপীকে উদ্ধার করিতে হইবে। এই দুইজনের মত পাপী পাষণ্ড আর কোথায় আছে? অতএব সদুপদেশ দিয়া ইহাদিগকে উদ্ধার করিতে হইবে।" হরিদাস হাসিয়া বলিলেন—"ঠাকুর, তোমার যেমন ইচ্ছা।"

এইরূপ পরামর্শ করিয়া নিত্যানন্দ ও হরিদাস দুই জনে জগাই মাধাইয়ের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া ভদ্র ব্যক্তিরা সকলেই নিষেধ করিতে লাগিল, বলিল—উহারা দুই জনে মাতাল, গুণ্ডা, উহাদের কাছে যাইও

না, গেলে তোমাদের মারিয়া ফেলিবে। কিন্তু তথাপি নিত্যানন্দ ও হরিদাস জগাই মাধাইয়ের নিকটে গেলেন এবং তাহাদের মিনতি করিয়া বলিলেন—

বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ লহ কৃষ্ণ নাম।
কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণ ধন প্রাণ॥
তোমাসবা লাগিয়া কৃষ্ণের অবতার।
হেন কৃষ্ণ ভজ সব ছাড় অনাচার॥ —(চৈতন্য-ভাগবত)

ডাক শুনিয়া জগাই মাধাই রক্তবর্ণ চক্ষুতে চাহিল এবং সম্মুখে সন্ন্যাসী-বেশী দুইজনকে দেখিয়া "ধর ধর" বলিয়া তাড়া করিল। নিত্যানন্দ ও হরিদাস উভয়েই মাতালদের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য ছুটিয়া পলায়ন করিলেন। ভদ্র ব্যক্তিরা কহিলেন, "তখনই তো তোমাদের নিষেধ করিয়াছিলাম, ঐ দুই মাতালের নিকটে যাইও না, উহাদের কি কাণ্ডজ্ঞান আছে?" দুষ্ট লোকেরা মনে মনে হাসিয়া বলিল—"এই দুই ভণ্ড সন্ন্যাসীর উপযুক্ত শাস্তি হইয়াছে, সব তাতেই এদের বাড়াবাড়ি!"

এদিকে জগাই মাধাই "ধর ধর" করিয়া পিছনে পিছনে ছুটিতে লাগিল, নিত্যানন্দ হরিদাসও দ্রুতবেগে দৌড়াইতে লাগিলেন। কিন্তু জগাই মাধাই একে স্থূল শরীর, তাহাতে মাতাল, সুতরাং তাহারা বেশীদূর ছুটিতে পারিল না, অবশেষে পথের মধ্যে নিজেরাই পরস্পর বিবাদ বাধাইয়া দিল।

নিত্যানন্দ ও হরিদাস হাঁপাইতে হাঁপাইতে মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের বাড়ীর আঙ্গিনায় প্রবেশ করিলেন। সে সময়ে তথায় গঙ্গাদাস, শ্রীবাস, অদ্বৈতাচার্য প্রভৃতি শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গে কথা বলিতেছিলেন। নিত্যানন্দ ও হরিদাসকে এরূপ অবস্থায় দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইলেন। হরিদাস আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিয়া রহস্যচ্ছলে কহিলেন,—এই নিত্যানন্দ ঠাকুরের সঙ্গে গিয়াই এমন বিপদে পড়িতে হইল। ইঁহার তো কাণ্ডজ্ঞান নাই, যাহাকে দেখেন, তাহাকেই বলেন, "বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ লহ কৃষ্ণ নাম"। কখন নদীর জলে নামিয়া বালকদের সঙ্গে সাঁতার কাটেন, কখন ষাঁড়ের মাথায় তাহার ঝুঁটি ধরিয়া চড়িয়া বসেন। এমন পাগলের সঙ্গে আর কখন যাইব না।"

শ্রীগৌরাঙ্গ হাসিয়া বলিলেন—"সেই দুই মাতাল কে? নবদ্বীপে এমন লোকও আছে নাকি?"

নিত্যানন্দ কহিলেন—"আহা, তারা বড় পাপী, বড় দুঃখী,—সৎ ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও তাহাদের অনাচারের সীমা নাই, তাহাদিগকে উদ্ধার করিতেই হইবে!"

অদ্বৈতাচার্য এই কথা সমর্থন করিয়া হরিদাসের দিকে চাহিয়া রঙ্গভরে কহিলেন—হরিদাস, তুমি ঠিক কথাই বলিয়াছ, এই নিত্যানন্দ ঠাকুরের বুদ্ধি-শুদ্ধি ভাল নয়,—

নিত্যানন্দ করিবে সকলে মাতোয়াল।
উহার চরিত্র আমি জানি ভালে ভাল॥
এই দেখ তুমি দিন দুই তিন ব্যাজে।
সেই দুই মদ্যপ আনিবে গোষ্ঠী মাঝে॥

* * *

নিমাই নিতাই দুই নাচিবে মিলিয়া॥
একাকার করিবেক এই দুই জনে।
জাতি লয়ে তুমি আমি পলাই যতনে॥*

শ্রীগৌরাঙ্গ সমস্ত কথা শুনিয়া জগাই মাধাইয়ের প্রতি দয়ার্দ্রচিত্ত হইলেন এবং তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে মনস্থ করিলেন।

জগাই মাধাই পূর্বের মতই মদ খাইয়া অনাচার করিয়া বেড়াইতে লাগিল। একদিন রাত্রিকালে নিত্যানন্দ একাকী নগর ঘুরিয়া বাড়ী ফিরিতেছেন। জগাই মাধাই পথেই মাতলামি করিতেছিল, "কে রে কে রে" বলিয়া নিত্যানন্দকে ধরিয়া ফেলিল।

নিত্যানন্দ বলিলেন—"আমি অবধূত নিত্যানন্দ, বাড়ী যাইতেছি।" 'অবধূত' নাম শুনিয়াই মাধাই মহাক্রোধে উন্মত্ত হইয়া রাস্তার নর্দমা হইতে একটি ভাঙ্গা কলসীর কাণা তুলিয়া নিত্যানন্দের দিকে ছুঁড়িয়া মারিল। নিত্যানন্দের মাথা কাটিয়া দর দর ধারে রক্ত পড়িতে লাগিল। নিত্যানন্দ মার খাইয়াও হাসিতে লাগিলেন, কহিলেন,—মাধাই—

কহ কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ লহ কৃষ্ণ নাম।
যে জন শ্রীকৃষ্ণ ভজে সে আমার প্রাণ॥

মাধাই আরও ক্রুদ্ধ হইয়া পুনর্বার কলসীর কাণা তুলিয়া নিত্যানন্দকে মারিতে উদ্যত হইল। জগাইয়ের মনে দয়া হইল, সে মাধাইয়ের হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল—"ওরে মাধাই, আর মারিস্ না, দেখছিস্ না, সন্ন্যাসীর মাথা কাটিয়া রক্ত পড়িতেছে!" ইতিমধ্যে গোলমাল শুনিয়া বহুলোক জমিয়া গেল, শ্রীগৌরাঙ্গও সাঙ্গোপাঙ্গসহ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলে দেখিলেন—

নিত্যানন্দের অঙ্গে সব রক্ত পড়ে ধারে।
হাসে নিত্যানন্দ সেই দুয়ের ভিতরে॥

---

* মাতোয়াল—হরিনামে মাতোয়ারা। ব্যাজে—বিলম্বে। সেই দুই মদ্যপ......মাঝে—অর্থাৎ তাহাদিগকে বৈষ্ণব করিয়া আমাদের দলের ভিতর আনিবেন। একাকার করিবেক ইত্যাদি—অর্থাৎ ইহারা আচণ্ডাল সকলকে হরিনাম বিতরণ করিবেন, জাতিভেদ লোপ করিবেন।

এই দৃশ্য দেখিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের অত্যন্ত ক্রোধ হইল, তিনি জগাই মাধাইকে শাস্তি দিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গকে শান্ত করিয়া বলিলেন,— "দৈবক্রমে আমার অঙ্গে রক্ত পড়িয়াছে, কিন্তু আমার কোন কষ্ট হয় নাই, জগাই মাধাইয়েরও কোন দোষ নাই, বিশেষতঃ জগাই মাধাইয়ের হাত ধরিয়া মারিতে নিষেধ করিয়াছিল।"

আথেব্যথে নিত্যানন্দ করে নিবেদন॥
মাধাই মারিতে প্রভু রাখিল জগাই।
দৈবে সে পড়িল রক্ত দুঃখ নাহি পাই॥
মোরে ভিক্ষা দেহ প্রভু এ দুই শরীর।
কিছু দুঃখ নাহি মোর তুমি হও স্থির॥

জগাই নিত্যানন্দকে রক্ষা করিয়াছে শুনিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ সুখী হইয়া জগাইকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন এবং বলিলেন—"কৃষ্ণ তোমাকে কৃপা করুন, আজি হইতে ভগবানে তোমার প্রেম ভক্তি হোক।"

মহাপ্রভুর আশীর্বাদে জগাইয়ের মন ফিরিয়া গেল, সে মূর্ছিত হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল, শ্রীগৌরাঙ্গ তাহাকে কোলে তুলিয়া লইলেন। জ্ঞান হইলে জগাই "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

মাধাই তখনও নিত্যানন্দকে মারিবার জন্য কাপড় চাপিয়া ধরিয়াছিল। কিন্তু জগাইয়ের এই পরিবর্তন দেখিয়া মাধাইয়ের পাষাণ হৃদয়ও বিচলিত হইল, সে শ্রীগৌরাঙ্গের চরণ ধরিয়া অনুতপ্তচিত্তে দয়া ভিক্ষা করিতে লাগিল।

শ্রীগৌরাঙ্গ কহিলেন,—"তুমি নিত্যানন্দকে প্রহার করিয়া তাঁহার নিকট মহা অপরাধ করিয়াছ, তাঁহার নিকট আগে ক্ষমা ভিক্ষা চাও, তিনি না ক্ষমা করিলে তোমার উদ্ধার নাই।"

মাধাই তখন গিয়া নিত্যানন্দের চরণ আঁকড়াইয়া ধরিল। নিত্যানন্দের মনে বিন্দুমাত্রও ক্রোধ হয় নাই, বরং এই মহাপাপীর প্রতি অসীম করুণা তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিয়াছিল। তিনি মাধাইকে আলিঙ্গন করিয়া মহাপ্রভুকে কহিলেন—

কোন জন্মে থাকে যদি আমার সুকৃত।
সব দিল মাধাইয়েরে শুনহ নিশ্চিত॥
মোর যত অপরাধ, কিছু দায় নাই।
মায়া ছাড় কৃপা কর তোমার মাধাই॥

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রসন্ন হইয়া মাধাইকেও তখন আশীর্বাদ করিলেন এবং প্রেমভরে তাহাকে আলিঙ্গন দিলেন।

তারপর জগাই মাধাইকে সঙ্গে করিয়া মহাপ্রভু নিজ বাড়ীতে গিয়া সাঙ্গো-

পাঙ্গসহ আনন্দে কীর্তন করিতে লাগিলেন, জগাই মাধাইও সেই কীর্তনে যোগ দিয়া ধন্য হইল।

সেই হইতে জগাই মাধাইয়ের চরিত্রের সম্পূর্ণ পরিবর্তন হইল, মদ্যপান ও সর্বপ্রকার অনাচার ছাড়িয়া তাহারা পরম সাধু বৈষ্ণব হইয়া উঠিল। অতি প্রত্যুষে উঠিয়া তাহারা দুই ভাই গঙ্গাস্নানে যাইত এবং স্নান করিয়া তীরে বসিয়া দুই লক্ষ হরিনাম জপ করিত। ব্রাহ্মণ সাধু সজ্জন যে কেহ গঙ্গাতীরে আসিত, তাহাদের নিকট যোড়হস্তে নিজেদের পাপমুক্তির জন্য আশীর্বাদ ভিক্ষা করিত। পূর্বের অনাচারপূর্ণ জীবনের জন্য তাহাদের চিত্ত সর্বদা অনুতাপে দগ্ধ হইত। সর্বক্ষণ ভগবানের নাম কীর্তন ও স্মরণ করাই এখন তাহাদের একমাত্র কাজ হইয়া উঠিল, শয়ন ভোজনের জ্ঞানও আর রহিল না। শ্রীগৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ আসিয়া বহু যত্নে তাহাদের আহার করাইতেন।

এইরূপে জগাই মাধাই দুইভাই কঠোর তপস্যা করিয়া নবদ্বীপে শ্রেষ্ঠ ভক্তবৈষ্ণব বলিয়া খ্যাতি লাভ করিলেন। মাধাই স্বহস্তে কোদালি দিয়া মাটি কাটিয়া স্নানার্থীদের সুবিধার জন্য গঙ্গাতীরে একটি ঘাট প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাহা এখনও "মাধাইয়ের ঘাট" নামে প্রসিদ্ধ।

জগাই মাধাইয়ের উদ্ধারে নবদ্বীপের সকলেই বিস্মিত ও আনন্দিত হইল। শ্রীগৌরাঙ্গ ও তাঁহার বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা ও ভক্তি বাড়িয়া গেল। শ্রীগৌরাঙ্গ যে সাধারণ মানুষ নহেন, অসাধারণ শক্তিধর, এই বিশ্বাস তাহাদের মনে দৃঢ় হইল।

৯

শ্রীগৌরাঙ্গের গৃহত্যাগ ও সন্ন্যাস

শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তবৃন্দ সঙ্গে লইয়া কখন শ্রীবাসের গৃহে, কখন শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর গৃহে কীর্তন রসে নিমগ্ন হইয়া থাকিতেন, নিত্যানন্দ হরিদাস প্রভৃতির সঙ্গে নগরের সর্বত্র হরিনাম প্রচার করিয়া বেড়াইতেন। অজ্ঞ মূর্খ দরিদ্র নীচ অন্ত্যজ কেহই তাঁহার কৃপা হইতে বঞ্চিত হইত না। নবদ্বীপে সকলেরই তিনি অতি প্রিয় হইয়া উঠিলেন। কেবল এক শ্রেণীর লোক—শুষ্ক জ্ঞানী, দাম্ভিক পণ্ডিতগণ এবং বাহ্য আচারপরায়ণ গোঁড়ার দল তাঁহার প্রতি বিরূপ হইল;—তাঁহার প্রভাব প্রতিপত্তি লোকপ্রিয়তা যতই বাড়িতেছিল, তাহারাও ততই ঈর্ষা দেবষে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে লাগিল। কাহার নিকটে নালিশ করিয়াও যখন তাহারা কোন ফল পাইল না, তখন শ্রীগৌরাঙ্গের বিরুদ্ধে তাহারা নানা মিথ্যা নিন্দা প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিল। শ্রীগৌরাঙ্গ জাতি-বৈষম্য মানিতেন না, উচ্চনীচ সকলেই তাঁহার দৃষ্টিতে সমান ছিল, আচণ্ডালে তিনি হরিনাম বিতরণ করিতেন। ইহাতে আচারনিষ্ঠ গোঁড়ার দল তাঁহার উপর আরও বেশী ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। বর্ণের অভিমান, আভিজাত্য গর্বই সমাজে যাহাদের প্রভাব প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠার এক মাত্র সম্বল, তাহাদের পক্ষে ইহাই স্বাভাবিক। তাহারা বলিত, নিমাই পণ্ডিত একে উদ্ধত উচ্ছৃঙ্খল, তার উপরে তাঁহার সঙ্গে অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ এই দুই অনাচারী পাগল জুটিয়া তাঁহাকে একেবারে কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানহীন করিয়া তুলিয়াছে।

এদিকে শ্রীগৌরাঙ্গের ভগবানে প্রেম ও তন্ময়তা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অনেক সময়ই তিনি সেই প্রেমের প্রাবল্যে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া যাইতেন, দুষ্টলোকে তাঁহার এই ভাবকে বায়ুব্যাধি বা মূর্ছারোগ বলিয়া প্রচার করিত। যাহাদের নিজেদের মনে ভগবৎপ্রেম বা ভক্তির লেশমাত্র নাই, তাহারা কিরূপে শ্রীগৌরাঙ্গের এই উচ্চভাবের গূঢ়মর্ম বুঝিবে?

শ্রীগৌরাঙ্গ কখন কখন ব্রজগোপীর ভাবে মগ্ন হইয়া শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিতেন, কখন বা ভক্তিমতী ব্রজগোপীদের কথা ভাবিতে ভাবিতে "গোপী" "গোপী" নাম জপ করিতেন। একদিন তিনি স্বগৃহে বসিয়া এই ভাবে "গোপী" "গোপী" বলিয়া জপ করিতেছিলেন, এমন সময় শ্রীগৌরাঙ্গের ভূতপূর্ব সহাধ্যায়ী একজন টোলের "পড়ুয়া" বা ছাত্র তাঁহাকে দেখিতে আসিল। পড়ুয়া শ্রীগৌরাঙ্গের মুখে 'গোপী' নাম শুনিয়া বিদ্রূপ করিয়া বলিল—

'গোপী' 'গোপী' কেন বল নিমাই পণ্ডিত।
'গোপী' 'গোপী' ছাড়ি কৃষ্ণ বলহ ত্বরিত॥

কি পুণ্য জন্মিবে গোপী গোপী নাম লৈলে।
কৃষ্ণনাম লৈলে সে পুণ্য বেদে বলে॥

শাস্ত্রে কৃষ্ণনাম জপ করিবারই বিধি আছে, 'গোপী' নাম জপ করিবার কথা তো কখনও শুনি নাই; তুমি এরূপ শাস্ত্রবিরোধী অদ্ভুত কার্য কেন করিতেছ, নিমাই পণ্ডিত?

শ্রীগৌরাঙ্গ তখন ভগবৎপ্রেমে বিভোর ছিলেন, সাধনায় এরূপ বিঘ্ন ঘটাতে তিনি হঠাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া একখানি লাঠি লইয়া পড়ুয়াকে মারিবার জন্য তাড়া করিলেন। পড়ুয়া ভয়ে পলাইয়া গেল। শ্রীগৌরাঙ্গও কিছুদূর পর্যন্ত তাহার পশ্চাতে ছুটিলেন। অবশেষে শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তবৃন্দ আসিয়া তাঁহাকে শান্ত করিয়া বাড়ীতে ফিরাইয়া আনিলেন।

এদিকে সেই পড়ুয়া গিয়া অন্যান্য ছাত্রদের নিকটে সমস্ত ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া বলিল—"এই নিমাইপণ্ডিত পাগল হইয়াছে। সে কৃষ্ণনাম ছাড়িয়া 'গোপী' 'গোপী' জপ করিতেছে। আমি বন্ধুভাবে তাহাকে সে কথা বলিতে গেলাম, প্রত্যুত্তরে সে আমাকে লাঠি লইয়া মারিতে আসিল।" এইসব পাণ্ডিত্য-গর্বী পড়ুয়াদের 'নিমাই পণ্ডিতের' উপর মনের ভাব একেই ভাল ছিল না। তাহার উপর এই ঘটনা শুনিয়া তাহারা ঘোর উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তাহারা পরস্পর বলিতে লাগিল,—"কী, নিমাই পণ্ডিতের এত বড় স্পর্ধা! তাঁহার এতই কি মান? তিনিও ব্রাহ্মণ, আমরাও তাহারই মত ব্রাহ্মণের তেজ ধারণ করি; তিনি আমাদের মারিবেন, আমরা তাহা সহ্য করিব কেন? তিনি তো আর দেশের রাজা নহেন? তিনি নবদ্বীপের জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র, আমাদের বাপ পিতামহও কম সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন না। আর আমরা তো সেদিন পর্যন্ত নিমাই পণ্ডিতের সঙ্গে একই টোলে পড়িয়াছি, তিনি ইহার মধ্যে হঠাৎ 'গোঁসাই' হইয়া উঠিলেন কিরূপে?"

পড়ুয়ারা কেবল এইরূপ কথা বলিয়া ক্ষান্ত হইল না, তাহারা নবদ্বীপময় ইহা লইয়া ঘোর আন্দোলন উপস্থিত করিল এবং গোঁড়া পণ্ডিত সমাজ এই সুযোগ পাইয়া নিমাই পণ্ডিতের শত্রুতাসাধনের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিল। তাহারা বলিতে লাগিল—"নিমাই পণ্ডিত সমস্ত দেশ নষ্ট করিল,—সে ব্রাহ্মণকে মারিতে চাহে, তাহার কিছুমাত্র ধর্মভয় নাই!"

শ্রীগৌরাঙ্গ লোকমুখে এই সমস্ত কথা শুনিয়া অত্যন্ত ব্যথিত ও চিন্তান্বিত হইলেন। তিনি মনে মনে ভাবিলেন,—এইসব শুষ্ক জ্ঞানী, দাম্ভিক পণ্ডিত, ইহাদের হৃদয়ে কিরূপে ভক্তি সঞ্চার করা যায়? আমাকে ইহারা এখন মানে না, আমার কথা শোনেও না, কেননা আমি তাহাদের নিকট সেদিনকার 'নিমাই পণ্ডিত' মাত্র! কিন্তু যদি আমি সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হই, তাহা হইলে ইহারা আমাকে মানিতে বাধ্য হইবে, কেননা সন্ন্যাসীকে সকলেই শ্রদ্ধা

করে। আর তখন সহজেই এইসব বিদ্যাগর্বী পণ্ডিতদিগকে আমি কৃষ্ণনাম গ্রহণ করাইতে পারিব। নিত্যানন্দ, চন্দ্রশেখর আচার্য, গদাধর প্রভৃতি কয়েকজন অন্তরঙ্গ ভক্তকে ডাকিয়া তিনি নিজের মনের এই সংকল্প ব্যক্ত করিলেন। তাঁহারা প্রথমে শ্রীগৌরাঙ্গকে সন্ন্যাসগ্রহণের সংকল্প হইতে নিবৃত্ত করাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য না হইয়া অগত্যা সম্মতি প্রদান করিলেন। এমন সময়ে কাটোয়ার সন্ন্যাসী কেশব ভারতী একদিন নবদ্বীপে আসিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহাকে পরম সমাদরে গৃহে লইয়া গিয়া অতিথি সৎকার করিলেন এবং সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষা লইবার জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা জানাইলেন। কেশব ভারতীও এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

ক্রমে ভক্তগণের মধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গের এই সন্ন্যাস গ্রহণের সংকল্প প্রচারিত হইয়া গেল। তাঁহারা সকলেই অত্যন্ত বিষণ্ণ ও মনঃক্ষুণ্ণ হইলেন এবং শ্রীগৌরাঙ্গকে গৃহে থাকিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহাদিগকে নানারূপে বুঝাইয়া শান্ত করিলেন, বলিলেন,—লোকের মঙ্গলের জন্যই তিনি এই ভাবে গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস লইতেছেন। মাতা শচীদেবীকেও তিনি আভাসে নিজের গৃহত্যাগের সংকল্প জানাইলেন। শচীদেবী কিছুদিন হইতে এই আশংকাই করিতেছিলেন। পুত্রের এই কথা শুনিয়া তাঁহার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। চোখের জলে বক্ষ ভাসাইয়া তিনি বলিলেন—"বাবা নিমাই, বিশ্বরূপ সন্ন্যাসী হইয়াছে, একমাত্র তুই-ই আমার নয়নের নিধি, বার্ধক্যের সম্বল। তুই-ও যদি সন্ন্যাসী হইয়া গৃহত্যাগ করিস্, তবে আমি কিরূপে জীবন ধারণ করিব? বধূ বিষ্ণুপ্রিয়াকেই বা আমি কি বলিয়া বুঝাইব, তাহার মুখের দিকে কিরূপে চাহিব?"

শ্রীগৌরাঙ্গ অনেক কষ্টে প্রবোধবাক্যে মাতাকে শান্ত করিলেন। কিন্তু মাতার মনের আশঙ্কা দূর হইল না।

যে দিন শ্রীগৌরাঙ্গ গৃহত্যাগ করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন, সেদিন শচীমাতা, বিষ্ণুপ্রিয়া, নবদ্বীপবাসী বন্ধু-বান্ধব কেহই সে সংকল্পের কথা জানিতেন না। কেবলমাত্র নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ, ব্রাহ্মানন্দ, চন্দ্রশেখর আচার্য প্রভৃতি কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধু তাহা শুনিয়াছিলেন। সমস্ত দিন নবদ্বীপের বন্ধুবান্ধব ও ভক্তদের সঙ্গে সংকীর্তনের আনন্দে কাটাইয়া, মধুর বচনে তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া সন্ধ্যাকালে শ্রীগৌরাঙ্গ স্বগৃহে ফিরিলেন। সেখানেও গদাধর, মুকুন্দ, হরিদাস প্রভৃতি ভক্তগণ তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। শচীমাতাকে ডাকিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন—"মা, আজ তুমি রন্ধন কর, আমরা সকলে একত্রে বসিয়া খাইব।" শচীমাতা এই কথা শুনিয়া হৃষ্টমনে রন্ধনশালায় গমন করিলেন এবং বধূ বিষ্ণুপ্রিয়াকে ডাকিয়া তাঁহার সহায়তায় রন্ধন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রন্ধন হইলে, ভক্তগণসহ বসিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ

গার্হস্থ্যাশ্রমের এই শেষ দিন পরম সন্তোষে ভোজন করিলেন। শচীমাতা দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া ভাবিলেন, তাঁহার স্বামিসেবা আজ সার্থক হইয়াছে।

রাত্রি দ্বিপ্রহর। বন্ধুবান্ধব সকলে চলিয়া গেল, শ্রীগৌরাঙ্গ শচীমাতার নিকট বিদায় লইয়া নিজ শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া স্বামীর জন্য সেখানে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহার রূপ যেন আজ শতগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে, লজ্জারক্ত গণ্ডস্থল ও নবকিশলয়তুল্য অধর যুগলের সুষমা যেন গাঢ়তর হইয়াছে। শান্ত প্রসন্ন হাস্যে তাঁহার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল। তাঁহার মনে হইল, বহু দিন পরে স্বামীকে আজ তিনি আপনার নিকটে পাইয়াছেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ বিষ্ণুপ্রিয়ার দিকে চাহিয়া সেই অপরূপ মাধুরী দেখিতে লাগিলেন, দেখিতে দেখিতে তাঁহার মনে হইল, এই সরলা বালিকা জানে না, তাহাকে চিরদিনের জন্য ত্যাগ করিয়া তিনি চলিয়া যাইবেন। নবীন কিশলয়ের উপর বজ্রাঘাত, সে কি নিদারুণ নিষ্ঠুরতা,—তবু জগতের মঙ্গলের জন্য, পাপীতাপীদের উদ্ধারের জন্য তাঁহাকে এই কঠোর কর্তব্য পালন করিতেই হইবে!

বিষ্ণুপ্রিয়ার দিকে প্রসন্ন নয়নে চাহিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন,—"তোমাকে বড়ই সুন্দর দেখাইতেছে—এস, তোমাকে আজ মনের মত করিয়া সাজাইয়া দিই। বিষ্ণুপ্রিয়া সলজ্জভাবে সম্মত হইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ বসিয়া বসিয়া নিজহস্তে নিপুণভাবে বিষ্ণুপ্রিয়াকে সাজাইলেন, নূতন ছন্দে কবরী বাঁধিয়া দিলেন। ললাটে গণ্ডে অলকা তিলকা কাটিলেন। মনোহর পুষ্পমাল্যে তাঁহাকে ভূষিত করিলেন। তারপর দর্পণসম্মুখে বসিয়া বলিলেন, দেখ কেমন হইয়াছে! বিষ্ণুপ্রিয়া দেখিলেন—সুন্দর—অতি সুন্দর—তিনি নিজের রূপে নিজেই মুগ্ধ হইলেন।

বিষ্ণুপ্রিয়া তখন প্রস্তাব করিলেন, তিনিও শ্রীগৌরাঙ্গকে নিজের মনের মত করিয়া সাজাইবেন। শ্রীগৌরাঙ্গ করুণভাবে হাসিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া মনের সাধ মিটাইয়া স্বামীকে অপরূপ বেশে সাজাইলেন। একে সেই ভুবনমোহন রূপ—প্রসাধনে সে রূপ আরও উজ্জ্বল হইল। বিষ্ণুপ্রিয়া প্রীতি-ভরে সে রূপ দুই চক্ষু দিয়া যেন পান করিতে লাগিলেন, মনে মনে গর্ব হইল, এই নবদ্বীপ নগরে এমন রূপ তো আর কাহারও নাই। তিনি সত্যই অসীম ভাগ্যবতী!

রাত্রি তৃতীয় প্রহর অতীত। বিষ্ণুপ্রিয়া অঘোরে ঘুমাইতেছেন। তাঁহার একখানি হাত শ্রীগৌরাঙ্গের বুকের উপরে সুকোমল লতার মত ন্যস্ত হইয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গ ধীরে ধীরে শয্যা হইতে উঠিয়া, অতি সন্তর্পণে বিষ্ণুপ্রিয়ার হাতখানি সরাইয়া রাখিলেন, একদৃষ্টে শেষবার সেই লাবণ্যময়ী প্রতিমার দিকে

চাহিয়া দেখিলেন এবং নিঃশব্দে দ্বার খুলিয়া বাহির হইলেন। আঙিনায় নামিয়া মাতার উদ্দেশে প্রণাম করিলেন। তারপর, দৃঢ়পদে চিরদিনের জন্য গৃহত্যাগ করিলেন। একদিন এমনই ভাবে রাজপুত্র শাক্যসিংহ জগতের দুঃখ নাশ করিবার জন্য গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন, জগতে যুগান্তর সৃষ্টি হইয়াছিল। আর এই শ্রীগৌরাঙ্গের গৃহত্যাগ, এও জগতে নবযুগ আনয়ন করিয়াছে।

রাত্রিশেষে দুঃস্বপ্ন দেখিয়া শচীমাতা সহসা জাগিয়া উঠিলেন, তাঁহার মনে অমঙ্গলের আশঙ্কা হইল। তিনি বাহির হইয়া বিষ্ণুপ্রিয়ার গৃহের নিকটে গিয়া ডাকিতে লাগিলেন, "বিষ্ণুপ্রিয়া ওঠ, ওঠ, আমার নিমাই আছে কিনা বল!" বিষ্ণুপ্রিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলেন, দেখিলেন, শয্যা শূন্য, স্বামী নাই! শাশুড়ী ও বধূ দুই জনেরই মাথায় যেন বজ্র পড়িল, বুঝিলেন—নিমাই চির-দিনের জন্য গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। দুইজনে শিরে করাঘাত করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে রাজপথে আসিয়া দাঁড়াইলেন। শচীমাতা উচ্চৈঃস্বরে 'নিমাই নিমাই' বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন, কিন্তু প্রতিধ্বনি ব্যতীত আর কেহ তাঁহার ডাকে সাড়া দিল না।

"ডাকে শচীমাতা নিমাই নিমাই।
প্রতিধ্বনি বলে নাই—নাই—নাই!"

ক্রমে প্রতিবাসিগণ একে একে আসিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গ গৃহত্যাগ করিয়াছেন এই কথা নগরময় প্রচারিত হইল—নবদ্বীপের সমস্ত লোক যেন শ্রীগৌরাঙ্গের গৃহদ্বারে ভাঙিয়া পড়িল। সকলেই হায় হায় করিতে লাগিল, নারীরা নয়নে বসন দিয়া অশ্রুমার্জনা করিতে লাগিলেন! আহা, এমন সোনার চাঁদ ছেলে—শচীমাতা তাহার অভাবে প্রাণধারণ করিবেন কিরূপে? এমন দেবতুল্য স্বামী—তরুণী বধূ বিষ্ণুপ্রিয়া বুকে পাষাণ বাঁধিয়া বাঁচিয়া থাকিবে কি করিয়া?

প্রতিবাসী, আত্মীয় বন্ধুবান্ধব, সকলে মিলিয়া শাশুড়ী বধূকে নানা রূপে প্রবোধ দিয়া শান্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এদিকে শ্রীগৌরাঙ্গ রাত্রিশেষে স্বল্পান্ধকারে বায়ুবেগে কাটোয়ার অভিমুখে ছুটিয়াছেন। সঙ্গে নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ, চন্দ্রশেখর ও ব্রহ্মানন্দ। কিন্তু তাঁহারা তাঁহাকে ধরিতে পারিতেছেন না, পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছেন। বেলা প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ প্রভৃতি সহ গঙ্গাপার হইয়া কাটোয়াতে কেশব ভারতীর আশ্রমে আসিয়া পৌঁছিলেন। কেশব ভারতী তাঁহাকে দেখিয়া পরম সমাদরে সম্বর্ধনা করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—"আমি আসিয়াছি, আপনিই আমার গুরু, আমাকে সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষা দিন।" কেশব ভারতী এই প্রার্থনা শুনিয়া কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, তারপরে বলিলেন—"বেশ, তাহাই দিব—তোমার মত শিষ্য বহু জন্মেও লাভ করা যায় না।"

পরদিন প্রভাতে রাষ্ট্র হইল নদীয়ার নিমাই পণ্ডিত সন্ন্যাসগ্রহণ করিবেন। চারিদিকে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। কাতারে কাতারে নরনারী কেশব ভারতীর আশ্রমের নিকটে আসিতে লাগিল। গঙ্গাতীর লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। সকলেই বলিতে লাগিল, আহা, এই তরুণ যুবক এ বয়সে কেন সন্ন্যাস লইবে? নারীরা অশ্রুধারায় বক্ষ ভাসাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—হায়, ইহার হত-ভাগিনী মার আজ কি কুক্ষণে নিশি প্রভাত হইয়াছিল! এমন ছেলেকে বিসর্জন দিয়া কোন্ সুখে সে বাঁচিয়া থাকিবে? কেশব ভারতী অতি নিষ্ঠুর—নহিলে ইহাকে সন্ন্যাসী করিতে সম্মত হইবে কেন?

ক্রমে মস্তকমুণ্ডনের সময় আসিল, নাপিত ক্ষুর লইয়া বসিল, কিন্তু তাহার হাত কাঁপিতে লাগিল, অশ্রুজলে চোখ ঝাপসা হইয়া আসিল, সে ভ্রমরকৃষ্ণ চাঁচর কেশে বেচারা ক্ষুর লাগাইবে কি করিয়া? অবশেষে তাহাকে সেই নিষ্ঠুর কর্তব্য সম্পন্ন করিতেই হইল। সে দৃশ্য দেখিয়া আবালবৃদ্ধবনিতা কেহই অশ্রুসংবরণ করিতে পারিল না।

অপরাহ্ণে কেশব ভারতী শ্রীগৌরাঙ্গকে সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষা দিলেন। চারিদিকে লোকে ঘন ঘন হরিধ্বনি করিতে লাগিল। কেশব ভারতী নবদীক্ষিত সন্ন্যাসীর নাম রাখিলেন—'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'। সন্ন্যাস লইয়া সে রাত্রি শ্রীগৌরাঙ্গ কাটোয়ায় কেশব ভারতীর আশ্রমেই থাকিলেন। পরদিন নিত্যানন্দ প্রমুখ ভক্তগণ তাঁহাকে শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্যের গৃহে লইয়া আসিলেন। অদ্বৈতাচার্য সন্ন্যাসী শ্রীগৌরাঙ্গকে মহাসমাদরে নিজগৃহে অভ্যর্থনা করিলেন। নবদ্বীপে এই সংবাদ প্রেরিত হইল। শচীমাতা এবং অন্যান্য বন্ধুবান্ধব ও ভক্তবৃন্দ শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্যের গৃহে আসিয়া মিলিত হইলেন। কেবল বিষ্ণুপ্রিয়া আসিলেন না।

শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহাদের সকলকে বুঝাইয়া বলিলেন, তিনি সন্ন্যাস লইয়াছেন, অতএব নবদ্বীপে আর ফিরিয়া যাইবেন না, সকলে তাঁহাকে যেন হাসিমুখে বিদায় দেন। বন্ধুবান্ধব ও ভক্তগণ এই প্রস্তাব শুনিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ আশঙ্কা করিয়াছিলেন, শচীমাতা কিছুতেই এই প্রস্তাবে সম্মত হইবেন না, তাঁহাকে প্রসন্নমনে বিদায় দিতে পারিবেন না। কিন্তু তিনি তো সাধারণ নারী নহেন, শ্রীগৌরাঙ্গের জননী,—যাহাতে পুত্রের ধর্মলোপ হয়, সন্ন্যাসব্রত ভঙ্গ হয়, এমন অনুরোধ তিনি কখনই করিতে পারেন না। শ্রীগৌরাঙ্গ কহিলেন—মা, তুমি যদি বল, আমি নবদ্বীপেই ফিরিয়া যাই, এই দেহ ও প্রাণ তোমার, তুমি যে আজ্ঞা করিবে, তাহাই আমি পালন করিব।

শচীমাতা বুকে পাষাণ বাঁধিয়া ধীর শান্তস্বরে বলিলেন, না বাবা, তুমি যখন সন্ন্যাস লইয়াছ, তখন মা হইয়া তোমার ধর্মে আমি কিছুতেই বাধা দিতে পারিব না, তাহাতে আমার বুক ফাটিয়া যায়, যাক!

শ্রীগৌরাঙ্গ মাতার কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। বলিলেন,—তোমার আজ্ঞাই শিরোধার্য। আমি নীলাচল তীর্থে গিয়া থাকিব। বঙ্গদেশ হইতে নীলাচল বেশী দূর নহে, সর্বদা লোক যাতায়াত করিতেছে, অতএব আমার সংবাদ তোমরা সর্বদা পাইবে। যখনই তুমি আমাকে স্মরণ করিবে, আমি তোমার নিকটে ফিরিয়া আসিব।

শচীমাতা কাঁদিতে কাঁদিতে এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

কয়েকদিন অদ্বৈতাচার্যের গৃহে থাকিয়া অবশেষে শ্রীগৌরাঙ্গ নীলাচল যাত্রার আয়োজন করিলেন। একে একে নবদ্বীপের বন্ধুবান্ধবগণকে বিদায় দিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া শান্তিপুরে আসেন নাই, কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ সেই প্রেমময়ী সাধ্বী পত্নীর কথা একমুহূর্তও ভুলেন নাই। তিনি একজন অন্তরঙ্গ ভক্তের হাতে নিজের একজোড়া খড়ম স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ বিষ্ণুপ্রিয়ার নিকট পাঠাইয়া দিলেন এবং বলিয়া দিলেন,—বিষ্ণুপ্রিয়াকে কহিও, আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিলাম, কিন্তু গৃহে সেই আমার প্রতিনিধি রহিল। আমার দুঃখিনী জননীকে সে যেন কায়মনোবাক্যে সেবা করে এবং পুত্রবিরহে সান্ত্বনা দেয়। তাহার উপরে সমস্ত ভার দিয়াই আমি নিশ্চিন্ত মনে গৃহত্যাগ করিয়া নীলাচলে চলিলাম। বিষ্ণুপ্রিয়া স্বামীর সেই শেষ আজ্ঞা ও শেষ উপহার সাদরে মাথায় তুলিয়া লইলেন। এই আজ্ঞাপালনই ছিল তাঁহার জীবনের একমাত্র ধর্ম। স্বামীর প্রদত্ত স্মৃতিচিহ্নকেই দেবতার আসনে বসাইয়া তিনি চিরজীবন পূজা করিয়াছিলেন।

বৈষ্ণব গ্রন্থকারগণ বিষ্ণুপ্রিয়ার কথা খুব বেশী লিখেন নাই। কিন্তু এই মহীয়সী দেবীর কথা যখন আমরা চিন্তা করি, তখন শ্রদ্ধায় সম্ভ্রমে ভক্তিতে আমাদের মস্তক নত হইয়া পড়ে। বুদ্ধদেবের সহধর্মিণী গোপা মানবহৃদয়ে যে আসন লাভ করিয়াছেন, শ্রীগৌরাঙ্গের সহধর্মিণী বিষ্ণুপ্রিয়াও সেই আসনেরই অধিকারিণী। তাঁহার পুণ্যকাহিনী স্মরণ করিয়া আজ আমরা ধন্য হই।

১০

নীলাচলের পথে

মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তখন তাঁহার বয়স মাত্র ২৪ বৎসর। ২০ বৎসর বয়সে তাঁহার জীবনে মহাপরিবর্তনের সূচনা হয় এবং তিনি নবদ্বীপে ভক্তিধর্ম প্রচার আরম্ভ করেন। আর এই চারি বৎসরেই তাঁহার অপূর্ব ভগবৎপ্রেম ও অসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রভাব বাঙ্গালা দেশে বিস্তৃত হইয়া পড়ে।

শ্রীগৌরাঙ্গ তো সংকল্প করিলেন যে, তিনি নবদ্বীপ ছাড়িয়া নীলাচলে গমন করিবেন। কিন্তু তাঁহার যাওয়া বড় সহজ হইল না। শচীমাতা, ভক্তবৃন্দ, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন তো আছেনই,—ইহা ছাড়া হাজার হাজার লোক আসিয়া শান্তিপুরে অদ্বৈতগৃহে সমবেত হইতে লাগিল। এই তরুণ বয়সে শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস লইয়া দেশত্যাগ করিবেন, এ তাহাদের প্রাণে সহ্য হইবে না, তাহারা কিছুতেই তাঁহাকে নীলাচলে যাইতে দিবে না। সন্ন্যাসী হইয়াছেন বলিয়াই যে দেশ ছাড়িয়া যাইতে হইবে, কোন্ শাস্ত্রে এরূপ লেখা আছে? শ্রীগৌরাঙ্গ নবদ্বীপে না যান, শান্তিপুরে থাকিয়াই হরিনাম প্রচার করুন, তাহারা দুই নয়ন ভরিয়া তাঁহাকে দেখিবে। শ্রীগৌরাঙ্গ নানারূপে লোকদিগকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহাদের চিত্ত প্রবোধ মানে কই?

অদ্বৈতাচার্য ও তাঁহার গৃহিণী সীতাঠাকুরাণী শ্রীগৌরাঙ্গকে পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন। শ্রীগৌরাঙ্গ দেশ ছাড়িয়া নীলাচলে গমন করিবেন, এই কথা শুনিয়া তাঁহাদের চোখে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। মহাপ্রভু আচার্যকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন,—আচার্য, আপনি তো সবই বুঝেন, আপনি আমার শিক্ষাদাতা গুরু। আপনি যদি অধীর হন, তবে আমার সন্ন্যাসধর্ম পালনে বিঘ্ন ঘটিবে। আচার্য অতিকষ্টে আত্মসম্বরণ করিলেন। কিন্তু আচার্যগৃহিণীকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা মহাপ্রভু খুঁজিয়া পাইলেন না।

আচার্য ও আচার্যগৃহিণী সেদিন পরমযত্নে অতিথি সৎকারের আয়োজন করিলেন। সমস্ত দিন ধরিয়া সীতাঠাকুরাণী স্বহস্তে বিবিধ ব্যঞ্জন রন্ধন করিলেন। তারপর নিজে বসিয়া মাতার ন্যায় পরম স্নেহে শ্রীগৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দকে খাওয়াইলেন। ভোজনের আয়োজন কেমন হইয়াছিল, পাঠকদের কৌতূহল তৃপ্তির জন্য তাহার কিছু পরিচয় দিলাম।

মধ্যে পীত ঘৃতসিক্ত শাল্যন্ন-স্তূপ।
চারিদিকে ব্যঞ্জন ডোঙ্গা আর মুদ্গসূপ॥

বাস্তুক শাকপাক বিবিধ প্রকার।
পটোল কুষ্মাণ্ডবড়ী, মানকচু আর॥
রাইমরীচ সুক্তা দিয়া সব ফলমূলে।
অমৃত নিন্দক পঞ্চবিধ তিক্ত ঝালে॥
কোমল নিম্বপত্র সহ ভাজা বার্তাকী।
পটোল ফুলবড়ী ভাজা কুষ্মাণ্ড মানচাকী॥
নারিকেল-শস্য ছানা শর্করা মধুর।
মোচাঘণ্ট দুগ্ধ কুষ্মাণ্ড সকল প্রচুর॥
মধুরাম্ল বড়াম্লাদি অম্ল পাঁচ ছয়।
সকল ব্যঞ্জন কৈল লোকে যত হয়॥
মুদ্গবড়া মাষবড়া কলাবড়া মিষ্ট।
ক্ষীর পুলী নারিকেল যত পিঠা ইষ্ট॥

* * *

সঘৃত পায়স নব মৃৎকুণ্ডিকা ভরি।
তিন পাত্রে ঘনাবর্ত দুগ্ধ দিলা ধরি॥
দুগ্ধ চিড়া কলা আর দুগ্ধলকলকি।
যতেক করিল তাহা কহিতে না শকি॥
দুই পাশে ধরিল সব মৃৎকুণ্ডিকা ভরি।
চাঁপাকলা দধি সন্দেশ কহিতে না পারি॥
অন্নব্যঞ্জন উপরে দিল তুলসী মঞ্জরী।
তিন জল পাত্রে সুবাসিত জল ভরি॥

—(চৈতন্যচরিতামৃত)

সমবেত বন্ধুবান্ধব ও ভক্তগণও পরিতোষ সহকারে ভোজন করিলেন। তারপর সকলে মিলিয়া কীর্তনানন্দে গভীর রাত্রি পর্যন্ত কাটাইলেন।

প্রভাতে উঠিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ নীলাচলের পথে বিদায় লইলেন। শচীমাতার চরণ বন্দনা করিয়া আচার্যের গৃহ হইতে তিনি বাহির হইলেন। সমস্ত লোক সঙ্গে সঙ্গে চলিল। শ্রীগৌরাঙ্গ তাহাদিগকে অনেক বুঝাইয়া প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। একে একে সকলে বিদায় লইল, কেবল হরিদাস ও অদ্বৈতাচার্য সঙ্গ ছাড়িতে চাহিলেন না। হরিদাস কাঁদিয়া বলিলেন—প্রভু, তুমি নীলাচলে চলিলে, আমার কি গতি হইবে? আমি পতিত পাপী, আমার তো জগন্নাথক্ষেত্রে যাইবার অধিকার নাই, এদিকে তোমাকে না দেখিয়াই বা কিরূপে প্রাণ ধারণ করিব? প্রভু কহিলেন,—তোমার দৈন্য দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। তুমি

কিছুদিন ধৈর্য ধারণ করিয়া থাক, আমি তোমাকে নীলাচলে লইয়া যাইব, তোমার কথা জগন্নাথের চরণে নিবেদন করিব। আচার্যকেও তিনি নানা কথা বলিয়া প্রবোধ দিলেন। আচার্য ও হরিদাস অগত্যা দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে গৃহে ফিরিয়া চলিলেন।

মহাপ্রভুর সঙ্গে রহিলেন কেবল নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ, গোবিন্দ, জগদানন্দ এবং ব্রহ্মানন্দ এই ছয়জন।* ইঁহারা নীলাচল পর্যন্ত মহাপ্রভুর সঙ্গে যাইবেন। মহাপ্রভু ও তাঁহার সঙ্গীরা গঙ্গার কূলে কূলে হাঁটিয়া চলিলেন। এইরূপে চলিতে চলিতে তাঁহারা ছত্রভোগ গ্রাম পর্যন্ত আসিলেন। বর্তমানে ডায়মণ্ডহারবারের অন্তর্গত মথুরাপুর থানার মধ্যে খাড়ীগ্রাম যেখানে, ছত্রভোগ সেই স্থানে ছিল। এখন গঙ্গা সেস্থান হইতে সরিয়া গিয়াছে, কিন্তু পূর্বে এইখানেই গঙ্গা শতমুখী হইয়া প্রবাহিত হইত এবং এইখানে গঙ্গাপার হইয়াই নীলাচলের পথে যাইতে হইত। সেকালে গঙ্গার ওপারেই ছিল উড়িষ্যা-রাজ্যের সীমানা। দুই রাজ্যের সীমান্ত বলিয়া ছত্রভোগ ও তাহার নিকটবর্তী গ্রাম সমূহে প্রায়ই যুদ্ধবিগ্রহ লাগিয়া থাকিত। লোকের ধনপ্রাণও নিরাপদ ছিল না, জলদস্যু ও স্থলদস্যুর দল সর্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইত এবং সুযোগ পাইলেই লোকের ধনপ্রাণ হরণ করিত।

মহাপ্রভু ছত্রভোগে গঙ্গার শতমুখী ধারা দেখিয়া ভগবৎপ্রেমে বিভোর হইয়া কীর্তন ও নৃত্য করিতেছেন, এমন সময় ছত্রভোগ অঞ্চলের অধিকারী (ভূস্বামী) রামচন্দ্র খাঁ দোলায় চড়িয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গকে দেখিয়া তাঁহার মনে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের উদয় হইল। তিনি মহাপ্রভুকে ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন। মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি কে? রামচন্দ্র খাঁর অনুচরেরা পরিচয় দিলেন—ইনিই এই অঞ্চলের অধিকারী। মহাপ্রভু কহিলেন—তোমার সঙ্গে পরিচয় হইয়া ভালই হইল, তুমি নদী পার করিয়া আমার নীলাচল যাত্রার ব্যবস্থা করিয়া দাও।

রামচন্দ্র খাঁ বিনীতভাবে কহিলেন, প্রভুর যে আজ্ঞা তাহাই করিব, কিন্তু—

> সবে প্রভু হইয়াছে বিষম সময়।
> সেদেশে এদেশে কেহ পথ নাহি বয়॥
> রাজারা ত্রিশূল পুঁতিয়াছে স্থানে স্থানে।
> পথিক পাইলে জান্ত বলি লয় প্রাণে॥
> কোন দিগ দিয়া বা পাঠাঙ লুকাইয়া।
> তাহাতে ডরাঙ প্রভু শুন মন দিয়া॥

---

* চৈতন্য-ভাগবতে এই ছয়জনের নাম আছে। কিন্তু চৈতন্যচরিতামৃতে আছে,—নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, দামোদর পণ্ডিত ও মুকুন্দ এই চারিজন মহাপ্রভুর সঙ্গে নীলাচলে গিয়াছিলেন।

মুঞি সে রক্ষক এথা সব মোর ভার।
নাগালি পাইলে আগে সংশয় আমার॥
তথাপিও যেতে কেন প্রভু মোর নয়।
যে তোমার আজ্ঞা তাহা করিব নিশ্চয়॥
তাতে প্রাণধন কেনে আমার না যায়।
রাত্রে আজি তোমা পাঠাইব সর্বথায়॥

এই বলিয়া রামচন্দ্র খাঁ মহাপ্রভুকে সঙ্গীগণ সহ সেই রাত্রি তাঁহার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিলেন। মহাপ্রভু তাঁহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন।

রাত্রি তৃতীয় প্রহরে রামচন্দ্র খাঁ আসিয়া সংবাদ দিলেন—নৌকা প্রস্তুত। মহাপ্রভু ও তাঁহার সঙ্গীরা নৌকায় গিয়া উঠিলেন। মাঝিরা নীরবে নৌকা ছাড়িয়া দিল। কিন্তু মাঝিরা নীরবে গোপনে গঙ্গা পার হইতে চাহিলে হয় কি? নৌকার মধ্যে মুকুন্দ কীর্তন আরম্ভ করিলেন এবং মহাপ্রভু প্রেমভরে নৃত্য করিতে লাগিলেন। মাঝিরা ব্যাপার দেখিয়া ভয় পাইয়া গেল, মিনতি করিয়া কহিল—

আপনি নাবিক বলে হইল সংশয়।
বুঝিলাম আজি আর প্রাণ নাহি রয়॥
কূলেতে উঠিলে বাঘে লইয়া পলায়।
জলেতে পড়িলে কুম্ভীরেতে খায়॥
নিরন্তর এ পানিতে ডাকাইত ফিরে।
পাইলেই ধনপ্রাণ দুই নাশ করে॥
এতেকে যাবৎ উড়িয়ার দেশ পাই।
তাবৎ নীরব হও সকল গোঁসাই॥

মাঝিদের মিনতি শুনিয়া মহাপ্রভু ও তাঁহার সঙ্গীরা কীর্তন ক্ষান্ত রাখিলেন।

এইরূপে গঙ্গা পার হইয়া তাঁহারা অপর তীরে প্রয়াগঘাটে আসিয়া পোঁছিলেন। এইখানেই ওড্রদেশ বা উড়িষ্যাদেশের আরম্ভ। মহাপ্রভু সঙ্গীদের সহ নীলাচলের পথে চলিতে লাগিলেন। পথে প্রায়ই তাঁহারা কীর্তনে মগ্ন থাকিতেন, রাত্রে কখন বৃক্ষতলে, কখন বা কোন গ্রামে গৃহস্থের বাড়ীতে অবস্থান করিতেন। এইরূপে কিছুদিন পরে তাঁহারা সুবর্ণরেখা নদী পার হইলেন এবং বালেশ্বরের মধ্যে আসিয়া পোঁছিলেন। বালেশ্বরের রেমুণা গ্রামে গোপীনাথের মন্দির সুপ্রসিদ্ধ। মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভৃতি সহ ক্রমে এই গোপীনাথের মন্দিরে আসিলেন এবং রাত্রিকালে তথায় বিশ্রাম গ্রহণ করিলেন।

রেমুণার গোপীনাথ বিগ্রহ "ক্ষীরচোরা গোপীনাথ" নামে খ্যাত। ঠাকুরের নাম 'ক্ষীরচোরা' হইল কেন, তৎসম্বন্ধে চমৎকার কাহিনী প্রচলিত আছে।

নিত্যানন্দ প্রমুখ ভক্তগণের প্রশ্নের উত্তরে স্বয়ং মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ সেই কাহিনী কীর্তন করিয়াছেন। এই কাহিনীতে শ্রীগৌরাঙ্গের গুরুর গুরু মাধবেন্দ্র পুরীর অপূর্ব প্রেম ও ভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

মাধবেন্দ্র পুরী সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী ছিলেন। তিনি ভগবানের নাম করিয়া নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন, এক স্থানে বেশী দিন থাকিতেন না। একবার তিনি ভ্রমণ করিতে করিতে বৃন্দাবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বৃন্দাবনে গিরি গোবর্ধন প্রভৃতি প্রদক্ষিণ করিয়া সন্ধ্যাকালে গোবিন্দকুণ্ডের ধারে এক বৃক্ষতলে বসিয়া তিনি ভগবানের নাম জপ করিতে লাগিলেন। সমস্ত দিন কিছুই আহার হয় নাই, কেননা তিনি কখনও ভিক্ষা মাগিয়া খাইতেন না, স্বেচ্ছায় যে যাহা দিত, তাহাই আহার করিতেন। পুরী বৃক্ষতলে বসিয়া আছেন, এমন সময় এক গোপবালক এক ভাঁড় দুধ লইয়া আসিয়া তাঁহাকে দিল। কহিল,—তুমি সারাদিন উপবাস করিয়া আছ, কাহারো কাছে তো মাগিয়া খাইবে না, তাই তোমার জন্য এই দুধ আনিয়াছি। পুরী বিস্মিত-চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন,—আমি যে উপবাসী আছি, তাহা তুমি কিরূপে জানিলে, কেই বা তোমাকে দুধ আনিতে কহিল? বালক হাসিয়া বলিল,—আমি গোপ, বাড়ী এই গ্রামে, আমার গ্রামে কেহ উপবাসী থাকে না, যাহারা মাগিয়া খায় না, তাহাদিগকে আমি আহার যোগাইয়া থাকি। গোপবালক চলিয়া গেলে পুরী দুগ্ধপান করিয়া ভাণ্ড ধুইয়া সযত্নে রাখিয়া দিলেন এবং সেই বৃক্ষতলেই শয়ন করিলেন। গভীর রাত্রিতে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন—সেই গোপবালক আসিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া এক কুঞ্জে লইয়া গেল এবং কহিল,—দেখ, আমি গোপাল, যবনভয়ে লোকে গোবর্ধন পর্বতের উপর হইতে নামাইয়া আনিয়া এই কুঞ্জে লুকাইয়া রাখিয়াছে। এইখানে আমি শীত বৃষ্টিতে বড় কষ্ট পাইতেছি। তুমি পর্বতের উপরে এক মন্দির নির্মাণ করিয়া সেখানে আমাকে স্থাপন কর এবং আমার সেবা কর। তোমার সেবা পাইতে আমার বড় সাধ। মাধবেন্দ্রপুরী জাগিয়া উঠিয়া স্বপ্নবৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই তাঁহাকে এই আদেশ দিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণকে যে তিনি গোপবালক বেশে দেখিয়াও চিনিতে পারেন নাই, এজন্য তাঁহার মনে গভীর বেদনা হইল। তারপর পুরী গ্রামের লোকজনদের ডাকিয়া সব কথা বলিলেন এবং তাহাদের সাহায্যে গোপালকে কুঞ্জমধ্য হইতে লইয়া পর্বতের উপরে স্থাপন করিলেন। তিনি নিজেই সেবা পূজা করিতে লাগিলেন। গোপালের আবির্ভাব হইয়াছে শুনিয়া চারিদিক হইতে প্রত্যহ দলে দলে লোক আসিতে লাগিল, মন্দিরে নিত্য উৎসব চলিতে লাগিল। এইরূপে কয়েক মাস অতি-বাহিত হইলে গোপাল পুরীকে স্বপ্নে কহিলেন,—গ্রীষ্মে আমার বড় কষ্ট হয়। তুমি যদি নীলাচল হইতে মলয়জ চন্দন আনিয়া আমার অঙ্গে লেপন কর, তবে

আমার শান্তি হয়। পুরী গোপালের এই স্বপ্নাদেশ পাইয়া তৎক্ষণাৎ নীলাচল যাত্রা করিলেন।

পদব্রজে ভ্রমণ করিতে করিতে কিছুকাল পরে তিনি রেমুণায় গোপীনাথের মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং রাত্রে সেইখানেই বিশ্রাম গ্রহণ করিলেন। গোপীনাথের সেবাপূজাদি কি ভাবে সম্পন্ন হয়, মন্দিরের পূজারী তাঁহাকে সবিস্তারে তাহা কহিল। গোপীনাথের ক্ষীরভোগ বিখ্যাত। পুরী পূজারীর মুখে তাহা শুনিয়া মনে মনে ভাবিলেন, যদি সেই ক্ষীরভোগ একটু পাইতাম, আস্বাদ করিয়া দেখিতাম। কিন্তু তিনি বিরক্ত সন্ন্যাসী, কাহারও কাছে মাগিয়া খান না, সর্বপ্রকার বাসনাও ত্যাগ করিয়াছেন,—সুতরাং এই কথা মনে হওয়াতে তাঁহার বিষম লজ্জা হইল। তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া ভগবানের নাম করিতে করিতে মন্দিরপ্রান্তে শয়ন করিলেন।

এদিকে স্বয়ং গোপীনাথ রাত্রে পূজারীকে স্বপ্নে দেখা দিয়া কহিলেন, পূজারী উঠ, দ্বার খোল, সন্ন্যাসী মাধবেন্দ্র পুরী আজ এই মন্দিরে অতিথি, আমি তাঁহার জন্য এক পাত্র ক্ষীর বস্ত্রাঞ্চলে লুকাইয়া রাখিয়াছি। তুমি তাহা লইয়া গিয়া মাধবেন্দ্র পুরীকে এখনি দাও। পূজারী ধড়মড় করিয়া জাগিয়া উঠিল এবং মন্দিরের দ্বার খুলিয়া দেখিল, সত্যই গোপীনাথের বস্ত্রাঞ্চলে এক পাত্র ক্ষীর রহিয়াছে। পূজারী ভক্তিভরে সেই ক্ষীর পাত্র লইয়া মাধবেন্দ্র পুরীকে দিলেন এবং কহিলেন, পুরী, তোমার মত ভাগ্যবান্ জগতে নাই, স্বয়ং গোপীনাথ তোমার জন্য ক্ষীর চুরি করিয়াছেন।

মাধবেন্দ্র পুরী এই কথা শুনিয়া প্রেমে বিভোর হইলেন এবং প্রসাদী ক্ষীর ভক্ষণ করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

পরদিন গোপীনাথের এই ক্ষীর চুরির কাহিনী চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল এবং সেই হইতে ঠাকুর 'ক্ষীরচোরা গোপীনাথ' নামে প্রসিদ্ধ হইলেন।

মাধবেন্দ্র পুরী রেমুণা হইতে চন্দন আনিবার জন্য নীলাচলে গেলেন। তিনি লোকের ভীড়ের ভয়ে গোপনেই গিয়াছিলেন। কিন্তু যাইয়া দেখেন অদ্ভুত ব্যাপার, তাঁহার আসিবার পূর্বেই সংবাদ প্রচারিত হইয়া গিয়াছে এবং সহস্র সহস্র লোক তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়াছে। যাহা হউক, কয়েকমাস নীলাচলে থাকিয়া তিনি চন্দন সংগ্রহ করিয়া বৃন্দাবন ফিরিবার পথে পুনরায় রেমুণায় আসিলেন। এইখানে তাঁহার উপর ঠাকুরের আদেশ হইল যে, তাঁহাকে চন্দন লইয়া বৃন্দাবন পর্যন্ত যাইতে হইবে না, রেমুণায় গোপীনাথের দেহে চন্দন লেপন করিলেই বৃন্দাবনের গোপালজীর সেবা করা হইবে। মাধবেন্দ্র পুরী তাহাই করিলেন।

মাধবেন্দ্র পুরীর ভগবৎপ্রেম অদ্ভুত, অতুলনীয়। মেঘদর্শন করিয়া তাঁহার মনে কৃষ্ণস্মৃতি হইত, ময়ূরের নৃত্য দেখিয়া কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হইয়া তিনি

আনন্দে নৃত্য করিতেন। তাঁহার সেই অসীম প্রেম শিষ্য ঈশ্বরপুরী ও তৎ-শিষ্য শ্রীগৌরাঙ্গের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়াছিল। সুতরাং বলিতে গেলে, এ যুগে, প্রেমধর্মের বীজ মাধবেন্দ্র পুরীই বপন করেন।

রেমুণাতে বিশ্রাম করিয়া মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ সদলবলে পুনরায় নীলাচল অভিমুখে চলিতে লাগিলেন। পথে যাজপুর, কটক, সাক্ষীগোপাল, ভুবনেশ্বর প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া কতদিন পরে তিনি পুরীর নিকট আঠার নালা গ্রামে আসিয়া পৌঁছিলেন।

ইতঃপূর্বেই নিত্যানন্দ প্রভু পথে একটি কাণ্ড করিয়া বসিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের দণ্ড (লাঠি) কিছুক্ষণের জন্য নিত্যানন্দের নিকট রাখিতে দেওয়া হইয়াছিল। তিনি সেই অবসরে দণ্ডখানি তিন টুকরা করিয়া ভাঙিয়া ফেলিলেন। পূর্বে বলিয়াছি, বালযোগী নিত্যানন্দ সময় সময় সরল বালকের ন্যায়ই আচরণ করিতেন। এই দণ্ড ভাঙিবার ব্যাপারও বোধ হয় সেই রকম, খেলাচ্ছলেই তিনি এই কার্য করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ আঠার নালায় আসিয়া দণ্ড চাহিলে, নিত্যানন্দ হাসিয়া বলিলেন,—দণ্ড নাই, আমি ভাঙিয়া ফেলিয়াছি। মহাপ্রভু এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া কহিলেন—আমি সন্ন্যাসী, আমার সন্ন্যাসের ভক্তিদণ্ড ভাঙিয়া তোমরা আমার ঘোর অনিষ্ট করিয়াছ। অতএব তোমাদের সঙ্গে আমি জগন্নাথক্ষেত্রে প্রবেশ করিব না। হয় তোমরা আগে যাও, অথবা আমি একাকী আগে যাই।

মহাপ্রভুর রাগ দেখিয়া নিত্যানন্দ অপ্রতিভ হইলেন। মুকুন্দ মহাপ্রভুকে শান্ত করিবার জন্য কহিলেন—সেই ভাল, তোমার যে ইচ্ছা তাই কর। তুমিই একাকী আগে জগন্নাথ দর্শনে যাও, আমরা পশ্চাতে যাইব!

মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ "তাহাই হোক" বলিয়া সঙ্গীদের পশ্চাতে ফেলিয়া একাকী জগন্নাথক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। মহাপ্রভুর একাকী জগন্নাথক্ষেত্রে প্রবেশ দৈবঘটনা বলিলেও বলা যায়, কেননা ইহার ফলে যে অপূর্ব ব্যাপার ঘটিয়াছিল, নিত্যানন্দ প্রমুখ ভক্তগণ সঙ্গে থাকিলে, তাহা সম্ভবপর হইত না। এইরূপে দুই একটি সামান্য ব্যাপার হইতেই যে যুগান্তকারী ঘটনার সৃষ্টি হইয়াছে, ইতিহাসে তাহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

১১

বাসুদেব সার্বভৌমের সঙ্গে মিলন

মহাপ্রভু জগন্নাথ দর্শন করিতে মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার তখন প্রেমে বিভোর তন্ময় ভাব, শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিয়া সেই ভাব আরও বৃদ্ধি পাইল, বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া তিনি দর্শন করিতে লাগিলেন। চারিদিকে শত শত লোক দর্শন করিতেছে, মহাপ্রভুর সে দিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র নাই। তিনি কেবল দুই নয়ন দিয়া জগন্নাথের মূর্তি যেন পান করিতেছেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার চিত্ত সংক্ষুব্ধ মহাসমুদ্রের ন্যায় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, তিনি স্থান কালের জ্ঞান ভুলিয়া গেলেন, তাঁহার ইচ্ছা হইল, জগন্নাথকে আলিঙ্গন করিয়া মনের সকল আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত করিবেন। এই ভাবিয়া মহাপ্রভু দুই হাত বাড়াইয়া জগন্নাথের দিকে ধাবিত হইলেন। কিন্তু বেশী দূর যাইতে পরিলেন না, প্রেমের আবেগে অচেতন হইয়া মন্দিরতলে পড়িয়া গেলেন। মন্দিরের 'পড়িছা' বা বেত্রধারী সেবকেরা একজন সন্ন্যাসীর এই বিসদৃশ কাণ্ড দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইল। সকল লোকে 'হাঁ হাঁ' করিয়া উঠিল। এই সময়ে একজন সম্ভ্রান্ত প্রবীণ ব্রাহ্মণও মন্দিরে দাঁড়াইয়া জগন্নাথ দর্শন করিতেছিলেন। তিনি ব্যাপার দেখিয়া আস্তেব্যস্তে নিকটে আসিয়া সন্ন্যাসীকে মারিতে 'পড়িছা'কে নিষেধ করিলেন। 'পড়িছা' প্রবীণ ব্রাহ্মণকে বিলক্ষণ চিনিত; সুতরাং সে তাঁহার আজ্ঞা পালন করিয়া সন্ন্যাসীকে ছাড়িয়া নতশিরে চলিয়া গেল। এই প্রবীণ ব্রাহ্মণ যে সে লোক নহেন, জগৎ-বিখ্যাত পণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌম—যিনি মিথিলা হইতে সমগ্র ন্যায়শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করিয়া আসিয়াছিলেন। সার্বভৌম তৎকালে পুরীর রাজা প্রতাপরুদ্রের গুরু ও প্রধান সভাপণ্ডিত। উড়িষ্যায় তাঁহার প্রভাব প্রতিপত্তি অসীম, শেষ জীবনে রাজা প্রতাপরুদ্রের বিশেষ অনুরোধে তিনি নবদ্বীপ হইতে নীলাচলে আসিয়া বাস করিতেছিলেন।

সার্বভৌম মহাপ্রভুর সংজ্ঞাহীন ভূলুণ্ঠিত দেহের নিকট হইতে লোকের ভিড় সরাইয়া দিয়া নিজেই তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য দাঁড়াইয়া রহিলেন। মহাপ্রভুর অনুপম সৌন্দর্য ও প্রেমের বিকার দেখিয়া সার্বভৌমের মনে পরম বিস্ময় জন্মিল। তিনি সহজেই বুঝিতে পারিলেন এই সন্ন্যাসী বড় সাধারণ লোক নহেন। মন্দিরে শত শত লোক দাঁড়াইয়া দর্শন করিতেছিল, তাহারাও নীরবে বিস্মিতচিত্তে এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতে লাগিল।

এইরূপে বহুক্ষণ কাটিয়া গেল, তবু মহাপ্রভুর চেতনা হইল না। এদিকে

জগন্নাথদেবের ভোগের সময় উপস্থিত। সে সময়ে মন্দিরমধ্যে কাহারও থাকা নিষেধ।

সার্বভৌম কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া অবশেষে মহাপ্রভুকে নিজের গৃহে লইয়া যাওয়াই সঙ্গত মনে করিলেন। তিনি কয়েকজন অনুগত 'পড়িছার' সাহায্যে ধরাধরি করিয়া মহাপ্রভুকে নিজের বাড়ীতে লইয়া গেলেন এবং পবিত্র স্থানে নির্জনে তাঁহাকে শয়ন করাইলেন। মহাপ্রভুর দেহ সংজ্ঞাহীন, শ্বাস-প্রশ্বাস বা উদরের স্পন্দন নাই। সার্বভৌম মহাচিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হইলেন। দেহে প্রাণ আছে কিনা সন্দেহে সূক্ষ্ম তূলা নাকের নিকট ধরিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন—তূলা ঈষৎ নড়িতেছে। বুঝিলেন সন্ন্যাসীর দেহে প্রাণ আছে, শুধু চেতনা নাই। সার্বভৌম সর্বশাস্ত্রবিৎ মহাপণ্ডিত, তিনি মহাপ্রভুর দেহের লক্ষণ বিচার করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, এ সব তীব্র ভগবৎপ্রেমের বিকার, শাস্ত্রে যাহাকে সাত্ত্বিক বিকার বলে। কদাচিৎ কখনও কোন মহাপুরুষের দেহে এসব লক্ষণ দেখা যায়। বিস্ময় ও সম্ভ্রমমিশ্রিত চিত্তে তিনি ভাবিতে লাগিলেন, এই মহাপুরুষ কে?

এদিকে নিত্যানন্দ, মুকুন্দ, জগদানন্দ প্রভৃতি সঙ্গিগণ মহাপ্রভুর অনুসরণ করিয়া জগন্নাথ মন্দিরের সিংহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। লোকে তখন পরস্পর বলাবলি করিতেছে যে, এক সন্ন্যাসী জগন্নাথ দেখিতে দেখিতে মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল, সার্বভৌম ঠাকুর তাঁহাকে অচেতন অবস্থায় মন্দির হইতে নিজ গৃহে লইয়া গিয়াছেন। শুনিয়াই নিত্যানন্দ প্রভু বুঝিলেন এই সন্ন্যাসী আর কেহ নহেন, স্বয়ং মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ। ঠিক এই সময়ে, নদীয়ানিবাসী পণ্ডিত বিশারদের জামাতা ও সার্বভৌমের ভগিনীপতি গোপীনাথাচার্য সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গোপীনাথাচার্য পূর্ব হইতে মহাপ্রভুর অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন। মুকুন্দকেও তিনি চিনিতেন। সিংহদ্বারে মুকুন্দকে দেখিয়া তিনি কিছু বিস্মিত হইলেন, মুকুন্দও তাঁহাকে সসম্মানে প্রণাম করিলেন। গোপীনাথ মুকুন্দের নিকট মহাপ্রভুর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলে, মুকুন্দ কহিলেন যে, মহাপ্রভু সন্ন্যাস লইয়া জগন্নাথক্ষেত্রে আসিয়াছেন, তাঁহারাও সকলে মহাপ্রভুর সঙ্গে আসিয়াছেন। কিন্তু মহাপ্রভু কিছু আগে একাকী মন্দিরে প্রবেশ করাতেই বিপত্তি ঘটিয়াছে। তিনি লোকমুখে যাহা শুনিয়াছেন, তাহাও গোপীনাথাচার্যের নিকট বর্ণনা করিলেন। গোপীনাথাচার্যও সব কথা শুনিয়া চিন্তিত হইলেন এবং মুকুন্দ নিত্যানন্দ প্রভৃতিকে সঙ্গে করিয়া সার্বভৌমের গৃহে গমন করিলেন।

বেলা তৃতীয় প্রহর। মহাপ্রভুর তখনও চেতনা হয় নাই। সার্বভৌম উদ্বিগ্ন চিত্তে তাঁহার নিকট বসিয়া আছেন। গোপীনাথাচার্য, নিত্যানন্দ. মুকুন্দ প্রভৃতির আগমন সংবাদ শুনিয়া তিনি একটু আশ্বস্ত হইলেন।

তাঁহাদিগকে গৃহের অভ্যন্তরে লইয়া মহাপ্রভুর অবস্থা দেখাইলেন। মহাপ্রভুর সেই অচেতন অবস্থা দেখিয়া নিত্যানন্দ মুকুন্দ প্রভৃতির মনে অত্যন্ত কষ্ট হইল। কিন্তু তাঁহাদের নিকট মহাপ্রভুর এই ভাব নূতন নহে। এ রোগের চিকিৎসা কি, তাহাও তাঁহারা জানিতেন। তাঁহারা সকলে মিলিয়া উচ্চৈঃস্বরে সংকীর্তন আরম্ভ করিলেন। ঔষধের ফল ফলিল, মহাপ্রভু চেতনা পাইয়া "হরি হরি" বলিয়া হুংকার দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং সংকীর্তনে যোগ দিলেন।

পণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌগ এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, সন্ন্যাসীর প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা শতগুণে বাড়িয়া গেল, তিনি ভক্তিভরে সন্ন্যাসীর পদধূলি লইলেন। তার পর সন্ন্যাসী ও তাঁহার সঙ্গিগণের জন্য প্রচুর প্রসাদ আনাইয়া সানন্দে অতিথি সৎকার করিলেন।

আহারাদির পর প্রভু বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময় সার্বভৌম আসিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিলেন। মহাপ্রভুও তাঁহাকে যথারীতি আশীর্বাদ করিলেন। সার্বভৌম গোপীনাথাচার্যের নিকট মহাপ্রভুর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে গোপীনাথ বলিলেন—ইঁহার ঘর নবদ্বীপে, ইনি জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র, নীলাম্বর চক্রবর্তীর দৌহিত্র। সার্বভৌম শুনিয়া প্রীত হইলেন, কহিলেন, নীলাম্বর চক্রবর্তী আমার পিতা পণ্ডিত বিশারদের সহাধ্যায়ী। জগন্নাথ মিশ্রকেও আমি খুব মান্য করি। সুতরাং পিতার সম্পর্কে ইনি (মহাপ্রভু) আমার আত্মীয়। তারপর ইনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং আমার পূজ্য। আমাকে ইঁহার সেবক বলিয়াই জানিবে।

সার্বভৌমের এই বিনয়ে সঙ্কুচিত হইয়া মহাপ্রভু করজোড়ে কহিলেন—আপনি এ কি কথা বলিতেছেন! আপনি পরম পণ্ডিত, জগদ্‌গুরু, সর্বলোক-হিতকারী; সন্ন্যাসীদিগকেও আপনি বেদান্ত পড়াইয়া থাকেন। আমি সন্ন্যাসী হইলেও আপনার নিকট বালক মাত্র, আপনারই আশ্রয় লইয়াছি, আপনি আমাকে শিষ্যজ্ঞানে অনুগ্রহ করিবেন। আজ জগন্নাথ দর্শন করিতে যাইয়া আমি যে ঘোর বিপদে পড়িয়াছিলাম, আপনি না থাকিলে কে তাহা হইতে আমাকে রক্ষা করিত?

মহাপ্রভুর এই বিনয়ে সার্বভৌম পরম সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন—তুমি আর কখন একাকী জগন্নাথ দর্শন করিতে যাইও না। হয় আমার সঙ্গে অথবা আমার কোন লোকের সঙ্গে যাইবে। তারপর গোপীনাথ আচার্যের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—তুমি গোঁসাইকে সঙ্গে লইয়া গিয়া দর্শন করাইবে। আর আমার মাতৃষ্বসা-গৃহ বেশ নির্জন স্থান, সেইখানেই ইঁহার থাকিবার ব্যবস্থা করিবে, যেন কোন অসুবিধা না হয়।

সার্বভৌমের ব্যবস্থা অনুযায়ী মহাপ্রভু তাঁহার (সার্বভৌমের) মাতৃষ্বসা-

গৃহেই রহিলেন এবং প্রত্যহ গোপীনাথাচার্যের সঙ্গে গিয়া দেবদর্শন করিতে লাগিলেন।

কয়েকদিন পরে গোপীনাথ মুকুন্দ দত্তকে সঙ্গে লইয়া সার্বভৌমের গৃহে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সার্বভৌম স-সমাদরে তাঁহাদিগকে বসাইয়া গোপীনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন—এই সন্ন্যাসীটি (মহাপ্রভু) বড়ই বিনীত ও মধুর প্রকৃতি, ইঁহার উপর আমার সহজেই প্রীতি জন্মিয়াছে। ইনি কোন্ সম্প্রদায়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, গুরুদত্ত নামই বা কি জানিতে ইচ্ছা হয়।

গোপীনাথ কহিলেন—ইঁহার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। কেশব ভারতীর নিকট ইনি দীক্ষা লইয়াছিলেন, সুতরাং ইনি 'ভারতী' সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসী।

সার্বভৌম একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, এ'র নামটি বড় চমৎকার কিন্তু 'ভারতী' সম্প্রদায় তো বড় সম্প্রদায় নহে, মধ্যম সম্প্রদায় বলিয়াই গণ্য।

গোপীনাথ কহিলেন—ইনি এ সব বিষয়ে উদাসীন, সুতরাং কোন বড় সম্প্রদায়ে দীক্ষা লইতে আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই।

সার্বভৌম কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া পুনরায় কহিলেন—ইনি সন্ন্যাস লইয়াছেন বটে, কিন্তু ইঁহার পূর্ণ যৌবন কাল, কিরূপে সন্ন্যাস ধর্ম রক্ষা হইবে, তাহা চিন্তার বিষয়। আমার ইচ্ছা ইঁহাকে নিরন্তর বেদান্ত শাস্ত্র পড়াইয়া অদ্বৈত-মার্গে শিক্ষা দিই। আর যদি ইঁহার সম্মতি থাকে, তবে পুনরায় কোন উত্তম সম্প্রদায়ের নিকট সন্ন্যাস ধর্ম শিক্ষা লওয়াইবার ব্যবস্থাও করিতে পারি।

সার্বভৌমের কথা শুনিয়া গোপীনাথ ও মুকুন্দ দুঃখিত হইলেন। গোপীনাথ কহিলেন, সার্বভৌম, তুমি মহা পণ্ডিত বটে, কিন্তু ভক্তিতত্ত্ব বা ঈশ্বরতত্ত্বে তোমার জ্ঞান নাই। অতএব তুমি এই সন্ন্যাসীর মহিমা বুঝিতে পারিবে না। ইনি যে-সে সন্ন্যাসী নহেন, সাক্ষাৎ ভগবানের অবতার বলিয়াই আমি ইঁহাকে মনে করি।

সার্বভৌম ঈষৎ হাসিয়া গোপীনাথের সঙ্গে অবতারবাদের বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন এবং নানা যুক্তির দ্বারা তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিলেন যে, তাঁহার (গোপীনাথের) বিশ্বাস সত্য হইতে পারে না। কিন্তু গোপীনাথের বিশ্বাস টলিল না। অবশেষে সার্বভৌম পরিহাস করিয়া বলিলেন—আচ্ছা, আপাততঃ তুমি আমার পক্ষ হইতে সদলবলে গোঁসাইকে (মহাপ্রভুকে) নিমন্ত্রণ করিয়া আইস, তারপর আমাকে অবতার-তত্ত্ব শিক্ষা দিও।

গোপীনাথ গিয়া মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে সার্বভৌম তাঁহাকে বেদান্ত পড়াইবার যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহাও বলিলেন। মহাপ্রভু সসম্ভ্রমে কহিলেন, সার্বভৌম আমাকে অত্যন্ত অনুগ্রহ করেন, সেইজন্যই এই-রূপ বলিয়াছেন, আমার প্রতি তাঁহার গভীর স্নেহ আছে বলিয়াই আমার

সন্ন্যাসধর্ম রক্ষা করিতে তিনি এত ব্যগ্র। ইহাতে কোন দোষ নাই, আমি তাঁহার নিকট বেদান্ত পড়িব।

একদিন সার্বভৌমের সঙ্গে জগন্নাথ দর্শন করিতে আসিয়া সত্যই মহাপ্রভু তাঁহার নিকট বেদান্ত পড়িতে চাহিলেন।

সার্বভৌম সস্নেহে মহাপ্রভুকে বলিলেন,—বেদান্ত শ্রবণ সন্ন্যাসীর পরম ধর্ম, অতএব তুমি আমার নিকট বেদান্ত শ্রবণ কর, তোমার মঙ্গল হইবে।

মহাপ্রভু সবিনয়ে কহিলেন,—আপনি আমার গুরুতুল্য, আপনি যাহা বলিবেন, তাহা পালন করাই আমার কর্তব্য।

এইরূপে সার্বভৌম বেদান্ত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন, মহাপ্রভু বিনীত শিষ্যের মত একাগ্রচিত্তে তাহা শুনিতে লাগিলেন। কিন্তু মহাপ্রভু কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন না, বা আপত্তি তুলিতেন না,—কেবল নীরবে শুনিয়া যাইতেন। সাতদিন এইভাবে বেদান্ত পাঠ ও শ্রবণের পর, অষ্টম দিবসে পড়াইতে বসিয়া সার্বভৌম মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—আজ সাতদিন হইল, তুমি বেদান্ত শ্রবণ করিতেছ, কিন্তু ভাল মন্দ কোন কথাই বলিতেছ না। সুতরাং বেদান্ত বুঝিতেছ কি না, তাহাও আমি ঠিক করিতে পারিতেছি না।

মহাপ্রভু সবিনয়ে কহিলেন—আমি মূর্খ, পড়াশুনা নাই, কেবলমাত্র আপনার আদেশে শ্রবণ করিতেছি। আপনি বলিয়াছেন, বেদান্ত শ্রবণ সন্ন্যাসীর ধর্ম, সেই জন্যই বেদান্ত শুনিতেছি। কিন্তু আপনি যে অর্থ করিতেছেন, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।

সার্বভৌম ঈষৎ অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—কোন বিষয় বুঝিতে পারিতেছে না, এইরূপ যাহার জ্ঞান, সে তাহা জানিবার জন্য প্রশ্ন করে; কিন্তু তুমি নীরব হইয়া আছ, ভালমন্দ কোন কথাই জিজ্ঞাসা করিতেছ না। সুতরাং তোমার মনের ভাব আমি কিরূপে বুঝিব?

মহাপ্রভু ধীরে ধীরে কহিলেন—আপনি বেদান্তের যে সূত্র পড়িতেছেন, তাহার অর্থ অতি স্পষ্ট বুঝিতেছি, কিন্তু আপনি সূত্রের যে ভাব বা অর্থ করিতেছেন, তাহাই বুঝিতেছি না। মনে হয়, আপনার অর্থ কল্পিত, প্রকৃত অর্থ অন্যরূপ। এই বলিয়া মহাপ্রভু নিজেই বেদান্ত সূত্রের ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন এবং শঙ্করাচার্যের মায়াবাদ খণ্ডন করিয়া ভক্তিতত্ত্ব স্থাপন করিলেন।

সার্বভৌম জগৎ-বিখ্যাত পণ্ডিত, সর্বশাস্ত্রে তাঁহার অসীম অধিকার, বেদান্ত তাঁহার জিহ্বাগ্রে। কিন্তু তাঁহার ন্যায় পণ্ডিতেরও মহাপ্রভুর মুখে বেদান্ত-সূত্রের নূতন ব্যাখ্যা শুনিয়া পরম বিস্ময় জন্মিল। তিনি অবাক্ হইয়া মহাপ্রভুর বাক্যসুধা পান করিতে লাগিলেন। সার্বভৌমের বিস্ময় দেখিয়া মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—ভট্টাচার্য, আপনি বিস্মিত হইবেন না, ভগবানে ভক্তিই মানুষের জীবনের চরম লক্ষ্য। সর্বত্যাগী আত্মারাম মুনিরাও ভক্তিপথে

ঈশ্বরকে ভজনা করিয়া থাকেন। এই বলিয়া মহাপ্রভু শ্রীমদ্ভাগবতের একটি শ্লোক* আবৃত্তি করিলেন। সার্বভৌম শ্লোক শুনিয়া প্রীত হইয়া মহাপ্রভুকে কহিলেন,—তুমি আমাকে এই শ্লোক ব্যাখ্যা করিয়া শুনাও।

মহাপ্রভু কহিলেন—আপনি মহা পণ্ডিত, আপনিই আগে ব্যাখ্যা করুন, পরে আমি সে চেষ্টা করিব।

সার্বভৌম প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যসহকারে সেই শ্লোকের নয় রকম বিভিন্ন ব্যাখ্যা করিলেন। মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন,—ভট্টাচার্য, অসাধারণ আপনার পাণ্ডিত্য ও প্রতিভা, আপনি সাক্ষাৎ বৃহস্পতি, অন্য কাহারও দ্বারা এরূপ ব্যাখ্যা সম্ভবপর নয়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এই শ্লোকের অন্য দুই একটি অর্থও আমার মনে উদয় হইতেছে। এই বলিয়া মহাপ্রভু অপূর্ব পাণ্ডিত্য সহকারে সেই শ্লোকের আঠার রকম বিভিন্ন ব্যাখ্যা করিলেন।

পণ্ডিত সার্বভৌম মহাপ্রভুর এই অদ্ভুত পাণ্ডিত্য দেখিয়া স্তম্ভিত ও হতবুদ্ধি হইলেন, ভাবিলেন,—মানুষের এরূপ শক্তি সম্ভবপর নয়। তাঁহার পাণ্ডিত্যগর্ব দূর হইল, মায়াবাদের মোহ অন্তর্হিত হইল। চিত্তে নির্মল ভক্তি-রসের উদয় হইল। ভগবানের নাম করিয়া তিনি প্রেমে পুলকিত হইয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। যে সার্বভৌম তর্কশাস্ত্রে অদ্বিতীয়, বেদান্তে পরম পণ্ডিত, সন্ন্যাসীদের যিনি গুরু, মায়াবাদে যাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস, যাঁহার চিত্তে শুষ্ক পাণ্ডিত্য ব্যতীত ভক্তির লেশমাত্র ছিল না, আজ তাঁহার মধ্যে এই ঘোর পরিবর্তন দেখিয়া মহাপ্রভুর সঙ্গী ভক্তগণ পরম আনন্দিত হইলেন। বৃদ্ধ স্থূলকায় সার্বভৌমের নৃত্য দেখিয়া গোপীনাথাচার্য, মুকুন্দ প্রভৃতি কৌতুকভরে হাসিতে লাগিলেন। গোপীনাথাচার্য মহাপ্রভুকে কহিলেন—প্রভু, তোমার অনুগ্রহেই ভট্টাচার্যের আজ এই সৌভাগ্য!

মহাপ্রভু হাসিয়া বলিলেন,—তোমাদের ন্যায় ভক্তগণের সঙ্গগুণেই ভট্টাচার্যের এরূপ ভগবদ্ভক্তি লাভ হইয়াছে, আমার কোন কৃতিত্ব নাই।

ইহার কয়েকদিন পরে মহাপ্রভু প্রত্যূষে জগন্নাথদর্শনে গমন করিয়াছেন। জগন্নাথের পূজারী ঠাকুরের মালা ও প্রসাদান্ন আনিয়া মহাপ্রভুকে দিলেন। মহাপ্রভু হৃষ্টচিত্তে সেই মালা ও প্রসাদান্ন অঞ্চলে বাঁধিয়া সার্বভৌমের গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সার্বভৌম তখন সবেমাত্র নিদ্রা হইতে উঠিয়া কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতেছেন। মহাপ্রভুর আগমন সংবাদ শুনিয়া তিনি ব্যস্তভাবে আসিয়া মহাপ্রভুর চরণ বন্দনা পূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, এত প্রত্যূষে তাঁহার আগমনের

---

* আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥
আত্মারাম মুনিগণ সর্বপ্রকার বন্ধনশূন্য হইয়াও সেই বিপুল পরাক্রমশালী শ্রীহরিতে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন। শ্রীহরির গুণই এই প্রকার।

কারণ কি? মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—জগন্নাথ মন্দিরে গিয়াছিলাম, তথা হইতে তোমার জন্য মালা ও প্রসাদান্ন আনিয়াছি। এই বলিয়া মহাপ্রভু সার্বভৌমের গলায় প্রসাদী মালা পরাইয়া দিলেন এবং তাঁহার মুখে মহাপ্রসাদ তুলিয়া দিলেন। সার্বভৌম পণ্ডিত, শুদ্ধাচারী, নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ, তখন পর্যন্ত তিনি স্নান আহ্নিক করেন নাই, এমন কি হস্তমুখ পর্যন্ত ধৌত করেন নাই। পূর্বের ভাব থাকিলে 'অশুচি' অবস্থায় তিনি কখনই 'মহাপ্রসাদ' লইতেন না। কিন্তু মহাপ্রভুর কৃপায় আজ তাঁহার মনের সকল জড়তা দূর হইয়াছে, "শুচি অশুচির" ভ্রান্ত বিশ্বাস লোপ পাইয়াছে। ভগবানে ভক্তিই সার ধর্ম, শুষ্ক পাণ্ডিত্য ও বাহ্য আচারপরায়ণতার যে কোন মূল্যই নাই, এই জ্ঞান তাঁহার মনে জন্মিয়াছে। তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করিয়া সেই অবস্থাতেই মহাপ্রসাদ লইয়া মুখে দিলেন এবং ভগবৎপ্রেমে বিভোর হইলেন। মহাপ্রভুও সার্বভৌমের এই ভাব দেখিয়া পরম আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন, তারপর দুইজনে প্রেমাবিষ্ট হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু কহিলেন,—

আজি মুঞি অনায়াসে জিনিনু ত্রিভুবন।
আজি মুঞি করিনু বৈকুণ্ঠে আরোহণ॥
আজি মোর পূর্ণ হইল সর্ব অভিলাষ।
সার্বভৌমের হৈল মহাপ্রসাদে বিশ্বাস॥
আজি নিষ্কপটে তুমি কৈলা কৃষ্ণাশ্রয়।
কৃষ্ণ নিষ্কপটে হৈলা তোমারে সদয়॥
আজি সে খণ্ডিল তোমার দেহাদি বন্ধন।
আজি ছিন্ন কৈলে তুমি মায়ার বন্ধন॥
আজি কৃষ্ণপ্রাপ্তি যোগ্য হৈল তোমার মন।
বেদধর্ম লঙ্ঘি কৈলে প্রসাদ ভক্ষণ॥ —(চৈতন্যচরিতামৃত)

সেই হইতে মহাপণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌম পরম বৈষ্ণব ও মহাপ্রভুর একান্ত অনুরক্ত ভক্ত হইলেন। পণ্ডিত বাসুদেবের এই পরিবর্তন শ্রীগৌরাঙ্গের জীবনে যুগান্তকারী ঘটনা। সার্বভৌম তৎকালের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত, উড়িষ্যার সম্রাট প্রতাপরুদ্রের তিনি গুরুতুল্য, তাঁহার প্রভাব প্রতিপত্তি অসীম। সুতরাং তাঁহার এই পরিবর্তনে চারিদিকে একটা সাড়া পড়িয়া গেল, মহাপ্রভুর প্রতি আপামর সর্বসাধারণের ভক্তি ও শ্রদ্ধা বাড়িয়া গেল। স্বয়ং প্রতাপরুদ্র পর্যন্ত এই ব্যাপার শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন এবং মহাপ্রভুর কৃপালাভের জন্য উৎকণ্ঠিত হইলেন। মহাপ্রভু প্রেমধর্ম প্রচার করিবার জন্য সন্ন্যাস লইয়াছিলেন। তাঁহারা নীলাচলে আসিবার পর প্রথমেই সার্বভৌমের প্রেমধর্ম দীক্ষা গ্রহণে সেই প্রচার কার্যের শক্তি অশেষরূপে বৃদ্ধি পাইল।

১২

দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ ও রায় রামানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ

মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ মাঘ মাসের শুক্লপক্ষে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ফাল্গুন মাসে তিনি নীলাচলে আসিয়া বাস করেন। চৈত্র মাসে সার্বভৌমকে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা দান করেন। বৈশাখ মাসে তাঁহার ইচ্ছা হইল দক্ষিণ ভারতে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারার্থ বহির্গত হইবেন। তিনি নিত্যানন্দ, মুকুন্দ প্রভৃতি ভক্তগণকে ডাকিয়া বলিলেন,—আমি দক্ষিণ দেশে তীর্থ দর্শনে যাইতে ইচ্ছা করিয়াছি। সম্পূর্ণ একাকী যাইব। সঙ্গে কাহাকেও লইব না, তোমরা আমাকে সানন্দে অনুমতি দান কর। শুনিয়া ভক্তগণ অত্যন্ত বিষণ্ণ ও চিন্তিত হইলেন। নিত্যানন্দ কহিলেন,—তুমি একাকী যাইবে, এ হইতে পারে না। পথে কখন কি বিপদ ঘটে তাহার ঠিক কি? পথঘাটও তুমি চেন না। আমি দক্ষিণ দেশের সমস্ত তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছি। আমি সঙ্গে গেলে তোমার কোন কষ্ট হইবে না।

মহাপ্রভু সবিনয়ে কহিলেন—একাকী তীর্থ ভ্রমণ করাই আমার ইচ্ছা। তোমার সঙ্গে গেলে আমার সে ইচ্ছা পূর্ণ হইবে না। অতএব দয়া করিয়া তোমরা আমাকে যাইতে অনুমতি দাও।

নিত্যানন্দ অনেক মিনতি করিলেন, কিন্তু মহাপ্রভু শুনিলেন না। অবশেষে নিত্যানন্দ প্রস্তাব করিলেন যে কৃষ্ণদাস নামে একজন ব্রাহ্মণ জলপাত্র, বস্ত্র ইত্যাদি রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার সঙ্গে যাইবে। মহাপ্রভু নিজে অনেক সময়ই ভগবৎপ্রেমে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া থাকেন, সুতরাং এরূপ একজন লোক না থাকিলে চলিবে কিরূপে? মহাপ্রভু অগত্যা এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। নিত্যানন্দ প্রভৃতিকে বুঝাইয়া মহাপ্রভু সার্বভৌমের নিকটে বিদায় লইতে গেলেন। সার্বভৌম এই প্রস্তাব শুনিয়া অত্যন্ত কাতর হইলেন। কিন্তু মহাপ্রভুর বিনয়ে অবশেষে তিনিও সম্মত হইলেন। তবে তাঁহার অনুরোধে মহাপ্রভু আরও কয়েক দিবস নীলাচলে রহিয়া গেলেন।

যাত্রার দিন আসিল। মহাপ্রভু জগন্নাথ দর্শন ও মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া সমুদ্রতীরের পথে দক্ষিণ দেশে যাত্রা করিলেন। সার্বভৌম কিছুদূর পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। মহাপ্রভুকে সার্বভৌম কহিলেন—দক্ষিণ দেশে বিদ্যানগরে রায় রামানন্দ আছেন। তিনি সম্রাট প্রতাপরুদ্রের অধীনে বিদ্যানগরের অধিকারী। প্রভু, তুমি অবশ্যই রায় রামানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবে। এটি আমার বিশেষ অনুরোধ। রায় রামানন্দের মত কৃষ্ণভক্ত ও রসিক ব্যক্তি বিরল।

তিনি তোমার সঙ্গ লাভেরই যোগ্য ব্যক্তি। পূর্বে তাঁহার চরিত্র-মহিমা আমি ভাল বুঝিতে পারি নাই। সময়ে সময়ে তাঁহাকে পরিহাসও করিয়াছি। কিন্তু এখন বুঝিতেছি, তিনি কত বড় লোক। ভগবানে তাঁহার কি অসীম প্রেম ও ভক্তি।

মহাপ্রভু সার্বভৌমের বাক্যে রায় রামানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হইলেন।

নীলাচলের সীমায় আসিলে মহাপ্রভু সার্বভৌমকে বিদায় দিলেন, সার্বভৌম শোকে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। অন্তরে অত্যন্ত ব্যথিত হইলেও, মহাপ্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া দ্রুতবেগে সমুদ্রতীরের পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সঙ্গে নিত্যানন্দ, মুকুন্দ, জগদানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ, পশ্চাতে অসংখ্য লোক। এইরূপে পুরী হইতে তিন ক্রোশ দূরে আলালনাথে আসিয়া মহাপ্রভু উপস্থিত হইলেন এবং তথাকার দেবমন্দিরে বিশ্রাম গ্রহণ করিলেন।

এইখানে মহাপ্রভুকে দর্শন করিবার জন্য যাত্রী ক্রমেই বাড়িতে লাগিল—শেষে এমন হইল যে সেই ক্ষুদ্র গ্রামে লোক আর ধরে না। মহাপ্রভু সমস্ত দিন সেখানে জনতার সঙ্গে মিলিয়া নৃত্য ও কীর্তন করিলেন। নিত্যানন্দ প্রভৃতি দেখিলেন, এইভাবে চলিলে, মহাপ্রভুর আর আলালনাথ ত্যাগ করা সম্ভবপর হইবে না। অগত্যা তাঁহারা কয়েক জনে পরামর্শ করিয়া মহাপ্রভুকে লোকের ভিড় হইতে কোন ক্রমে সরাইয়া আনিয়া মন্দিরের দ্বার বন্ধ করিলেন।

পরদিন প্রত্যুষে নিত্যানন্দ প্রভৃতিকে বিদায় দিয়া মহাপ্রভু ব্রাহ্মণ কৃষ্ণদাসের সঙ্গে একাকী দক্ষিণ দেশের পথে যাত্রা করিলেন। মহাপ্রভু পথে চলিতেছেন, আর মুখে উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম কীর্তন করিতেছেন :—

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রক্ষ মাম্।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি মাম্॥
রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাম্।
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাম্॥

এই নাম শুনিয়া দলে দলে লোক গ্রাম হইতে আকৃষ্ট হইয়া আসিতেছে এবং প্রেমে মত্ত হইয়া মহাপ্রভুর সঙ্গে সঙ্গে কীর্তন ও নৃত্য করিতেছে। সেই সব লোক আবার গ্রামে ফিরিয়া গিয়া গ্রামবাসীদের মধ্যে হরিনাম প্রচার করিতেছে। এইরূপে সমস্ত দক্ষিণ দেশে মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ হরিনাম প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রভাবে দক্ষিণ দেশের অধিকাংশ লোক বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করিল। মহাপ্রভুর ধর্মপ্রচারের এই নূতন প্রণালী যেমন মনোহর, তেমনি কার্যকরী।

মহাপ্রভু এইভাবে হরিনাম বিলাইতে বিলাইতে কূর্মস্থান নামক তীর্থ-ক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং একরাত্রি সেখানে এক ব্রাহ্মণের গৃহে বিশ্রাম করিয়া পরদিন যাত্রা করিলেন। সেই গ্রামে বাসুদেব নামে আর এক ব্রাহ্মণ ছিল। তাহার সর্বাঙ্গে গলিত কুষ্ঠ ব্যাধি। একজন মহাপুরুষ আসিয়াছেন শুনিয়া পরদিন প্রভাতে বাসুদেব ব্রাহ্মণের গৃহে গেল, কিন্তু সেখানে গিয়াই শুনিল যে, মহাপ্রভু প্রভাতে গ্রাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। বাসুদেব মনের দুঃখে নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া কাঁদিতে লাগিল। মহাপ্রভু কিছুদূরে গিয়া লোকমুখে এই বার্তা শুনিতে পাইয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং সেই কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত বাসুদেবকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিলেন। বাসুদেব মহাপ্রভুর অদ্ভুত প্রেম ও করুণা দেখিয়া তাঁহার পদতলে লুটাইয়া পড়িল। কথিত আছে যে, মহাপ্রভুর স্পর্শে বাসুদেব কুষ্ঠ ব্যাধি হইতে মুক্ত হইয়াছিল।

এইরূপে চলিতে চলিতে হরিনাম প্রচার করিতে করিতে কিছুদিন পরে মহাপ্রভু গোদাবরী নদীতীরে বিদ্যানগরে আসিয়া পৌঁছিলেন। রামানন্দ রায় এই বিদ্যানগরেই থাকিতেন। মহাপ্রভু গোদাবরী নদীতে স্নান করিয়া সাধারণের স্নানের ঘাট হইতে একটু দূরে বসিয়া হরিনাম সঙ্কীর্তন করিতে লাগিলেন। এমন সময় রায় রামানন্দ দোলায় চড়িয়া মহাধুমধামে স্নান করিতে আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে বিস্তর লোকজন, সৈন্য পাইক, নানারূপ বাদ্যও বাজিতেছে। বহু বৈদিক ব্রাহ্মণও সঙ্গে আসিয়াছেন। রায় রামানন্দ উৎকল সম্রাটের প্রতিনিধি, স্থানীয় শাসক, সুতরাং তাঁহার স্নানকালে এরূপ রাজ-আড়ম্বর স্বাভাবিক।

মহাপ্রভু পূর্বেই সার্বভৌমের নিকট রায় রামানন্দের কথা শুনিয়াছিলেন, এখন তাঁহাকে দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন, ইনিই রায় রামানন্দ। তাঁহার একবার ইচ্ছা হইল, নিজেই ছুটিয়া রায় রামানন্দকে সম্ভাষণ করেন, কিন্তু লোকব্যবহার স্মরণ করিয়া তিনি ধৈর্য ধারণ করিলেন। এদিকে রায় রামানন্দও দেখিলেন, এক অপূর্ব সন্ন্যাসী—

শত সূর্য সম কান্তি অরুণ বসন।
সুবলিত প্রকাণ্ড দেহ কমল লোচন॥

দেখিয়া তিনি চমৎকৃত হইলেন এবং আস্তেব্যস্তে উঠিয়া গিয়া তাঁহাকে শ্রদ্ধাভরে প্রণাম করিলেন। মহাপ্রভুর প্রবল ইচ্ছা তখনই তাঁহাকে আলিঙ্গন করেন। তথাপি নিশ্চিত হইবার জন্য ধৈর্যধারণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমি কি রায় রামানন্দ? রায় রামানন্দ কহিলেন,—আমিই সেই অধম!

মহাপ্রভু তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন এবং উভয়েই প্রেমে অচেতন হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন। উপস্থিত ব্রাহ্মণগণ এবং অন্যান্য সকলে ব্যাপার

দেখিয়া বিস্মিত ও চমৎকৃত হইল। তাহারা ভাবিতে লাগিল, এই সন্ন্যাসী সূর্যের মত তেজঃপুঞ্জকান্তি, ইনি কেন বিষয়ী রায় রামানন্দকে আলিঙ্গন করিলেন? আর এই মহারাজও (রায় রামানন্দ) পরম গম্ভীর, মহাপণ্ডিত, ইনিই বা কেন সন্ন্যাসীর স্পর্শে এমন বিচলিত হইলেন?

কিছুক্ষণ পরে মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ উভয়েই আত্মসম্বরণ করিয়া উঠিয়া বসিলেন। মহাপ্রভু কহিলেন,—সার্বভৌমের নিকট তোমার অশেষ গুণের কথা শুনিয়াছি, তাই তোমাকে দেখিবার জন্য এখানে আসিলাম। রামানন্দ কহিলেন,—আমার পরম সৌভাগ্য, তোমার মত মহাপুরুষ যে আমাকে দর্শন দিতে আসিয়াছেন ইহাতে আমার মনুষ্যজন্ম সফল হইল। আমি শূদ্র, বিষয়ী, আর তুমি সাক্ষাৎ নারায়ণস্বরূপ, আমাকে উদ্ধার করিবার জন্যই আমার প্রতি তোমার এই করুণা।

মহাপ্রভু শশব্যস্তে কহিলেন—সে কি, কে তোমাকে বিষয়ী শূদ্র বলে? তুমি পরম ভক্ত, মহাভাগবতোত্তম, তোমার স্পর্শে মনে কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হয়।

এইরূপে মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ যখন উভয়ে উভয়ের গুণকীর্তন করিতেছেন, সেই সময়ে একজন বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ আসিয়া মহাপ্রভুকে তাঁহার গৃহে নিমন্ত্রণ করিলেন। মহাপ্রভু সন্ন্যাসী,—বিষয়ী, রাজকর্মচারী রায় রামানন্দের গৃহে আতিথ্য গ্রহণে তিনি অনিচ্ছুক, ইহা জানিয়াই বোধ হয় ব্রাহ্মণ স্বগৃহে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু ইহাতে সন্তুষ্ট হইলেন, হাসিয়া কহিলেন—রায়, এখনকার মত তবে বিদায়, পুনরায় যেন তোমার দর্শন পাই। কেননা তোমার মুখে কৃষ্ণকথা শুনিতে আমার প্রবল আকাঙ্ক্ষা। রায় রামানন্দ সবিস্ময়ে কহিলেন, আমি কৃষ্ণকথার কি জানি! তবু যদি দয়া করিয়া আমাকে উদ্ধার করিতে চাও, তবে কয়েকদিন এখানে থাকিয়া উপদেশ দানে আমার চিত্ত শুদ্ধি করিতে হইবে।

এইরূপে পরস্পরে বিদায় গ্রহণ করিলেন। সন্ধ্যাকালে মহাপ্রভু রায় রামানন্দের প্রতীক্ষায় ব্রাহ্মণের গৃহে বসিয়া আছেন, এমন সময় মাত্র একজন ভৃত্য সঙ্গে করিয়া সংগোপনে রায় রামানন্দ মহাপ্রভুর নিকট আসিলেন। তাঁহার সেই ঐশ্বর্যগর্ব আড়ম্বর কিছুই নাই। ধর্মজিজ্ঞাসু হইয়াই বিনীত ভাবে তিনি মহাপ্রভুর নিকটে আসিয়াছেন।

তারপর দুইজনে ধর্মালোচনা আরম্ভ হইল। রায় রামানন্দ পরম ভক্ত, সাধক, সর্বশাস্ত্রজ্ঞ, পণ্ডিত, ধর্মবেত্তা। মহাপ্রভু তাঁহাকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, আর রায় রামানন্দ গভীর পাণ্ডিত্য সহকারে তাহার উত্তর দিতে লাগিলেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে ধর্মের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্ব রায় রামানন্দের মুখ দিয়া মহাপ্রভু বিবৃত করাইতে লাগিলেন। বৈষ্ণব ধর্মের সারতত্ত্ব, কৃষ্ণতত্ত্ব,

রাধাতত্ত্ব, প্রেমধর্মের স্বরূপ একে একে সকল কথাই রায় রামানন্দ বলিলেন। সেই সব দার্শনিক বিচার উদ্ধৃত করিবার স্থান এ নয়, শুধু এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দের কথাবার্তায় প্রেমধর্মের যে স্বরূপ বিবৃত হইয়াছে, পৃথিবীতে তাহার তুলনা নাই।

দশদিন এইরূপে রায় রামানন্দের সঙ্গে মহাপ্রভুর আলোচনা হইল। দশদিন পরে মহাপ্রভু রায় রামানন্দের নিকট বিদায় গ্রহণ করিবার সময় তাঁহাকে কহিলেন,—আমার অনুরোধ তুমি আর বিষয়ে লিপ্ত থাকিও না। রাজকার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তুমি নীলাচলে যাও, আমিও তীর্থভ্রমণ শেষ করিয়া তোমার সঙ্গে সেখানে গিয়া মিলিত হইব এবং দুইজনে কৃষ্ণকথায় পরমানন্দে কাল কাটাইব।

রায় রামানন্দ মহাপ্রভুর প্রস্তাবে সানন্দে সম্মত হইলেন। সেই হইতে রায় রামানন্দ মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের অন্যতম প্রধান ভক্ত ও শিষ্য মধ্যে পরিগণিত হইলেন।

মহাপ্রভুর প্রেমধর্মপ্রচারে যাঁহারা সর্বাপেক্ষা অধিক সহায়তা ও শক্তিসঞ্চার করিয়াছেন, ইনি তাঁহাদের মধ্যে অগ্রণী। মহাপ্রভুর যে "সাড়ে তিনজন পাত্র" বা অন্তরঙ্গ ভক্তের নাম উল্লিখিত হইয়া থাকে, তন্মধ্যে তিনি একজন। রায় রামানন্দ কেবল ভক্তচূড়ামণি ও রসিকশ্রেষ্ঠ ছিলেন না, তিনি নিজে একজন কবি ও নাট্যকারও ছিলেন। তাঁহার "জগন্নাথবল্লভ" নাটক বৈষ্ণব সাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ।

বিদ্যানগর ত্যাগ করিয়া মহাপ্রভু পুনর্বার দক্ষিণ দেশের পথে চলিতে লাগিলেন। পথে পূর্ববৎ হরিনাম প্রচার ও গ্রামবাসীদিগকে আকৃষ্ট করিতে লাগিলেন। এইরূপে মহাপ্রভু দক্ষিণ দেশে সমস্ত প্রধান প্রধান তীর্থই ভ্রমণ করিয়াছিলেন। শ্রীরঙ্গক্ষেত্রের মধ্য দিয়া রামেশ্বর সেতুবন্ধ, তথা হইতে কাবেরী ও তুঙ্গভদ্রা নদী অতিক্রম করিয়া গুজরাট প্রান্তে সমুদ্রতীরে দ্বারকা তীর্থ, সেখান হইতে ফিরিয়া তাপ্তী নদীতীরে মাহিষ্মতী পুরী (মহীশূর)। তারপর পঞ্চবটী ও নাসিক তীর্থ। পথে অন্যান্য যে সব শত শত তীর্থ তিনি দর্শন করিয়াছিলেন, সবিস্তারে তাহার বর্ণনা করা অসম্ভব। স্থানে স্থানে বৌদ্ধ, মায়াবাদী বৈদান্তিক, তত্ত্ববাদী প্রভৃতিদের সঙ্গে তাঁহার বিচার হইয়াছিল। বিচারে তাহাদের সকলকেই পরাস্ত করিয়া তিনি বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করাইয়াছিলেন।

কথিত আছে, দক্ষিণ দেশ ভ্রমণের সময় সুপ্রসিদ্ধ মারাঠী ভক্ত ও সাধু তুকারামের সঙ্গে মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ হয়। তুকারাম মহাপ্রভুর অসামান্য শক্তি দেখিয়া তাঁহার শিষ্য হন এবং তাঁহার নিকট মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করেন। তুকারামের কয়েকটি "অভঙ্গ" (দোঁহা বা কবিতা) হইতে এই ব্যাপারের আভাস পাওয়া

যায়। আমরা এই ঘটনাকে ঐতিহাসিক সত্য বলিয়াই মনে করিতে কোন বাধা দেখি না।

দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের তীর্থ ভ্রমণ শেষ করিয়া মহাপ্রভু বিদ্যানগরে ফিরিয়া আসিলেন এবং রামানন্দের সঙ্গে পুনরায় দুইদিন কৃষ্ণ-কথা আলোচনা করিয়া কাটাইলেন। রায় রামানন্দ কহিলেন,—তোমার ইচ্ছায় আমি রাজাকে পত্র লিখিয়াছিলাম। তিনি আমাকে রাজকার্যে অবসর লইয়া নীলাচলে যাইতে অনুমতি দিয়াছেন। কিন্তু তুমি আগে নীলাচলে গমন কর। আমি কয়েকদিন পরে তোমার অনুসরণ করিব। কেননা আমার সঙ্গে লোকজন, হাতী ঘোড়া, সৈন্য-কোলাহল থাকিবে, তাহাতে তোমার অত্যন্ত অসুবিধা হইবে। মহাপ্রভুও এই কথা সঙ্গত মনে করিয়া একাকী নীলাচলের পথে প্রত্যাবর্তন করিলেন। নীলাচলে সার্বভৌম, নিত্যানন্দ, মুকুন্দ, জগদানন্দ, গদাধর প্রভৃতি তাঁহার আশাপথ চাহিয়া দিন গণনা করিতেছিলেন। মহাপ্রভুর আগমনে তাঁহাদের দেহে যেন প্রাণ ফিরিয়া আসিল।

১৩

রাজা প্রতাপরুদ্রের সঙ্গে মিলন

উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্র মহা পরাক্রমশালী। বলিতে গেলে, ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে পূর্ব ভারতে তাঁহার ন্যায় পরাক্রান্ত স্বাধীন হিন্দু নরপতি আর ছিলেন না। অধিকাংশই পাঠান বা মোগলদের দ্বারা পরাস্ত বা বিধ্বস্ত হইয়াছিলেন। প্রতাপরুদ্রের রাজ্যসীমা এক দিকে গঙ্গাতীরবর্তী রাঢ়-দেশ; অন্যদিকে গঞ্জাম কর্ণাট পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এক কথায় তিনি রাজচক্রবর্তী সম্রাট ছিলেন, তাঁহার প্রচলিত উপাধি ছিল—"গজপতি"। সন্ন্যাস গ্রহণের পর, এই মহা পরাক্রান্ত স্বাধীন হিন্দু নরপতির রাজ্যে বাস করিয়া মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম প্রচারের বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। বাঙ্গালাদেশ তখন পাঠান শাসকদের করতলগত, উত্তর ভারতের অধিকাংশই পাঠান বা মোগলদের অধিকারে। সুতরাং উড়িষ্যাই তখন মহাপ্রভুর ধর্মপ্রচারের প্রধান কেন্দ্র রূপে গণ্য হইবার যোগ্যস্থান ছিল। পুরী বা নীলাচল ক্ষেত্র এখনও যেমন, তখনও তেমনি হিন্দুদের অন্যতম প্রধান তীর্থ ছিল। ভারতের সমস্ত প্রদেশ হইতেই তীর্থ-দর্শন করিতে অসংখ্য লোক এখানে আসিত, বহু সাধু সন্ন্যাসীরও এখানে সমাগম হইত। সুতরাং নীলাচলে কেন্দ্র করিয়া মহাপ্রভুর ধর্মপ্রচারে বিশেষ সহায়তা হইল।

রাজা প্রতাপরুদ্র মহাপ্রভুর আগমনবার্তা শুনিয়াছিলেন। মহাপ্রভু দক্ষিণে যাত্রা করিলে, তিনি বাসুদেব সার্বভৌমকে এক দিন বলিলেন—শুনিলাম, তোমার গৃহে গৌড়দেশ হইতে এক মহাপুরুষ আসিয়াছেন। তিনি অশেষ করুণাময়, তোমার প্রতি কৃপা করিয়াছেন। আমার প্রতি দয়া করিয়া তাঁহাকে দর্শন করাও।

সার্বভৌম উত্তর দিলেন—মহারাজ, তুমি সত্য সংবাদই শুনিয়াছ। গৌড় হইতে মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ আসিয়াছেন। কিন্তু তিনি বিরক্ত সন্ন্যাসী, স্বপ্নেও রাজদর্শন করেন না। তথাপি কোন সুযোগে তোমাকে দর্শন করাইতে পারিতাম, কিন্তু তিনি এখন নীলাচলে নাই। অল্পদিন হইল দক্ষিণদেশে তীর্থ ভ্রমণে গমন করিয়াছেন।

প্রতাপরুদ্র কহিলেন,—মহাপ্রভু নীলাচল তীর্থ ছাড়িয়া গেলেন কেন? তুমিই বা তাঁহাকে যাইতে দিলে কেন? তাঁহার পায়ে ধরিয়া মিনতি করিয়া নীলাচলে রাখিলে না কেন?

সার্বভৌম বলিলেন—মহাপুরুষদের কার্যের রহস্য বুঝা কঠিন। তিনি

যখন দক্ষিণ তীর্থ দর্শনের ইচ্ছা করিয়াছেন, আমার সাধ্য নাই, তাঁহাকে ধরিয়া রাখি। মহাপুরুষদের তীর্থ দর্শনও লোক পরিত্রাণের জন্য। যাহা হউক, শীঘ্রই তিনি ফিরিয়া আসিবেন, তখন তোমার বাসনা পূর্ণ হইবে।

রাজা কহিলেন—তুমি পরম পণ্ডিত; তুমি যখন তাঁহাকে সাক্ষাৎ নারায়ণ বলিয়া মান, তখন তোমার কথাই আমি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি। মহাপ্রভু পুরীতে ফিরিয়া আসিলে, আমাকে নিশ্চয়ই দর্শন করাইবে।

সার্বভৌম সম্মত হইলেন এবং প্রতাপরুদ্রের নিকটে প্রস্তাব করিলেন যে, মহাপ্রভু ও তাঁহার সঙ্গিগণের বাসের জন্য জগন্নাথ মন্দিরের নিকট একটি ভাল বাসাবাটী ঠিক করিয়া দিতে হইবে। প্রতাপরুদ্র তাঁহার গুরু কাশী-মিশ্রের বাড়ী নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন। কাশী মিশ্রও এই প্রস্তাবে সানন্দে সম্মত হইলেন। মহাপ্রভু দক্ষিণ দেশ হইতে ফিরিয়া আসিলে কাশীমিশ্রের বাড়ীতেই তাঁহার বাসের ব্যবস্থা হইল। তার পর হইতে যে অষ্টাদশ বৎসর মহাপ্রভু নীলাচলে ছিলেন, এই কাশীমিশ্রের বাড়ীতেই তিনি থাকিতেন। এই বাড়ী এখনও আছে, বর্তমানে ইহার নাম "রাধাকান্তমঠ"। মহাপ্রভুর কাষ্ঠ-পাদুকা, করঙ্গ, কন্থা প্রভৃতি স্মৃতিচিহ্ন এখনও "রাধাকান্তমঠে" রক্ষিত আছে। এই বাড়ী জগন্নাথ মন্দিরের অতি নিকটেই।

রাজা প্রতাপরুদ্র যেমন মহাপ্রভুর দর্শনের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন, তেমনি তাঁহার রাজ্যের আরও অনেক প্রধান প্রধান লোক মহাপ্রভুকে দেখিবার জন্য আশাপথ চাহিয়া ছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা সকলেই সার্বভৌমের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন, সার্বভৌমও তাঁহাদের অভিলাষ পূর্ণ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। মহাপ্রভু ফিরিয়া আসিলে সার্বভৌম তাঁহার প্রতিশ্রুতি পালন করিলেন। স্বয়ং কাশীমিশ্র, জনার্দন, কৃষ্ণদাস, শিখিমাহিতী, মুরারি মাহিতী, প্রদ্যুম্ন মিশ্র, বিষ্ণুদাস, প্রহররাজ মহাপাত্র, পরমানন্দ মহাপাত্র, রায় রামানন্দের পিতা ভবানন্দ ও তাঁহার পঞ্চ পুত্র, ইঁহারা একে একে মহা-প্রভুর চরণে শরণ লইলেন, মহাপ্রভুও তাঁহাদিগকে 'আপনার জন' বলিয়া গ্রহণ করিলেন। ইঁহারা সকলেই নীলাচলবাসী এবং পুরীরাজের উচ্চপদস্থ কর্মচারী বা জগন্নাথের সেবক।

এই সময়ে মহাপ্রভুর পরম ভক্ত, প্রেমধর্মের অন্যতম প্রচারক 'স্বরূপ দামোদর' নীলাচলে মহাপ্রভুর সঙ্গে আসিয়া মিলিত হইলেন। স্বরূপ দামোদরের বাড়ী নবদ্বীপে, তাঁহার পূর্ব নাম পুরুষোত্তম আচার্য। তরুণ বয়স হইতেই তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের বন্ধু ও অনুরাগী ভক্ত ছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ যখন কাটোয়ায় গিয়া কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন, তখন পুরুষোত্তম মনের ক্ষোভে নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া কাশীধামে চলিয়া গেলেন। সেখানে এক বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর নিকট তিনিও সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন।

সন্ন্যাস গ্রহণের পর তাঁর নাম হইল দামোদর। গুরু দামোদরকে আজ্ঞা দিলেন, তুমি সন্ন্যাসী হইয়াছ, এখন বেদান্ত পাঠ কর ও অন্য সকলকে পড়াও, ইহাই তোমার প্রধান কর্তব্য। কিন্তু দামোদর বাল্যকাল হইতেই পরম কৃষ্ণভক্ত,—নিশ্চিন্ত মনে কৃষ্ণভজনা করিবার জন্যই সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়াছিলেন। গুরুর এই আজ্ঞা শুনিয়া তাঁহার মনে প্রবল আঘাত লাগিল।

তিনি সন্ন্যাসীর যোগপট্ট বা গৈরিক বসন ত্যাগ করিয়া সাধারণ লোকের মত শ্বেত বস্ত্র ও উত্তরীয় ধারণ করিলেন, (এই জন্য তাঁহার নাম হইল 'স্বরূপ' বা স্বরূপ দামোদর) বেদান্ত পাঠ ত্যাগ করিলেন, তারপর নীলাচলে আসিয়া মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হইলেন। মহাপ্রভুও বাল্যবন্ধু কৃষ্ণভক্ত স্বরূপ দামোদরকে দেখিয়া পরম আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন সম্ভাষণ করিলেন। স্বরূপ দামোদর অনুতপ্তচিত্তে কহিলেন, তোমাকে ত্যাগ করিয়া কাশীতে গিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া আমি অপরাধ করিয়াছি, তুমি আমার অপরাধ ক্ষমা কর। এখন হইতে আর আমি তোমার চরণ ছাড়িব না।

মহাপ্রভু প্রসন্নচিত্তে তাঁহাকে নিজের নিকটে থাকিতে অনুমতি দিলেন। স্বরূপ দামোদর সেই হইতে আজীবন মহাপ্রভুর নিত্যসঙ্গী হইলেন। তাঁহার মত অন্তরঙ্গ ভক্ত মহাপ্রভুর আর ছিল কিনা সন্দেহ। তিনি একদিকে সর্ব-শাস্ত্রবিৎ পরম পণ্ডিত, অন্যদিকে পরম ভক্ত ও প্রেমিক,—সর্বদা ভগবৎপ্রেমে বিভোর হইয়া থাকিতেন, প্রায়ই নির্জনে বাস করিতেন, বাহিরের লোকের সঙ্গে মিশিতেন না। আবার অন্যদিকে সঙ্গীতশাস্ত্রেও তিনি অশেষ পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার গুণ বর্ণনা করিতে গিয়া চৈতন্যচরিতামৃতকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিয়াছেন :—

কৃষ্ণরসতত্ত্ববেত্তা দেহ প্রেমরূপ।
সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ॥

* * *

সঙ্গীতে গন্ধর্বসম শাস্ত্রে বৃহস্পতি।
দামোদর সম আর নাহি মহামতি॥

মহাপ্রভুকে শুনাইবার জন্য অনেকেই গ্রন্থ বা শ্লোক লিখিয়া আনিতেন। স্বরূপ দামোদর আগে তাহা পরীক্ষা করিতেন। পরীক্ষায় যদি তাহা ভক্তিশাস্ত্র-বিরোধী প্রমাণিত না হইত এবং স্বরূপ দামোদর মহাপ্রভুকে শুনাইবার যোগ্য বিবেচনা করিতেন, তবেই কেবল মহাপ্রভুকে শোনানো হইত। মহাপ্রভু বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলী এবং জয়দেবের গীতগোবিন্দ শুনিতে বড় ভালবাসিতেন। স্বরূপ দামোদর এই সকল গান করিয়া মহাপ্রভুকে

শুনাইতেন। মহাপ্রভুর মনে যখন যে ভাবের উদয় হইত, দামোদর বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবির পদাবলী হইতে ঠিক সেই ভাবের অনুরূপ গান করিতেন। তিনি নিজে অনেক সুর সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং বৈষ্ণব পদাবলীর নূতন নূতন সুর দিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর সময় হইতে বাঙ্গালাদেশে যে সুমধুর কীর্তন সঙ্গীত প্রচলিত হয় এবং যাহা এখনও প্রচলিত আছে, তাহার প্রধান প্রবর্তক স্বরূপ দামোদর। বস্তুতঃ মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের জীবনের সঙ্গে স্বরূপ দামোদরের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। তাঁহার পরামর্শ ব্যতীত বা তাঁহার বিনা সম্মতিতে মহাপ্রভু কোন কার্যই করিতেন না; মহাপ্রভুর মনের ভাব বুঝিতে তাঁহার মত আর কেহ ছিল না।

এই সময় আরও দুইজন সন্ন্যাসী মহাপ্রভুর সঙ্গে আসিয়া মিলিত হইলেন। একজন পরমানন্দপুরী, মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য ও মহাপ্রভুর মন্ত্রগুরু ঈশ্বর-পুরীর গুরুভাই,—অন্যজন ব্রহ্মানন্দ ভারতী—মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগুরু কেশব-ভারতীর গুরুভাই। দুইজনকেই মহাপ্রভু সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন এবং সেই হইতে তাঁহারাও মহাপ্রভুর নিকটে রহিয়া গেলেন।

এদিকে রাজা প্রতাপরুদ্র মহাপ্রভুকে দর্শন করিবার জন্য ক্রমেই অধীর হইয়া উঠিতে লাগিলেন। তিনি সার্বভৌমকে অশেষ রকমে মিনতি করিয়া তাঁহার প্রার্থনা মহাপ্রভুকে নিবেদন করিতে বলিলেন। সার্বভৌম একদিন মহাপ্রভুর নিকটে গিয়া ভয়ে ভয়ে কহিলেন—প্রভু, যদি অভয় দাও, একটি কথা নিবেদন করি।

মহাপ্রভু কহিলেন—যাহা বলিবার আছে স্বচ্ছন্দে বল, কিন্তু, যদি রাখিবার যোগ্য হয়, তবেই কেবল তোমার কথা রাখিব, অন্যথা নহে।

সার্বভৌম ধীরে ধীরে রাজা প্রতাপরুদ্রের প্রার্থনা নিবেদন করিয়া বলিলেন—রাজা তোমার দর্শনের জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত।

মহাপ্রভু কর্ণে হাত দিয়া নারায়ণ স্মরণ করিলেন। বলিলেন—ভট্টাচার্য, এরূপ অযোগ্য কথা বলা তোমার উচিত নয়। আমি বিরক্ত সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসীর পক্ষে রাজদর্শন ও স্ত্রীদর্শন উভয়ই বিষতুল্য।

সার্বভৌম তথাপি কহিলেন—প্রভু, তোমার কথা সত্য। কিন্তু প্রতাপরুদ্র রাজা হইলেও শ্রীজগন্নাথের সেবক, উত্তম ভক্ত, তাঁহাকে দর্শন দেওয়াতে দোষ নাই।

মহাপ্রভু কহিলেন,—প্রতাপরুদ্র ভক্ত হইতে পারেন, কিন্তু তবুও তিনি রাজা। তাঁহাকে আমি দর্শন দিতে পারিব না, তুমি যদি পুনরায় এইরূপ প্রস্তাব কর, তবে আমাকে আর নীলাচলে দেখিতে পাইবে না।

সার্বভৌম ভীত হইয়া আর কোন কথা না বলিয়া ফিরিয়া গেলেন।

প্রতাপরুদ্রের রাজধানী ছিল কটকে। কিন্তু জগন্নাথের সেবক হিসাবে

তিনি পুরীতে প্রায়ই আসিতেন এবং অনেক সময় পুরীতেই থাকিতেন। রায় রামানন্দ বিদ্যানগরের অধিকারীর পদত্যাগ করিয়া মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য পুরীতে আসিলেন। সেই সময়ে প্রতাপরুদ্রও কটক হইতে পুরীতে আসিলেন। প্রতাপরুদ্র রায় রামানন্দের সঙ্গে মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গভাব জানিতে পারিয়া একদিন রায়কে কহিলেন—মহাপ্রভু তোমার উপর বিশেষ প্রসন্ন, তুমি যদি মহাপ্রভুকে সম্মত করিয়া আমাকে তাঁহার দর্শন দিতে পার, আমি ধন্য হইব। আর তুমি বিদ্যানগরের অধিকারীর পদ ত্যাগ করিয়াছ বটে, কিন্তু ঐ পদে থাকিবার সময় যে বেতন পাইতে, অবসর গ্রহণ করিয়া নীলাচলে থাকিয়াও তাহাই পাইবে। তুমি মনের আনন্দে মহাপ্রভুর সঙ্গে কৃষ্ণকথায় কাল যাপন কর।

রায় রামানন্দ রাজা প্রতাপরুদ্রের আগ্রহ দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন এবং মহাপ্রভুর নিকটে গিয়া কহিলেন,—রাজা প্রতাপরুদ্রের যে মহাপ্রেম দেখিলাম, তাহা কদাচিৎ দেখা যায়। তোমার উপর তাঁহার গভীর ভক্তি, তোমাকে দেখিবার জন্য তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল। আমার প্রতিও তাঁহার অত্যন্ত অনুগ্রহ।

মহাপ্রভু ধীরে ধীরে শুধু বলিলেন,—তুমি একজন শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণভক্ত, তোমাকে তিনি স্নেহ করেন, তিনি মহাভাগ্যবান্। এই ভাগ্যের বলে তিনি একদিন শ্রীকৃষ্ণের কৃপা নিশ্চয়ই লাভ করিবেন।

রায় রামানন্দ আর বেশী কিছু বলিতে সাহস করিলেন না।

এদিকে রাজা প্রতাপরুদ্র সার্বভৌমকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাপ্রভুর চরণে আমার কথা নিবেদন করিয়াছিলে কি না? সার্বভৌম বলিলেন—করিয়াছিলাম। কিন্তু প্রভু শুনিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন, কহিলেন, আমি কিছুতেই রাজদর্শন করিব না, যদি তোমরা পুনঃ পুনঃ উপরোধ কর, আমি নীলাচল ছাড়িয়া যাইব।

প্রতাপরুদ্র এই কথা শুনিয়া বিষণ্ণচিত্তে বলিলেন—শুনিয়াছি, মহাপ্রভু অতি পাপী জগাই মাধাইকেও উদ্ধার করিয়াছেন। আমি রাজা বলিয়া কি জগাই মাধাই অপেক্ষাও পতিত? মহাপ্রভু বোধ হয় প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, রাজা প্রতাপরুদ্রকে তিনি কিছুতেই উদ্ধার করিবেন না; কিন্তু আমারও প্রতিজ্ঞা, তাঁহার দর্শন না পাইলে এ জীবন ত্যাগ করিব। যদি মহাপ্রভুর কৃপালাভ না করিতে পারি, তবে আমার এই রাজ্য ঐশ্বর্যে প্রয়োজন কি?

রাজা প্রতাপরুদ্রের এই প্রবল আগ্রহ ও দৃঢ়সঙ্কল্প দেখিয়া সার্বভৌম চিন্তিত হইলেন। একটু ভাবিয়া কহিলেন—"মহারাজ, তুমি বিষণ্ণ হইও না, মহাপ্রভুর উপর তোমার যখন এত প্রেম, তখন নিশ্চয়ই তিনি তোমার প্রতি কৃপা করিবেন। আমি আজ রায় রামানন্দের মুখে শুনিয়াছি, রায় রামানন্দ মহাপ্রভুকে তোমার ভক্তি ও প্রেমের কথা বলাতে তোমার উপর মহাপ্রভুর মন

প্রসন্ন হইয়াছে। এখন আমার পরামর্শ শুন। রথযাত্রার সময়ে মহাপ্রভু জগন্নাথের রথের অগ্রে প্রেমাবিষ্ট হইয়া কীর্তন করেন, তারপর গুণ্ডিচায় রথ রাখিলে তিনি প্রেমের আবেশে পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করেন। তুমিও সেই সময়ে রাজবেশ ত্যাগ করিয়া পুষ্প-উদ্যানে প্রবেশ করিবে এবং প্রেমে বাহ্যজ্ঞানশূন্য মহাপ্রভুর চরণ ধরিয়া ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায়ের শ্লোক কীর্তন করিতে থাকিবে। তোমার মুখে কৃষ্ণনাম শুনিয়া এবং ভক্ত বৈষ্ণব জানিয়া মহাপ্রভু নিশ্চয়ই তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া কৃপা করিবেন।

রাজা প্রতাপরুদ্র সার্বভৌমের এই পরামর্শ শুনিয়া আনন্দিত হইলেন। কহিলেন, তোমার প্রস্তাবই যুক্তিসঙ্গত, আমি ঐরূপই করিব। শ্রীজগন্নাথের রথযাত্রারও আর বেশী বিলম্ব নাই।

এমন সময়ে গোপীনাথাচার্য আসিয়া সার্বভৌমকে সংবাদ দিলেন—ভট্টাচার্য, নবদ্বীপ হইতে মহাপ্রভুর প্রায় দুইশত ভক্ত নীলাচলে আসিয়াছেন। তাঁহাদের থাকিবার স্থান ও সেবাদির ব্যবস্থা করিতে হইবে।

রাজা প্রতাপরুদ্র শুনিয়া সাগ্রহে বলিলেন—আমি 'পড়িছাকে' এখনই আদেশ দিতেছি। নদীয়া হইতে আগত মহাপ্রভুর ভক্তদের থাকিবার স্থান ও প্রসাদাদির সমস্ত ব্যবস্থাই তাহারা করিবে।

তারপর রাজা সার্বভৌমকে বলিলেন,—মহাপ্রভুর যেসব ভক্ত নদীয়া হইতে আসিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমার দেখিতে অভিলাষ হয়।

সার্বভৌম বলিলেন, তাঁহারা এখনই জগন্নাথ-মন্দিরের দিকে আসিবেন, সুতরাং তুমি অট্টালিকার উপরে উঠিলেই তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইবে। গোপীনাথাচার্য সকলকেই চিনেন, তিনিই তাঁহাদের পরিচয় দিবেন।

রাজা সার্বভৌম ও গোপীনাথাচার্যকে সঙ্গে করিয়া গৃহচূড়ায় উঠিলেন। এমন সময় নদীয়ার ভক্তগণ জগন্নাথ মন্দিরের দিকে কীর্তন করিতে করিতে আসিলেন। গোপীনাথাচার্য একে একে তাঁহাদের সকলের পরিচয় দিলেন এবং মহিমা কীর্তন করিলেন। অদ্বৈতাচার্য, শ্রীরাম, হরিদাস ঠাকুর, বক্রেশ্বর, বিদ্যানিধি আচার্য, গদাধর, আচার্যরত্ন, আচার্য পুরন্দর, গঙ্গাদাস পণ্ডিত, শঙ্কর পণ্ডিত, মুরারি গুপ্ত, হরিভট্ট, নৃসিংহানন্দ, বাসুদেব দত্ত, শিবানন্দ, গোবিন্দ, মাধব, বাসুদেব ঘোষ, রাঘব পণ্ডিত, শ্রীমান পণ্ডিত, শ্রীকান্ত, নারায়ণ, শুক্লাম্বর, শ্রীধর, বিজয়, বল্লভসেন, পুরুষোত্তম সঞ্জয়, সত্যরাজ খাঁ, আশানন্দ, মুকুন্দদাস, নরহরি, রঘুনন্দন, চিরঞ্জীব, সুলোচন প্রভৃতি ভক্তগণের পরিচয় পাইয়া রাজা প্রতাপরুদ্র আনন্দিত হইলেন। বলিলেন,—এমন তেজঃসম্পন্ন বৈষ্ণবগণকে আমি আর কখন দেখি নাই, এমন মধুর কীর্তনও কখন শুনি নাই।

স্বরূপ দামোদর ও গোবিন্দ (মহাপ্রভুর সেবক) এই দুইজন আসিয়া

নদীয়ার ভক্তগণকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া গেলেন। রাজাও অট্টালিকা হইতে নামিয়া কাশীমিশ্র ও জগন্নাথের প্রধান সেবককে (পড়িছা পাত্র) ডাকাইয়া আদেশ দিলেন,—মহাপ্রভুর যে সব ভক্ত নদীয়া হইতে আসিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের উত্তম বাসস্থানের ব্যবস্থা কর, আর তাঁহাদের সেবা প্রভৃতির যেন কোনরূপ ত্রুটি না হয়।

এদিকে মহাপ্রভু একে একে সমগ্র ভক্তগণের সঙ্গে মিলিত হইয়া তাঁহাদের যথোচিত আদর আপ্যায়ন করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে হরিদাস ঠাকুরকে দেখিতে না পাইয়া মহাপ্রভু হরিদাসকে ডাকিতে লাগিলেন। হরিদাস ঠাকুর পরম বিনয়ী, নিজেকে পতিত অস্পৃশ্য বলিয়া জ্ঞান করেন। তিনি সকলের সঙ্গে না আসিয়া দূরে রাজপথের প্রান্তে দাঁড়াইয়া ছিলেন। অন্যান্য ভক্তগণ হরিদাস ঠাকুরকে লইতে আসিলে তিনি বলিলেন,—আমি নীচজাতি, পতিত, মন্দিরের নিকটে যাইতে আমার অধিকার নাই; বাহিরে কোন নিভৃত বাগানের মধ্যে যদি একটু স্থান পাই, তবে সেই স্থানে রহিব।

মহাপ্রভু হরিদাসের এই উক্তি শুনিয়া তাঁহার বিনয়ে মনে মনে সন্তুষ্ট হইলেন। কাশীমিশ্রকে কহিলেন,—মিশ্র, নিকটে এই পুষ্পোদ্যানের মধ্যে একখানি ঘর আছে। ঐ ঘরখানি আমাকে ভিক্ষা দাও, আমি নির্জনে বসিয়া ধ্যান করিব।

কাশীমিশ্র শশব্যস্তে বলিলেন,—প্রভু, এ সবই তোমার, তোমার যাহা ইচ্ছা লইতে পার, আমাকে জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন কি?

অতঃপর, অন্যান্য ভক্তগণকে বিদায় দিয়া মহাপ্রভু স্বয়ং হরিদাস ঠাকুরের নিকটে চলিলেন। হরিদাস রাজপথের পার্শ্বে বসিয়া নাম সঙ্কীর্তন করিতেছিলেন। মহাপ্রভুকে দেখিয়া দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিলেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলে, হরিদাস সঙ্কুচিতভাবে কহিলেন—প্রভু, আমি পতিত অস্পৃশ্য, আমাকে তুমি স্পর্শ করিও না।

মহাপ্রভু কহিলেন,—কে বলে তুমি অস্পৃশ্য? আমি নিজে পবিত্র হইবার জন্যই তোমাকে স্পর্শ করিতেছি, তুমি অহোরাত্র যে হরিনাম জপ কর, তাহার ফলে—

ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্বতীর্থে স্নান।
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞ তপ দান॥
নিরন্তর কর কত চারি অধ্যয়ন।
দ্বিজ-ন্যাসী হইতে তুমি পরম পাবন॥

যিনি 'যবন হরিদাস' বলিয়া পরিচিত, উচ্চজাতীয় হিন্দুরা যাঁহাকে 'পতিত অস্পৃশ্য নীচ জাতি' বলিয়া জ্ঞান করিতেন, মহাপ্রভু তাঁহাকে এইরূপে সম্মান করিলেন, কেননা তিনি পরম ভক্ত, অহোরাত্র হরিনাম জপ করিতেন।

হরিনামে তাঁহার এমনই দৃঢ় নিষ্ঠা যে, মুসলমান সুবাদার 'বাইশ বাজারে' কোড়া মারিয়াও তাঁহাকে হরিনাম ত্যাগ করাইতে পারেন নাই, একথা পূর্বেই বলিয়াছি।

মহাপ্রভু হরিদাসকে সঙ্গে লইয়া পুষ্পোদ্যানের মধ্যে সেই নির্জন ঘরে তাঁহার থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। হরিদাসের জন্যই তিনি কাশীমিশ্রের নিকট এই ঘরখানি ভিক্ষা চাহিয়াছিলেন।

এদিকে মহাপ্রভুকে দর্শন করিবার জন্য রাজা প্রতাপরুদ্র অত্যন্ত অধীর হইয়া উঠিলেন। সার্বভৌমকে পত্র লিখিয়া তিনি জানাইলেন,—মহাপ্রভু যদি আমাকে দর্শন না দেন, তবে এবার সত্যই আমি প্রাণত্যাগ করিব। পূর্ব পরামর্শ অনুসারে রথযাত্রা পর্যন্ত আমি আর অপেক্ষা করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। সার্বভৌম এই পত্র পাইয়া চিন্তিত হইলেন এবং মহাপ্রভুর পার্শ্বচর সমস্ত ভক্তকে তাহা লইয়া দেখাইলেন। মহাপ্রভুর উপরে রাজা প্রতাপরুদ্রের এই অসীম ভক্তি দেখিয়া ভক্তগণ বিস্মিত হইলেন। সকলেই বলিলেন যে, মহাপ্রভু কখনই রাজাকে দর্শন দিতে স্বীকৃত হইবেন না, আমাদের অনুরোধে মনে কেবল দুঃখ পাইবেন। সার্বভৌম কহিলেন,—এস, প্রভুকে রাজার মনের অবস্থা জানাইয়া দিই, মিলনের জন্য অনুরোধ করিব না, কেবল রাজার ভক্তি, প্রেম ও আগ্রহের কথা বলিব।

নিত্যানন্দকে পুরোভাগে করিয়া সকলে মহাপ্রভুর নিকটে চলিলেন। নিত্যানন্দ মহাপ্রভুকে বলিলেন—তোমাকে একটি কথা নিবেদন করিতে আসিয়াছি, কিন্তু বলিতেও সাহস করিতেছি না।

মহাপ্রভু কহিলেন,—তোমাদের ভাব দেখিয়াই আমি তাহা বুঝিতে পারিয়াছি, কিন্তু কি সে কথা, যাহা বলিতে তোমরা এত সংকুচিত হইতেছ?

নিত্যানন্দ বলিলেন,—রাজা প্রতাপরুদ্র তোমার সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য অধীর;—তোমার সঙ্গে মিলন না হইলে, তিনি সিংহাসন ত্যাগ করিয়া যোগী হইবেন।

মহাপ্রভু প্রতাপরুদ্রের এই ভক্তির কথা শুনিয়া মনে মনে সন্তুষ্ট হইলেও, কহিলেন—আমি সন্ন্যাসী, রাজদর্শন করিলে লোকে আমাকে নিন্দা করিবে, এমন কি এই দামোদর পণ্ডিত আমাকে ভর্ৎসনা করিবেন। দামোদর যদি বলেন, তবে আমি রাজাকে দর্শন করিতে পারি।

দামোদর পণ্ডিত কহিলেন,—আমি ক্ষুদ্রব্যক্তি, তোমার কর্তব্য নির্ধারণ করিব, এমন শক্তি আমার নাই। তবে তুমি প্রেমের বশ, ভক্তের প্রতি তোমার অপার স্নেহ, আর প্রতাপরুদ্র রাজা হইলেও পরম ভক্ত। অতএব আজ না হইলেও, একদিন না একদিন তোমার সঙ্গে তাঁহার মিলন হইবে, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই।

নিত্যানন্দ কহিলেন,—তুমি রাজার সঙ্গে মিলিত হও, এমন বলিতেছি না। কিন্তু আর কি কোন উপায় করা যায় না, যাহাতে রাজার মন শান্ত হয়, তোমারও সন্ন্যাসধর্ম রক্ষা হয়? আমি বলি, তুমি তোমার একখানি 'বহির্বাস' * প্রসাদস্বরূপ রাজাকে পাঠাইয়া দাও, রাজা তাহা পাইয়াই সন্তুষ্ট হইবেন।

মহাপ্রভু এ প্রস্তাবে অগত্যা সম্মত হইলেন। তাঁহার একখানি 'বহির্বাস' রাজা প্রতাপরুদ্রের নিকট প্রেরিত হইল। প্রতাপরুদ্র সেই বহির্বাস পরম শ্রদ্ধা সহকারে গ্রহণ করিলেন এবং মহাপ্রভুর স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ তাহা পূজা করিতে লাগিলেন।

কিন্তু ইহাতে তাঁহার মহাপ্রভু দর্শনের তৃষ্ণা শান্ত হইল না, বরং আরও বৃদ্ধি পাইল। তিনি রায় রামানন্দকে ডাকিয়া পুনরায় অনুরোধ করিলেন যে, মহাপ্রভুর নিকট তাঁহার জন্য বিশেষরূপে অনুরোধ করিতে হইবে। রায় রামানন্দ রাজার অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া, মহাপ্রভুর নিকটে গিয়া ভয়ে ভয়ে তাঁহার প্রার্থনা নিবেদন করিলেন।

মহাপ্রভু কহিলেন,—রায় রামানন্দ, সন্ন্যাসীর পক্ষে রাজদর্শন অপরাধ, একথা বহুবার বলিয়াছি। আমি যদি সন্ন্যাসধর্ম পালন না করি, লোকে আমার নামে নানা অপবাদ দিবে। এক কলসী দুগ্ধের মধ্যে এক বিন্দু গোমূত্র দিলে যেমন তাহা নষ্ট হয়, সন্ন্যাসীর অল্প ছিদ্র পাইলেও লোকের তেমনি তাহার উপর বিতৃষ্ণা হয়। তথাপি তোমার যদি এত আগ্রহ হয়, তবে রাজার পুত্রকে লইয়া আসিও, রাজার পরিবর্তে তাঁহারই সঙ্গে আমি মিলিত হইব। আর এক হিসাবে পিতা ও পুত্রে কোন প্রভেদও নাই।

রায় রামানন্দ রাজাকে যাইয়া এই কথা বলিলে রাজা মহা আনন্দিত হইয়া পুত্রকে মহাপ্রভুর নিকটে পাঠাইয়া দিলেন।

রাজপুত্রের কিশোর বয়স, দেখিতেও তিনি বড় সুন্দর ছিলেন :—

সুন্দর রাজার পুত্র শ্যামল বরণ।
কৈশোর বয়স দীর্ঘ-চপল নয়ন॥
পীতাম্বর ধরে অঙ্গে রত্ন আভরণ।
কৃষ্ণ স্মরণের তেঁহো হৈলা উদ্দীপন॥

শ্যামবর্ণ কিশোরবয়স্ক রাজপুত্রকে দেখিয়া মহাপ্রভুর মনে শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতি উদয় হইল, তিনি প্রেমভরে তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন :—

এই মহা ভাগবত যাহার দর্শনে।
ব্রজেন্দ্র নন্দন স্মৃতি † হয় সর্বজনে॥
কৃতার্থ হৈলাম আমি ইহার দর্শনে।
এত বলি পুনঃ তারে কৈল আলিঙ্গনে॥

---

* সন্ন্যাসীদিগের ব্যবহৃত কৌপীনের উপরে পরিধেয় বস্ত্র।
† কৃষ্ণস্মৃতি।

মহাপ্রভুর আলিঙ্গন ও স্পর্শে রাজপুত্রের দেহে প্রেমাবেশ হইল,—স্বেদ, কম্প, অশ্রু পুলক প্রভৃতি সাত্ত্বিকভাব তাঁহার মধ্যে আবির্ভূত হইল, "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া তিনি নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই সৌভাগ্য দেখিয়া ভক্তগণ চমৎকৃত হইলেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে ধরিয়া গৃহে পাঠাইয়া দিলেন এবং বলিলেন, প্রত্যহ আমার নিকটে আসিও।

রাজপুত্র গৃহে ফিরিয়া গেলেন। পুত্রের এই প্রেমাবিষ্ট ভাব দেখিয়া, তাঁহার মুখে কৃষ্ণ নাম শুনিয়া রাজা প্রতাপরুদ্র ধন্য হইলেন, পুত্রকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার মনে হইল যেন মহাপ্রভুর স্পর্শলাভই করিয়াছেন।

ক্রমে রথযাত্রার দিন সমাগত হইল। মহাপ্রভু সমস্ত ভক্তগণকে সঙ্গে করিয়া নিজে গুণ্ডিচা মন্দির ধৌত ও মার্জনা করিলেন। তাহার পর রথের দিন জগন্নাথ দেব বিজয় যাত্রা করিলে, রথের অগ্রে অগ্রে ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়া মহাপ্রভু কীর্তন ও নৃত্য করিয়া চলিলেন। সেই কীর্তন ও নৃত্য এক অপরূপ ব্যাপার,—মহাপ্রভুর প্রেম, ভক্তি ও ভগবদ্ভাবে তন্ময়তা দেখিয়া রথযাত্রায় সমবেত লক্ষ লক্ষ লোক ভক্তিতে বিগলিত হইল, তাহারা মহা আনন্দে হরিধ্বনি করিতে লাগিল।

রথ আসিয়া গুণ্ডিচা মন্দিরের নিকট থামিল। মহাপ্রভু কীর্তনের দল ত্যাগ করিয়া একাকী নিকটবর্তী পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করিলেন। রাজা প্রতাপরুদ্র বরাবর কীর্তনের দলের পশ্চাতে ছিলেন এবং দূর হইতে মহাপ্রভুকে দর্শন করিতেছিলেন। সার্বভৌমের ইঙ্গিত পাইয়া তিনি মহাপ্রভুর পশ্চাতে পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করিলেন। মহাপ্রভু তখন পুষ্পোদ্যানের মধ্যে গৃহের বারান্দায় প্রেমাবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন। প্রতাপরুদ্র রাজবেশ ছাড়িয়া দীন বৈষ্ণবের বেশে মহাপ্রভুর সন্নিকটে আসিলেন এবং তাঁহার পদদ্বয় ধরিয়া সেবা করিতে লাগিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের রাস-পঞ্চাধ্যায়ের শ্লোক মুখে কীর্তন করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু সেই শ্লোক শুনিয়া পরম হৃষ্টচিত্তে উঠিয়া রাজা প্রতাপরুদ্রকে আলিঙ্গন করিলেন, কহিলেন—কে তুমি, আমাকে এমন কৃষ্ণলীলামৃত পান করাইতেছ?

রাজা কহিলেন—আমি তোমার সেবক, আমাকে তুমি কৃপা কর।

মহাপ্রভু প্রীত হইয়া রাজা প্রতাপরুদ্রকে আশীর্বাদ করিলেন এবং তাঁহাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিলেন। এইরূপে রাজা প্রতাপরুদ্রের বহু দিনব্যাপী সাধনা সিদ্ধ হইল, প্রেম ও ভক্তির বলে তিনি পতিতপাবন মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করিলেন। সেই হইতে রাজা প্রতাপরুদ্র মহাপ্রভুর একজন অন্তরঙ্গ ভক্ত হইলেন এবং তাঁহার প্রেমধর্ম প্রচারে সর্বপ্রকারে সহায়তা করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের এক নাম হইল—"প্রতাপরুদ্র-সংত্রাতা"।

১৪

নিত্যানন্দের প্রেমধর্ম প্রচার

নদীয়ার ভক্তগণ এইরূপে প্রায় চার মাস নীলাচলে মহাপ্রভুর সঙ্গে আনন্দে কালযাপন করিলেন। চারি মাস পরে মহাপ্রভু গৌড়ভক্তগণকে বিদায় দিলেন। ভক্তগণের মন বিষাদে পূর্ণ হইল, মহাপ্রভুকে ছাড়িয়া নীলাচল হইতে যাইতে তাঁহাদের পা যেন আর উঠিতেছে না। মহাপ্রভু তাঁহাদের মনোভাব বুঝিয়া সস্নেহে কহিলেন,—তোমরা প্রতি বৎসর রথযাত্রার সময়ে নীলাচলে আসিবে, তাহা হইলেই আমার সঙ্গে মিলন হইবে। বৃদ্ধ অদ্বৈতাচার্য বিচ্ছেদের ভয়ে বিশেষরূপে কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে আদেশ দিলেন,—তিনি যেন বঙ্গদেশে গিয়া আচণ্ডাল সকলের মধ্যে কৃষ্ণনাম প্রচার করেন।

মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন দেখিয়া তাঁহার বহু ভক্ত সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছিলেন। অনেকের মনে এইরূপ ধারণাই জন্মিয়াছিল যে, সন্ন্যাস না হইলে ভগবদ্‌ভক্তি লাভ করা যায় না। মহাপ্রভু এই ব্যাপার দেখিয়া চিন্তিত হইলেন, মনে মনে ভাবিলেন, সকলেই যদি এইরূপে সন্ন্যাস গ্রহণ করে, তবে সংসার লোপ পাইবে, এরূপ যথেচ্ছ সন্ন্যাসের আদর্শকে প্রশ্রয় দেওয়াও উচিত নয়। গৃহে থাকিয়াও যে শ্রেষ্ঠ ভক্ত হওয়া যায়, তাহার আদর্শ লোকের সম্মুখে স্থাপন করিতে হইবে।

এইরূপ ভাবিয়া একদিন মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে নিভৃতে ডাকিয়া বলিলেন—শ্রীপাদ, তোমাকে নীলাচল ত্যাগ করিয়া গৌড়দেশে গিয়া হরিনাম প্রচার করিতে হইবে। সকলেই যদি সন্ন্যাসী হইয়া নীলাচলে বাস করে, তবে সংসারের পাপীতাপী দীন দরিদ্রদিগকে উদ্ধার করিবে কে? আর সংসারে থাকিয়াও যে কৃষ্ণপ্রেম লাভ করা যায়, ইহার আদর্শ দেখাইবার জন্যও তোমাকে গৌড়দেশে গিয়া গৃহী হইতে হইবে এবং জাতিবর্ণনির্বিশেষে সকলের মধ্যে হরিনাম বিতরণ করিতে হইবে।

নিত্যানন্দ প্রভু এই আদেশ শুনিয়া কিছুকাল নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, তার পর কহিলেন, প্রভু, আমি বাল্যকাল হইতে সংসারত্যাগী অবধূত সন্ন্যাসী; এবয়সে সন্ন্যাস ত্যাগ করিয়া পুনর্বার গৃহী হওয়া আমার পক্ষে অসাধ্য।

মহাপ্রভু হাসিয়া বলিলেন,—তুমি যদি পাপীতাপীদের উদ্ধারের ভার গ্রহণ না কর, তবে আর কে করিবে? তুমি শক্তিধর মহাপুরুষ, সন্ন্যাস ও সংসার দুই-ই তোমার পক্ষে সমান। জগতের লোককে তুমি শিক্ষা দাও, গৃহে থাকিয়াও কিরূপে ভগবদ্‌ভক্তি লাভ করা যায়।

মহাপ্রভুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিবার সাধ্য নিত্যানন্দের ছিল না। অগত্যা আবাল্য সন্ন্যাসী নিত্যানন্দকে নীলাচল ত্যাগ করিয়া প্রেমধর্ম প্রচারের জন্য গৌড়দেশে যাইতে হইল। সঙ্গে চলিলেন তাঁহার কয়েকজন প্রিয় শিষ্য ও অনুচর। রামদাস, গদাধর দাস, রঘুনাথ বৈদ্য, কৃষ্ণদাস পণ্ডিত, পরমেশ্বর দাস, পুরন্দর পণ্ডিত—ইঁহারা সকলেই নিত্যানন্দ প্রভুর মতই ভগবৎপ্রেমে বিভোর ছিলেন।

নিত্যানন্দ নীলাচল হইতে রাঢ়দেশে আসিয়া প্রথমেই গঙ্গাতীরে পাণিহাটী গ্রামে উঠিলেন। এই গ্রামের রাঘব পণ্ডিত মহাপ্রভুর পরম ভক্ত ছিলেন। নিত্যানন্দ প্রভু সঙ্গিগণ সহ তাঁহার গৃহেই আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। প্রতিদিন কীর্তনোৎসব চলিতে লাগিল, নিত্যানন্দের অপূর্ব প্রেমের শক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া প্রত্যহ দলে দলে লোক পাণিহাটীতে আসিতে লাগিল। পাণিহাটী শীঘ্রই একটা তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইল। পাণিহাটী গ্রামে কিছুদিন থাকিয়া নিত্যানন্দ অদূরবর্তী খড়দহ গ্রামে আসিয়া বাস করিলেন। এই খড়দহই নিত্যানন্দ প্রভুর প্রেমধর্ম প্রচারের প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠিল। নিত্যানন্দ তাঁহার দলবল লইয়া গঙ্গার উভয় কূলে হরিনাম প্রচার করিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার নিকট উচ্চনীচ-ভেদাভেদ ছিল না,—ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, পাপী তাপী, দরিদ্র মূর্খ নীচ পতিত সকলকেই তিনি সমানভাবে কৃষ্ণপ্রেম বিতরণ করিতেন। কত হীন, অন্ত্যজ পতিত যে নিত্যানন্দের কৃপায় ভগবদ্‌ভক্তি লাভ করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। পূর্বে খড়দহের নিকটে গঙ্গাকূলে বৌদ্ধদের একটা প্রধান কেন্দ্র ছিল। নিত্যানন্দ প্রভুর সময়েও বহু বৌদ্ধভিক্ষু ও ভিক্ষুণী এই অঞ্চলে বাস করিত। সাধারণে ইহাদিগকে "নেড়ানেড়ী" বলিত, নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায় এই সব "নেড়ানেড়ীরা" সকলেই বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করে। বর্তমান কালেও এই নামের স্মৃতি লোপ পায় নাই,—বৈষ্ণব ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ আজও অনেক স্থলে "নেড়ানেড়ী" নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

খড়দহ হইতে নিত্যানন্দ নবদ্বীপে শচীমাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলেন এবং সেখানে কয়েকদিন থাকিয়া নবদ্বীপ ও তাহার নিকটবর্তী গ্রাম সমূহে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করিলেন। নবদ্বীপ হইতে নিত্যানন্দ সপ্তগ্রাম বন্দরে যাত্রা করিলেন। সপ্তগ্রাম বন্দর তখনও বাঙ্গালার অন্যতম প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র; ঐশ্বর্যগৌরবে সপ্তগ্রামের তুলনা ছিল না। বহু ধনশালী বণিকের এখানে বাস ছিল। পূর্বকালে ইহাদের মধ্যে অনেকে বৌদ্ধ ছিল, সেই জন্য তখন পর্যন্ত সমাজে ইহারা পতিত বলিয়া গণ্য হইত। নিত্যানন্দ প্রভু আসিয়া এই পতিত অপবাদপ্রাপ্ত বণিকদের গৃহেই আতিথ্য গ্রহণ করিলেন এবং সেখান হইতেই সপ্তগ্রাম ও তাহার আশেপাশে সমস্ত গ্রামে প্রচারকার্য চালাইতে লাগিলেন। নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপাতেই, 'পতিত' বণিকেরা পরম বৈষ্ণব হইয়া সমাজে সম্মান

লাভ করিল, তাহাদের পাতিত্য অপবাদ তিরোহিত হইল।

সপ্তগ্রামের উদ্ধারণ দত্তের গৃহেই নিত্যানন্দ প্রভু অধিকাংশ সময় থাকিতেন। উদ্ধারণ দত্ত নিত্যানন্দ প্রভুর উপদেশে ভক্তিমান বৈষ্ণব হইয়াছিলেন। নিত্যানন্দ প্রভুর জাতিবিচার ছিল না, তিনি স্বচ্ছন্দে উদ্ধারণ দত্ত ও তাঁহার পরিবারবর্গের হাতে খাইতেন। উদ্ধারণ দত্তের দৃষ্টান্তে সহস্র সহস্র সুবর্ণ-বণিক নিত্যানন্দ প্রভুর শিষ্য হইয়া বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কিছুকাল সপ্তগ্রামে থাকিবার পর, নিত্যানন্দ আবার খড়দহে ফিরিয়া আসিলেন। সেই হইতে খড়দহই তাঁহার প্রধান বাসভূমি হইল। খড়দহে সন্ন্যাস ত্যাগ করিয়া তিনি গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করিয়া বিবাহ করিলেন। তাঁহার দুই পত্নীর নাম বসুধা ও জাহ্নবা। ইঁহারাও পরম বৈষ্ণবী ও নিত্যানন্দ প্রভুর অনুরাগিণী, বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে ইঁহারা নিত্যানন্দ প্রভুকে অনেক সহায়তা করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ জাহ্নবা ঠাকুরাণী, নিত্যানন্দ প্রভুর তিরোভাবের পর, তাঁহার স্থান গ্রহণ করিয়া বহু বৎসর যাবৎ প্রচার কার্য চালাইয়াছিলেন।

নিত্যানন্দ প্রভু গৃহী হইয়া অঙ্গে নানা অলঙ্কার ধারণ করিয়াছিলেন। কর্ণে কুন্ডল, বাহুতে বলয়, গলায় হার, পরিধানে কৌষেয় বসন প্রভৃতিতে তাঁহাকে বড় মনোহর দেখাইত। এই ভাবে সুসজ্জিত হইয়া তিনি গঙ্গাতীরের গ্রামসমূহে হরিনাম প্রচার করিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার প্রচারের প্রণালী বড় মধুর ছিল :—

অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়।
অভিমানশূন্য নিতাই নগরে বেড়ায়॥
যে না লয়, তারে কহে দন্তে তৃণ ধরি।
আমারে কিনিয়া লহ, বল গৌরহরি॥

তাঁহার এই দৈন্য, বিনয় ও মধুর স্বভাবে সকলেই বশীভূত হইত, বহু দুর্বৃত্ত দস্যুকেও তিনি পাপপথ হইতে উদ্ধার করিয়া সাধু বৈষ্ণবে পরিণত করিয়াছিলেন।

মহাপ্রভুর পরই নিত্যানন্দ বৈষ্ণব ধর্মের সর্বাপেক্ষা প্রধান প্রচারক। বাঙ্গালা দেশে আপামর সাধারণের মধ্যে তিনিই শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন. তাঁহার ন্যায় শক্তিশালী ধর্মপ্রচারক, মধ্যযুগে তো ছিলই না. যে-কোন যুগে, পৃথিবীর যে-কোন দেশেই দুর্লভ। মহাপ্রভুর আদেশে লোকের কল্যাণের জন্য আবাল্যের সন্ন্যাস ধর্ম ত্যাগ করিয়া গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন— নিত্যানন্দের পক্ষে এ যে কত বড় আত্মত্যাগ, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। বাঙ্গালা দেশের লক্ষ লক্ষ লোক তাঁহার কৃপায় বৈষ্ণব হইয়াছে। তিনি না আসিলে, ঐ সমস্ত লোকের অনেকেই যে হিন্দু ধর্ম ও সমাজ ত্যাগ করিয়া মুসলমান হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই।

৬

নিত্যানন্দ জাতিবিচারের ধার ধারিতেন না, বাহ্য আচার অনুষ্ঠানের প্রতিও তাঁহার ভ্রূক্ষেপ ছিল না। তাঁহার এই ব্যবহারে কোন কোন ধর্মাভিমানী ব্যক্তি ক্ষুব্ধ হইয়া নীলাচলে মহাপ্রভুর নিকট তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে উত্তরে বলিয়াছিলেন,—নিত্যানন্দ অগ্নির মত তেজোময় ও শক্তিধর, তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া সমস্ত পাপ ও আবর্জনা ভস্মীভূত হইয়া যায়, শুচি অশুচি বাহ্য আচার অনুষ্ঠানের তিনি বহু ঊর্ধ্বে। নিত্যানন্দের চরিত্রের মহত্ত্ব মহাপ্রভুর এই কয়েকটি কথাতেই সুন্দররূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। যত দিন বাঙ্গালাদেশ ও বাঙ্গালী জাতি বিদ্যমান থাকিবে, বৈষ্ণবধর্ম থাকিবে, ততদিন নিত্যানন্দ প্রভুর নামও অমর হইয়া থাকিবে।

১৫

মহাপ্রভুর গৌড়ে গমন ও রূপসনাতনের সঙ্গে সাক্ষাৎ

দক্ষিণ দেশ হইতে আসিবার পর দুইবৎসর নীলাচলে থাকিয়া মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের বৃন্দাবন তীর্থ দর্শনে যাইবার জন্য অভিলাষ হইল। তিনি সার্বভৌম, রায় রামানন্দ, রাজা প্রতাপরুদ্র প্রভৃতি ভক্তগণকে মনের এই ইচ্ছা জানাইলেন। শুনিয়া তাঁহারা সকলেই বিমনা হইয়া উঠিলেন। রাজা প্রতাপরুদ্র, সার্বভৌম ও রায় রামানন্দকে ডাকিয়া বলিলেন,—প্রভু যদি নীলাচল ত্যাগ করিয়া যান, তবে আমি তাঁহার বিরহ সহ্য করিতে পারিব না। তোমরা দুইজনে যুক্তি করিয়া যেরূপেই হোক, তাঁহার গমন নিবারণ কর। সার্বভৌম ও রায় রামানন্দেরও মনের অবস্থা সেইরূপ, অতএব তাঁহারা সহজেই তাঁহার কথায় সম্মত হইলেন। তাঁহারা মহাপ্রভুর নিকটে নানা অসুবিধা ও আপত্তির কথা তুলিয়া তখনকার মত তাঁহার বৃন্দাবন গমন বন্ধ করিলেন। তারপর যখনই মহাপ্রভু বৃন্দাবন যাত্রার কথা উঠাইতেন, তখনই সার্বভৌম ও রামানন্দ একটা না একটা আপত্তি তুলিয়া তাঁহার যাওয়া স্থগিত করিতেন। এইরূপে আরও দুই বৎসর কাটিয়া গেল। পঞ্চম বৎসরে মহাপ্রভু দৃঢ়সঙ্কল্প করিলেন যে, তিনি বৃন্দাবন যাইবেন-ই, কোন আপত্তি বা বাধা মানিবেন না। সার্বভৌম ও রায় রামানন্দকে ডাকিয়া তিনি বলিলেন,—দেখ, এবার আমার বৃন্দাবন যাইতেই হইবে, কোন বাধা মানিব না। গৌড়দেশে 'জননী ও জাহ্নবী' আমার এই দুই মহা পূজনীয় বস্তু আছেন। অতএব গৌড়দেশে গিয়া তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া ঐ পথে বৃন্দাবন যাইব।

সার্বভৌম ও রামানন্দ ভাবিলেন, প্রভুর উপর অনেক জোর করা হইয়াছে, আর বেশী জোর করা উচিত নয়। অতএব তাঁহারা এবার মহাপ্রভুর নীলাচল-ত্যাগে সম্মত হইলেন। রাজা প্রতাপরুদ্রকেও নানারূপ সান্ত্বনা দিয়া তাঁহারা সম্মত করিলেন। তখন বর্ষাকাল। মহাপ্রভু সকলের অনুরোধে, বর্ষার কয়মাস নীলাচলে থাকিয়া বিজয়াদশমীর দিন বৃন্দাবন যাত্রা করিবেন, স্থির হইল।

বিজয়াদশমী আসিল। মহাপ্রভু নীলাচল হইতে গৌড় দেশের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সঙ্গে চলিলেন সার্বভৌম, দামোদর, জগদানন্দ, গদাধর প্রভৃতি কয়েকজন ভক্ত। রায় রামানন্দ সুখী লোক, হাঁটিতে পারেন না, তিনি দোলায় চড়িয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। এইরূপে মহাপ্রভু সদলবলে কটক পর্যন্ত আসিলেন এবং মহানদীর তীরে এক বকুল বৃক্ষের তলায় বিশ্রাম গ্রহণ

করিলেন। রাজা প্রতাপরুদ্র তখন রাজধানী কটকেই অবস্থান করিতেছিলেন। মহাপ্রভুর আগমন-সংবাদ পাইয়া তিনি সত্বর পাত্রমিত্র সহ আসিয়া তাঁহাকে দর্শন করিলেন। প্রতাপরুদ্র বিষয়ী রাজা হইলেও মহাপ্রভুর কৃপায় পরম প্রেমিক ও কৃষ্ণভক্ত। মহাপ্রভুকে তিনি ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন, মহাপ্রভুও সাদরে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া আশীর্বাদ করিলেন।

প্রতাপরুদ্র তখনই মহাপ্রভুর যাত্রার সুবন্দোবস্ত করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। নিজ রাজ্যের মধ্যে গ্রামের যত "বিষয়ী" (রাজকর্মচারী) ছিল, তাহাদিগকে পত্র পাঠাইয়া আদেশ দিলেন, তাহারা যেন প্রতি গ্রামে মহাপ্রভুকে যথারীতি অভ্যর্থনা করে এবং তাঁহার অবস্থিতির জন্য নূতন গৃহ নির্মাণ করে। হরিচন্দন ও মঙ্গরাজ নামক দুইজন মহাপাত্রকে ডাকিয়া আদেশ দিলেন, মহাপ্রভুর নদী পার হইবার জন্য নৌকা প্রভৃতির সুবন্দোবস্ত করিতে হইবে। মহাপ্রভু যেখানে নদী পার হইবেন, সেইখানে স্তম্ভ রোপণ করিয়া মহাতীর্থে পরিণত করিতে হইবে, প্রতাপরুদ্র নিত্য সেখানে স্নান করিবেন। মহাপ্রভুর যাত্রা উপলক্ষে রাজপ্রাসাদও সুসজ্জিত হইল, চারি দ্বারের প্রত্যেকটি নূতন বস্ত্র ও পতাকায় আচ্ছাদিত হইল।

জ্যোৎস্না রাত্রি। মহাপ্রভু মহানদী ও চিত্রোৎপলার সঙ্গমস্থলে কটক হইতে নৌকায় নদী পার হইলেন। রাজা প্রতাপরুদ্র রাজপরিবারবর্গ সহ তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিলেন। রাজ-অন্তঃপুরবাসিনীগণ হস্তীর উপর তাম্বুতে বসিয়া আসিলেন। মহাপ্রভু জয়ধ্বনির মধ্যে সকলের নিকট বিদায় লইলেন। প্রতাপরুদ্র মহাপ্রভুর বিরহে কাতর হইয়া পড়িলেন, কিন্তু পাত্রমিত্র সকলে বুঝাইয়া তাঁহাকে শান্ত করিল।*

নীলাচল হইতে মহাপ্রভুর সঙ্গে সার্বভৌম, রায় রামানন্দ, গদাধর, জগদানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ আসিতেছিলেন। গদাধর নীলাচলে "ক্ষেত্র সন্ন্যাস" লইয়াছেন, সুতরাং তিনি নীলাচলক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া যান, মহাপ্রভুর ইচ্ছা নয়,—কেননা তাহাতে গদাধরের ধর্মহানি হইবে, ইহাই মহাপ্রভুর আশঙ্কা। কিছুদূর আসিয়া পথে তিনি গদাধরকে বলিলেন, গদাধর, আর নয়, তুমি এখান হইতে নীলাচলে ফিরিয়া যাও।

গদাধর ফিরিয়া যাইতে সম্মত নহেন, কহিলেন, ধর্মহানি হয় আমার হইবে, সে পাপ আমি মাথায় করিয়া লইব, তবু তোমার সঙ্গ আমি ছাড়িতে পারিব না।

মহাপ্রভু নানারূপে তাঁহাকে বুঝাইলেন, কিন্তু গদাধর শুনিলেন না। অবশেষে বলিলেন, আমি তোমার সঙ্গে যাইতেছি না, স্বতন্ত্রভাবে নবদ্বীপে

---

* মহাপ্রভু কটকে যেখানে মহানদী পার হইয়াছিলেন, সেখানে প্রতি বৎসর ঐ তিথিতে এখনও একটি মেলা হয়।

"আইকে" (শচীমাতাকে) দর্শন করিতে যাইতেছি। এই বলিয়া গদাধর প্রভুর দল ছাড়িয়া নিজে স্বতন্ত্রভাবে অন্য পথ দিয়া চলিলেন।

কটক ত্যাগ করিবার সময় মহাপ্রভু গদাধরকে পুনর্বার নিকটে ডাকাইয়া বলিলেন, গদাধর, এইবার তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছে, নীলাচলের সীমা অতিক্রম করিয়া আসিয়াছ। এখন ফিরিয়া যাও, না গেলে আমার মনে অত্যন্ত কষ্ট হইবে। এই বলিয়া মহাপ্রভু গদাধরের দিকে আর না চাহিয়া, তাড়াতাড়ি নদী পার হইবার জন্য নৌকায় চড়িয়া বসিলেন। গদাধর ভূমিতলে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন।

সার্বভৌম গদাধরকে সযত্নে কোলে করিয়া ভূমি হইতে তুলিলেন এবং নানারূপে তাঁহাকে প্রবোধ দিলেন। অবশেষে তাঁহারা দুইজনে কোনরূপে আত্মসংবরণ করিয়া বিষণ্ণ চিত্তে পুরীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

রায় রামানন্দ নদী পার হইয়াও দোলায় চড়িয়া মহাপ্রভুর সঙ্গে সঙ্গেই চলিলেন, মহাপ্রভুর সঙ্গ ত্যাগ করিয়া ফিরিতে তাঁহারও ইচ্ছা হইতেছিল না। অবশেষে রেমুণাগ্রাম পর্যন্ত আসিয়া মহাপ্রভু রায় রামানন্দকে অতিকষ্টে বিদায় দিলেন। রায় রামানন্দ সজল নয়নে নীলাচলের পথে ফিরিয়া চলিলেন।

মহাপ্রভু ও তাঁহার সঙ্গিগণ পথ চলিতে চলিতে ক্রমে উড়িষ্যারাজ্যের সীমায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন পিছলদা নামক গ্রাম উড়িষ্যারাজ্যের সীমা, তার পরেই বাঙ্গালার পাঠানরাজদের অধিকার। স্থানীয় পাঠান অধিকারী বা শাসনকর্তার অনুমতি ব্যতীত কেহই রাজ্যসীমা অতিক্রম করিতে পারে না। রাজ-সৈন্যের ভয় ছাড়া, দস্যুভয়ও যথেষ্ট বিদ্যমান। পিছলদাতে উড়িয়ারাজের যিনি প্রতিনিধি বা অধিকারী ছিলেন, তিনি মহাপ্রভুকে সাদরে সম্বর্ধনা করিয়া বলিলেন, প্রভু, আপনি দুইচারি দিন এখানে বিশ্রাম করুন, আমি পাঠানরাজের নিকট দূত পাঠাইয়া সন্ধি করিয়া আপনার যাইবার বন্দোবস্ত করি।

এমন সময় দৈবক্রমে পাঠান অধিকারীর একজন অনুচর ছদ্মবেশে পিছলদা আসিয়া মহাপ্রভু ও সঙ্গীদের কার্যকলাপ দেখিয়া গেল। সে নিজ প্রভুর নিকট ফিরিয়া গিয়া কহিল, একজন অসাধারণ শক্তিধর হিন্দু সাধু জগন্নাথ হইতে আসিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে অনেক সিদ্ধপুরুষ আছেন। হিন্দুসাধুরা সর্বদাই ভগবৎপ্রেমে উন্মত্ত, তাঁহাদিগকে দেখিবার জন্য লক্ষ লক্ষ লোক আসিতেছে। এই বলিয়া সেই অনুচর নিজেও হরি হরি বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। এই ব্যাপার দেখিয়া অধিকারীর মন ফিরিয়া গেল, তিনি নিজের একজন বিশ্বস্ত কর্মচারীকে উড়িষ্যার অধিকারীর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। কর্মচারী গিয়া উড়িষ্যার অধিকারীকে কহিল—আমার অধিকারী আপনার নিকট এই সংবাদ পাঠাইয়াছেন যে, আপনি যদি অনুমতি দেন, তবে তিনি

আসিয়া মহাপ্রভুকে দর্শন করেন। আপনি ইহাকেই 'সন্ধি' বলিয়া ধরিয়া লউন, যুদ্ধবিগ্রহের কোন ভয় নাই। উড়িষ্যার অধিকারী এই প্রস্তাব শুনিয়া মনে মনে বিস্মিত হইলেও কহিলেন,—তাঁহার যদি ইচ্ছা হয়, তবে আসিয়া প্রভুকে দর্শন করিতে পারেন। তবে তাঁহাকে নিরস্ত্র হইয়া মাত্র পাঁচ সাতজন অনুচর সঙ্গে লইয়া আসিতে হইবে।

তাহাই হইল। পাঠান অধিকারী নিরস্ত্র হইয়া কয়েকজন অনুচর সঙ্গে করিয়া মহাপ্রভুকে দর্শন করিতে আসিলেন এবং ভক্তিভরে জোড়হাতে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। মহাপ্রভু প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে আশীর্বাদ করিলেন।

আলাপ পরিচয়ের পর মুকুন্দদত্ত পাঠান অধিকারীকে কহিলেন,—মহাপ্রভু গঙ্গাতীরে যাইবেন, ইচ্ছা আছে। আপনি যদি তাঁহাকে নিরাপদে সীমান্ত পার করিয়া দিবার বন্দোবস্ত করিতে পারেন, তবে বড় উপকার হয়।

পাঠান অধিকারী হৃষ্টচিত্তে এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। উড়িষ্যার অধিকারী তাঁহার সঙ্গে 'মিত্রতা' করিলেন এবং নানারূপ উপহারসহ তাঁহাকে বিদায় দিলেন। প্রভাতে পাঠান অধিকারী বহু নৌকা সাজাইয়া সৈন্যসামন্তসহ মহাপ্রভুর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার চরণবন্দনা করিলেন। মহাপ্রভু সকলের নিকট বিদায় লইয়া সদলবলে সেই নৌকায় চড়িয়া মন্ত্রেশ্বর নদী পার হইলেন। জলদস্যুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য পাঠান অধিকারীর সৈন্যগণ বহুদূর পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে গেল। মহাপ্রভু সেই নৌকায় চড়িয়া বরাবর গঙ্গাতীরে পাণিহাটী গ্রাম পর্যন্ত আসিলেন এবং রাঘব পণ্ডিতের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। তাঁহার আগমন সংবাদ পূর্ব হইতে শুনিয়া হাজার হাজার লোক পাণিহাটী গ্রামে সমবেত হইয়াছিল। মহাপ্রভু অতিকষ্টে ভীড় ঠেলিয়া গঙ্গাতীর হইতে রাঘব পণ্ডিতের গৃহে গেলেন।

পরদিন পাণিহাটী হইতে মহাপ্রভু কুমারহট্টে শিবানন্দ সেনের গৃহে গেলেন। এই শিবানন্দ সেন মহাপ্রভুর পরম ভক্ত। ইনি ধনশালী ব্যক্তি ছিলেন। প্রতিবৎসর গৌড়ের ভক্তগণকে নিজে সঙ্গে করিয়া নীলাচলে লইয়া যাইতেন এবং সমস্ত ব্যয় বহন করিতেন। তৎপরদিন শিবানন্দের গৃহ হইতে মহাপ্রভু পণ্ডিত বাচস্পতির গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাচস্পতি নবদ্বীপ-বাসী পণ্ডিত বিশারদের পুত্র, সার্বভৌমের ভ্রাতা। সার্বভৌমের ন্যায় ইনিও মহাপ্রভুর পরম ভক্ত। বাচস্পতির গৃহে মহাপ্রভুকে দেখিবার জন্য অসম্ভব লোকের ভীড় হইল। বহুদূরের গ্রামসমূহ হইতে লোক আসিতে লাগিল, গঙ্গা পার হইয়া নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থান হইতে হাজার হাজার লোক আসিল। শেষে লোকের ভীড় এত হইল যে, গঙ্গায় পার হইবার নৌকা পাওয়া যায় না। লোকে তখন সাঁতার দিয়া গঙ্গা পার হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে লক্ষ লক্ষ লোক বাচস্পতির গৃহ ঘিরিয়া ফেলিল। তাহাদের সকলেরই ইচ্ছা—

মহাপ্রভুকে দর্শন করে। মহাপ্রভু এই ব্যাপার দেখিয়া ব্যথিত হইলেন এবং লোকসংঘর্ষ এড়াইবার জন্য সকলের অলক্ষ্যে রাত্রিকালে কুলিয়া গ্রামে মাধবদাসের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এ দিকে বাচস্পতির গৃহে মহাপ্রভুকে না দেখিয়া লোকারণ্য ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। তাহারা বলিতে লাগিল,—এই বাচস্পতিরই যত কারসাজী, সেই মহাপ্রভুকে নিজগৃহে কোন গুপ্তস্থানে লুকাইয়া রাখিয়াছে, আমাদিগকে দর্শন করিতে দিবে না। বাচস্পতিও মহাপ্রভুকে না দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। তিনি যতই বলেন যে,—তিনি এসম্বন্ধে কিছুই জানেন না, মহাপ্রভুকে তিনি লুকাইয়া রাখেন নাই, ততই লোকে উত্তেজিত হইয়া তাঁহাকে তিরস্কার করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ বাচস্পতি বড়ই বিপদে পড়িলেন। এই সময়ে কুলিয়া হইতে একজন লোক আসিয়া সংবাদ দিল, মহাপ্রভু সেখানে আছেন। বাচস্পতির দেহে যেন প্রাণ আসিল, তিনি জনারণ্যকে এই সংবাদ শুনাইলেন। লক্ষ লক্ষ লোক বাচস্পতিকে পুরোভাগে করিয়া কুলিয়া গ্রামে মহাপ্রভুকে দর্শন করিতে চলিল। মহাপ্রভু লোকের এই প্রবল আগ্রহ ও আন্তরিক অনুরাগ দেখিয়া প্রীত হইলেন এবং তাহাদিগকে দর্শন দানে সন্তুষ্ট করিলেন।

কুলিয়া গ্রামে সকলের নিকট হইতে বিদায় লইয়া মহাপ্রভু বৃন্দাবন তীর্থ দর্শন করিবার উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। কিন্তু লোকারণ্য আর তাঁহার সঙ্গ ছাড়িল না। লক্ষ লক্ষ লোক তাঁহার সঙ্গে বৃন্দাবনের পথে চলিল। এইরূপে চলিতে চলিতে গৌড়নগরের নিকটে গঙ্গাতীরে রামকেলি গ্রামে আসিয়া পৌঁছিলেন। রামকেলি ব্রাহ্মণপ্রধান গ্রাম, এখানে বহু ব্রাহ্মণের বাস ছিল। মহাপ্রভু চার পাঁচ দিন সেই খানেই বিশ্রাম গ্রহণ করিলেন। তাঁহার সঙ্গে তো বিশাল জনসঙ্ঘ ছিলই, রামকেলি ও তাহার চতুঃপার্শ্ববর্তী গ্রাম হইতেও, বহুলোক তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিতে লাগিল। এক ঈশ্বরতুল্য মহাপুরুষ রামকেলি গ্রামে আসিয়াছেন, চারিদিকে এই রব পড়িয়া গেল। গৌড়ের বাদশাহ তখন হুসেন সাহ, বাঙ্গালার ইতিহাসে সুশাসক বলিয়া তাঁহার খ্যাতি আছে। হিন্দুদের প্রতি তিনি বিশেষ কোন অত্যাচার করিতেন না, বঙ্গসাহিত্যের উৎসাহদাতা বলিয়াও তাঁহার খ্যাতি ছিল। বাদশাহ হুসেন সাহ রামকেলি গ্রামে মহাপুরুষের আগমন সংবাদ পাইয়া স্থানীয় হিন্দু অধিকারী কেশব ছত্রীকে ডাকিয়া বার্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। কেশব ছত্রী মনে ভাবিলেন, মহাপ্রভুর প্রভাবের কথা এই পাঠান শাসকের নিকট না বলাই ভাল, হয়ত কোন বিপদ ঘটাইতে পারে। এইরূপ ভাবিয়া মুখে মহাপ্রভুর মহিমা একেবারে উড়াইয়া দিয়া কহিলেন,—এক জন ভিখারী সন্ন্যাসী রামকেলি গ্রামে আসিয়াছেন বটে, তীর্থদর্শনে যাওয়াই তাঁহার উদ্দেশ্য। সন্ন্যাসীকে দেখিবার জন্য দুই চার জন লোক যাইতেছে সত্য। তবে ব্যাপার অতি সামান্য। হয়ত

কেহ আসিয়া আপনার নিকট অতিরঞ্জন করিয়া কিছু কহিয়া থাকিবে।

বাদশাহ কেশব ছত্রীকে বলিয়া দিলেন, সন্ন্যাসী যিনিই হউন, তাঁহাকে কোন কাজী বা অন্য কোন রাজকর্মচারী যেন কোনরূপ বিরক্ত না করে, তিনি স্বচ্ছন্দে যে পথে ইচ্ছা তীর্থ দর্শনে যাইতে পারেন।

এদিকে কেশব ছত্রী গোপনে লোক দ্বারা মহাপ্রভুকে বলিয়া পাঠাইলেন, তিনি যেন সত্বর রামকেলি গ্রাম ত্যাগ করিয়া যাত্রা করেন।

কেশব ছত্রীর কথায় কিন্তু বাদশাহের সম্পূর্ণ বিশ্বাস হয় নাই। তিনি বিশ্বস্ত হিন্দুমন্ত্রী দবীর খাসকে ডাকিয়া প্রকৃত তথ্য জিজ্ঞাসা করিলেন। দবীর খাস কিছুই গোপন করিলেন না, বলিলেন, মহাপ্রভু অসাধারণ শক্তিশালী পুরুষ, লোকে তাঁহাকে ভগবানের অবতার বলে। বাদশাহ শুনিয়া পরম সন্তুষ্ট হইলেন এবং রাজ্যমধ্যে কোথায় যেন মহাপ্রভুকে কেহ বিরক্ত না করে পুনর্বার এই আদেশ প্রদান করিলেন।

সাকর মল্লিক ও দবীর খাস দুইজনে গৌড়ের বাদশাহ হুসেন সাহের বিশ্বস্ত হিন্দুমন্ত্রী ছিলেন। তাঁহারা দুই সহোদর ভাই, জাতিতে ব্রাহ্মণ, আসল নাম রূপ ও সনাতন। তাঁহাদের কার্যে সন্তুষ্ট হইয়া, বাদশাহ "সাকর মল্লিক ও দবীর খাস" এই দুই উপাধি দুইজনকে দিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ হইয়াও তাঁহারা নিজেকে নীচ জাতি মনে করিতেন, কেননা মুসলমান বাদশাহের সংসর্গে বাস ও তাঁহার সেবা করিতেন; চাকরীর জন্য জানিয়া শুনিয়া সময়ে সময়ে ধর্মবিরোধী কার্য করিতে হইত। এজন্য তাঁহারা বড়ই লজ্জিত ও অনুতপ্ত ছিলেন। তাঁহারা উভয়েই পরম পণ্ডিত, শাস্ত্রবিৎ এবং ভগবানকে লাভ করিবার জন্যও তাঁহাদের চিত্ত উন্মুখ ছিল। মহাপ্রভুর কথা বহু পূর্বেই তাঁহারা শুনিয়াছিলেন ও পত্রযোগে নিজেদের মনের আকাঙ্ক্ষা মহাপ্রভুর নিকট নিবেদন করিয়াছিলেন। এখন স্বয়ং মহাপ্রভু রামকেলি গ্রামে আসিয়াছেন শুনিয়া দুই ভাই নিভৃতে যুক্তি করিলেন, মহাপ্রভুকে দেখিতে হইবে।

গভীর রাত্রে রূপ ও সনাতন দুই ভাই রামকেলি গ্রামে মহাপ্রভুর নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া আশীর্বাদভিক্ষা করিলেন। দুইজনেই মহাপ্রভুর দর্শন পাইয়া আনন্দে অশ্রুজলে ভাসিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু আশীর্বাদ করিয়া দুই ভাইকে সসম্মানে উঠাইলেন, কহিলেন, "তোমাদের মঙ্গল হইবে।"

রূপ সনাতনের মন কিন্তু প্রবোধ মানিল না। তাঁহারা সবিনয়ে বলিলেন,—আমরা কুসংসর্গে নীচ পতিত হইয়াছি। সর্বদা বিষয়াসক্ত, বহু পাপ করিয়াছি। তুমি যদি আমাদের কৃপা না কর, তবে আর আমাদের উদ্ধার নাই। শুনিয়াছি, তুমি পাপী জগাই মাধাইকে উদ্ধার করিয়াছ, কিন্তু আমাদের তুলনায় জগাই

মাধাইও পুণ্যবান। আমরা বিধর্মীর সেবা করিয়া জীবন যাপন করিতেছি।

মহাপ্রভু রূপ-সনাতনের দৈন্যে সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন,—রূপ-সনাতন, তোমরা দুই ভাই আমার বড় প্রিয়। পত্রযোগেই তোমাদের মনোবাসনা আমি জানিতে পারিয়াছি এবং তোমাদের দুইজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্যই রামকেলি গ্রামে আসিয়াছি। নতুবা বৃন্দাবন তীর্থে যাইতে এপথে আসিবার আমার অন্য কোন প্রয়োজন ছিল না। যাহোক তোমরা আসিয়াছ, ভালই হইয়াছে। তোমাদের মঙ্গল হউক, কৃষ্ণ অচিরেই তোমাদের দুইজনকে উদ্ধার করিবেন। এখন তোমরা দুইজনে নিষ্কামভাবে সংসারের কাজ কর। এই বলিয়া মহাপ্রভু রূপ ও সনাতনের মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিলেন। রূপ-সনাতন নিত্যানন্দ, হরিদাস, গদাধর, মুকুন্দ প্রভৃতি ভক্তগণকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন। মহাপ্রভুর নিকট বিদায় লইবার সময় সনাতন কহিলেন,—প্রভু, রামকেলি গ্রাম হইতে শীঘ্র আপনি বিদায় গ্রহণ করুন। যদ্যপি গৌড়ের বাদশাহ আপনাকে শ্রদ্ধা করেন, তথাপি বিধর্মী শাসক, কখন তাঁহার মনে কি ভাব হইবে বলা যায় না। আর আপনি যে ভাবে বৃন্দাবন দর্শনে চলিয়াছেন, তাহাও উত্তম রীতি নহে, এমন ভাবে লক্ষ লক্ষ লোক লইয়া হট্টগোল করিতে করিতে কেহ কখনও বৃন্দাবনে যায় না।

যার সঙ্গে চলে এই লোক লক্ষ কোটী।
বৃন্দাবন যাবার এই নহে পরিপাটী॥

রূপ সনাতন বিদায় লইয়া গৌড়ে ফিরিয়া গেলেন। মহাপ্রভুও রামকেলি গ্রাম ত্যাগ করিয়া পরদিন কানাই নাটশালা নামক গ্রামে গেলেন। এইখানে আসিয়া সনাতনের কথা স্মরণ করিয়া তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন,—সনাতন ঠিক কথাই বলিয়াছে। এত লোক সঙ্গে করিয়া বৃন্দাবন যাওয়া হইতে পারে না। তাহা হইলে বৃন্দাবন দর্শন করিয়া আমি কোন সুখই পাইব না। এবার নীলাচলে ফিরিয়া যাই, পরে সুযোগ মত একাকী বৃন্দাবনে যাইব।

পরদিন প্রভাতে মহাপ্রভু ভক্তগণের নিকটে এই ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন এবং বৃন্দাবনের পথে না গিয়া শান্তিপুরের দিকে যাত্রা করিলেন। শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্যের গৃহে তিনি আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। সংবাদ পাইয়া নবদ্বীপ হইতে শচীমাতাও আসিলেন। দশ দিন অদ্বৈতগৃহে মায়ের স্নেহসুখ অনুভব করিয়া মহাপ্রভু পুনরায় নীলাচলে ফিরিয়া চলিলেন। এবার সঙ্গে চলিলেন কেবল বলভদ্র ভট্টাচার্য ও দামোদর পণ্ডিত। নীলাচলে প্রভু প্রত্যাবর্তন করিলে সেখানে ভক্তবৃন্দের মধ্যে উৎসব লাগিয়া গেল।

১৬

মহাপ্রভুর বৃন্দাবন গমন

মহাপ্রভু বর্ষার কয়েক মাস নীলাচলে বাস করিলেন। শরৎকাল উপস্থিত হইলে, তাঁহার বৃন্দাবন-যাত্রা করিবার ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠিল। কিন্তু সমস্ত ভক্তগণকে যদি এই কথা বলেন, তবে যাইবার বাধা হইবে আশঙ্কা করিয়া, কেবল মাত্র রায় রামানন্দ ও স্বরূপ দামোদরকে নিভৃতে ডাকিয়া বলিলেন,— আমি একাকী বৃন্দাবন যাইতে মনস্থ করিয়াছি, তোমরা আমাকে সহায়তা কর। অন্য কাহাকেও পূর্বে এ সংবাদ দিও না। আমি রাত্রিযোগে গোপনে নীলাচল ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনের পথে যাত্রা করিব।

রায় রামানন্দ ও স্বরূপ মনে মনে চিন্তিত হইলেও, এবার মহাপ্রভুকে বাধা দেওয়া সংগত মনে করিলেন না। কহিলেন—তোমার যখন বৃন্দাবন যাইবার ইচ্ছা হইয়াছে, তখন কে তোমাকে রোধ করিবে? তবে নিতান্ত একাকী যাওয়া ভাল নয়, তাহাতে আমাদের মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইবে। সংগে অন্ততঃ একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে লইয়া যাও, সে পথে তোমার বস্ত্রাদি লইয়া যাইবে, ভিক্ষা নির্বাহ করিবে এবং আরও নানা বিষয়ে সহায়তা করিতে পারিবে।

মহাপ্রভু এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। ঠিক হইল বলভদ্র ভট্টাচার্য মহাপ্রভুর সংগে বৃন্দাবন যাইবেন।

যাত্রার দিন আসিল। মহাপ্রভু শেষ রাত্রে উঠিয়া অন্য সকলের অলক্ষ্যে, কেবলমাত্র বলভদ্র ভট্টাচার্যকে সংগে করিয়া নীলাচল ত্যাগ করিলেন। বৃন্দাবনে যাইবার যে প্রসিদ্ধ রাজপথ ছিল, তাহা ত্যাগ করিয়া মহাপ্রভু বনপথ অবলম্বন করিলেন। কটক পর্যন্ত আসিয়া কটক নগর দক্ষিণে রাখিয়া মহানদী পার হইয়া ঝারিখন্ড বা গভীর জংগলময় দেশে বাসা করিলেন। বৈষ্ণব গ্রন্থের বর্ণনা হইতে অনুমান হয় বর্তমানে কেঁওঝর, ঢেকালাল, আটগড় প্রভৃতি দেশীয় রাজ্য, সেই অঞ্চলই তৎকালে ঝারিখন্ড নামে খ্যাত ছিল। এখনও ঐ সব অঞ্চল অনেক স্থলে—পাহাড় জংগলে পরিপূর্ণ। মহাপ্রভুর যাত্রার সময়ে উহা নিবিড় অরণ্যময় ছিল। লোকালয় বা গ্রাম দূরে দূরে বনের মধ্যে দুই চারটি ছিল। আর বন্য জাতিরাই প্রধানতঃ এই সব স্থানে বাস করিত। আর বন্য জন্তুদের তো কথাই নাই, এই অঞ্চলে তাহাদেরই রাজত্ব ছিল। এপথে লোকে প্রায়ই যাতায়াত করিত না। কিন্তু মহাপ্রভু নির্জনে যাইবার জন্যই এই বিপদসংকুল বন-পথ বাছিয়া লইয়াছিলেন।

বৈষ্ণব গ্রন্থে মহাপ্রভুর বনপথ-ভ্রমণের এইরূপ বর্ণনা আছে :—

মহাপ্রভু কৃষ্ণনাম করিতে করিতে গভীর বনের মধ্য দিয়া চলিয়াছেন। হস্তী, ব্যাঘ্র, শূকর, গণ্ডার প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণ দলে দলে পথের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেছে, কিন্তু মহাপ্রভুকে দেখিয়াই পথ ছাড়িয়া দিতেছে। মহাপ্রভু কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর, নিঃসঙ্কোচে বন্য জন্তুদের পালের মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন। বিন্দুমাত্র হিংসার ভাবও তাহাদের মনে উদয় হইতেছে না। পথপার্শ্বে ব্যাঘ্র শয়ন করিয়া আছে, মহাপ্রভু 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিয়া তাহাকে অতিক্রম করিয়া গেলেন। কোন স্থানে নদীর জলে হস্তিযূথ স্নান করিতে নামিয়াছে, মহাপ্রভু নির্বিকারভাবে সেইস্থানে নামিয়াই স্নান করিতে লাগিলেন। হস্তি-যূথ তাঁহার দিকে একবার চাহিয়া সরিয়া গেল। মহাপ্রভু উচ্চ সঙ্কীর্তন করিতে করিতে যাইতেছেন, মৃগ ও মৃগীগণ পথপার্শ্বে মুগ্ধচিত্তে দাঁড়াইয়া সে সঙ্গীত শ্রবণ করিতেছে। এই বিচিত্র ব্যাপার দেখিয়া সঙ্গী বলভদ্র ভট্টাচার্য একদিকে ভীত, অন্যদিকে বিস্ময়ে অভিভূত হইতেছেন।

এসব কথা আধুনিক লোকেরা 'অতিপ্রাকৃত' বলিয়া হয়ত উড়াইয়া দিবেন। কিন্তু হিংসাকে যিনি সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়াছেন, সর্বজীবে যাঁহার সমান প্রেম, তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া হিংস্র জন্তুগণও যে হিংসার ভাব ভুলিয়া যায়, ইহার দৃষ্টান্ত এই বৈজ্ঞানিক যুগেও বিরল নহে। মহাপ্রভুর জীবনের এই ঘটনাতেই বা অবিশ্বাসের কারণ কি আছে?

দক্ষিণ দেশ ভ্রমণের সময় মহাপ্রভু গ্রামের পর গ্রাম কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা করিয়াছিলেন। ঝারিখণ্ড পথেও তদ্রূপ হইল, যে সব লোক তাঁহার দর্শন পাইল, তাহারা ভগবৎপ্রেম লাভ করিল। মহাপ্রভুর—

বন দেখি ভ্রম হয় এই বৃন্দাবন।
শৈল দেখি মনে হয় সেই গোবর্ধন॥
যাঁহা নদী দেখে তাঁহা মানয়ে কালিন্দী।
মহা প্রেমাবেশে নাচে প্রভু, পড়ে কান্দি॥

ঝারিখণ্ডের অধিবাসীরা বন্য জাতি হইলেও, মহাপ্রভুর এই অসীম প্রেম তাহাদের অন্তর স্পর্শ করিল।

যে গ্রামের মধ্য দিয়া মহাপ্রভু যাইতেন, সেখানকার লোকেরা তাঁহার সেবার জন্য নানা আহার্য দ্রব্য উপহার প্রদান করিত। মহাপ্রভু উষ্ণ নির্ঝরের জলে স্নান করিতেন, নির্ঝরের জল পান করিতেন এবং রাত্রিকালে বৃক্ষতলে বিশ্রাম করিতেন। এই নির্জন ভ্রমণে কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর মহাপ্রভুর মনের আনন্দ শত-গুণে বৃদ্ধি পাইল।

কত দিন পরে ঝারিখণ্ড অতিক্রম করিয়া, ছোট নাগপুর ও বিহারের মধ্য দিয়া মহাপ্রভু কাশীতে আসিয়া উপনীত হইলেন। কাশীর মণিকর্ণিকা ঘাটে মহাপ্রভু স্নান করিতেছেন, এমন সময় তপন মিশ্রের সঙ্গে দেখা হইল। এই

তপন মিশ্র পূর্ববঙ্গের লোক, মহাপ্রভু যখন তরুণ বয়সে পূর্ববঙ্গে গিয়াছিলেন, তখন ইঁহার সঙ্গে পরিচয় হয়। কথিত আছে, মহাপ্রভুরই উপদেশে তপন মিশ্র কাশীতে গিয়া বাস করিয়াছিলেন। তপন মিশ্র মহাপ্রভুকে দেখিয়া পরম আনন্দিত হইলেন এবং সাদরে তাঁহাকে নিজগৃহে লইয়া গেলেন। তারপর তিনি ও তাঁহার পুত্র রঘুনাথ শ্রদ্ধাসহকারে মহাপ্রভুর সেবা করিলেন। চন্দ্রশেখর নামক একজন বাঙ্গালী বৈদ্য এই সময়ে কাশীবাস করিতেন। তিনিও পূর্ব হইতেই মহাপ্রভুর অনুরাগী ছিলেন। মহাপ্রভুর আগমন-সংবাদ পাইয়া তিনিও আসিয়া তাঁহার চরণে আত্মনিবেদন করিলেন। চন্দ্রশেখর মহাপ্রভুকে বলিলেন—প্রভু, কাশী পণ্ডিত-স্থান হইলেও ভক্তিহীন,—কৃষ্ণনাম এখানে শুনিতে পাওয়া যায় না, কেবলই 'মায়া', 'ব্রহ্ম' ইত্যাদি শব্দে এই স্থানের আবহাওয়া পূর্ণ। আমরা এই ভক্তিহীন স্থানে অতি কষ্টে কাল যাপন করি। তুমি ভক্তিহীন পণ্ডিতদের উদ্ধার কর।

মহাপ্রভু শুনিয়া একটু হাসিলেন, কোন উত্তর দিলেন না।

কাশীতে তখন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য। নীলাচল হইতে একজন তেজোময় সন্ন্যাসী আসিয়াছেন শুনিয়া মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণেরা দলে দলে তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন এবং তাঁহার মনোহর রূপ দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। তাঁহারা সকলেই নিজগৃহে মহাপ্রভুকে সাদরে নিমন্ত্রণ করিলেন, কিন্তু মহাপ্রভু তাঁহাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন না।

প্রকাশানন্দ সরস্বতী এই সময়ে কাশীর সর্বপ্রধান সন্ন্যাসী ও পণ্ডিত। বহু সন্ন্যাসীকে তিনি বেদান্ত পড়ান। পাণ্ডিত্যের গর্ব তাঁহার খুবই ছিল। ভক্তিধর্মকে তিনি ভাবুকতা মাত্র বলিয়া মনে করিতেন। মহাপ্রভুকে দেখিয়া জনৈক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ প্রকাশানন্দকে গিয়া বলিল—জগন্নাথক্ষেত্র হইতে একজন সন্ন্যাসী মহাপুরুষ কাশীতে আসিয়াছেন, তাঁহার যেমন অলোকসামান্য রূপ, তেমনি অদ্ভুত তেজ। লোকে তাঁহাকে 'নারায়ণ' বলিয়া জ্ঞান করিতেছে। শাস্ত্রে 'মহাভাগবতের' যে সব লক্ষণ পড়িয়াছি, তাঁহার মধ্যে সে সবই দেখিতেছি,—তাঁহার জিহ্বায় নিরন্তর কৃষ্ণনাম, নাম করিতে করিতে দুই নয়নে অশ্রুধারা বহে, প্রেমে বিভোর হইয়া, তিনি কখন নৃত্য, কখন ক্রন্দন, কখন হুঙ্কার করেন। শুনিলাম তাঁহার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

প্রকাশানন্দ ব্রাহ্মণের এই "অলৌকিক কাহিনী" শুনিয়া খুব হাসিলেন। তারপর বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন,—শুনিয়াছি, গৌড়দেশে একজন 'ভাবুক সন্ন্যাসী' আছেন, তাঁহার ঐরূপ নাম। তিনি কেশব ভারতীর শিষ্য। লোকপ্রতারক এই সন্ন্যাসী দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে ভগবানের নাম করিয়া সরল প্রকৃতির লোকদের নাচাইয়া ফিরেন। লোককে সম্মোহন করিবার একটা স্বাভাবিক ক্ষমতাও তাঁহার আছে। এমন যে প্রসিদ্ধ জ্ঞানী ও পণ্ডিত বাসুদেব

সার্বভৌম, তিনিও নাকি তাঁহার প্রভাবে পড়িয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু সার্বভৌম পাগল সাজিলেও, এই কাশীধামে চৈতন্যের ভাবকালি বিকাইবে না। তাহার পর সেই ব্রাহ্মণ ও নিজ শিষ্যদিগকে লক্ষ্য করিয়া প্রকাশানন্দ বলিলেন,—আমার উপদেশ, মনের মোহ দূর করিবার জন্য তোমরা সকলে উত্তমরূপে বেদান্ত পাঠ ও শ্রবণ কর, সেই প্রতারক সন্ন্যাসী চৈতন্যের কাছে যাইও না, তাহা হইলে ইহপরকাল দুইই নষ্ট হইবে।

প্রকাশানন্দের এই দম্ভ ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ বাক্যে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং মহাপ্রভুর নিকট ফিরিয়া গিয়া সমস্ত কথা বলিলেন। শুনিয়া মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিয়া উত্তর দিলেন—প্রকাশানন্দ সরস্বতী মহাপণ্ডিত হইলেও মায়াবাদী সন্ন্যাসী। 'ভক্তি' তাঁহার নিকট তুচ্ছ পদার্থ; সুতরাং তিনি যে এরূপ বলিবেন তাহা আর বিচিত্র কি? আমি ভাবুক সন্ন্যাসী, 'ভাবকালি' বেচিতে কাশীতে আসিয়াছিলাম বটে, কিন্তু আপাততঃ যখন বিকাইল না, তখন এমনই ফিরিয়া যাইতে হইবে।

কয়েকদিন কাশীতে থাকিয়া মহাপ্রভু আবার বৃন্দাবনের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তপন মিশ্র, চন্দ্রশেখর এবং সেই মহারাষ্ট্রীয় ভক্ত ব্রাহ্মণ সঙ্গে যাইতে চাহিলেন, কিন্তু মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে সে সঙ্কল্প হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। কাশী হইতে বৃন্দাবন যাইবার পথেও মহাপ্রভু হরিনাম প্রচার করিতে করিতে গেলেন, বহু লোক তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া প্রেমধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিল। পথে প্রয়াগে তিন দিন থাকিয়া মহাপ্রভু অবশেষে মথুরায় আসিয়া উপনীত হইলেন।

এই খানে যমুনার ঘাটে বিশ্রামতীর্থে স্নান করিয়া মহাপ্রভু কেশবজীকে দর্শন করিলেন এবং প্রেমে বিভোর হইয়া কীর্তন ও নৃত্য করিতে লাগিলেন। একজন ব্রাহ্মণ এই সময়ে আসিয়া তাঁহাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিল এবং তাঁহার সঙ্গে হরি হরি বলিয়া নাচিতে লাগিল। সমস্ত লোকে তাঁহাদের এই অপূর্ব প্রেম দেখিয়া চমৎকৃত হইল। এদিকে মহাপ্রভু ব্রাহ্মণকে নিভৃতে ডাকিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আর্য, আপনি এই অপূর্ব ভগবৎপ্রেম কোথা হইতে পাইয়াছেন, আমাকে বলুন। ব্রাহ্মণ কহিলেন—শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী ভ্রমণ করিতে করিতে মথুরায় আসিয়াছিলেন। তিনিই আমাকে কৃপা করেন, আমাকে শিষ্যরূপে দীক্ষা দেন এবং আমার হাতে ভিক্ষাও গ্রহণ করেন।

এই কথা শুনিয়া মহাপ্রভু শ্রদ্ধাভরে ব্রাহ্মণের চরণ বন্দনা করিলেন। সরল ব্রাহ্মণ ভয় পাইয়া বলিলেন—তুমি সন্ন্যাসী, আমাকে প্রণাম করিতেছ, আমার মহা অপরাধ হইবে।

মহাপ্রভু কহিলেন—আর্য, আপনার কোন ভয় নাই। আমি মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্যানুশিষ্য, সুতরাং আপনি আমার গুরুতুল্য। ব্রাহ্মণ এই কথা শুনিয়া

পরম আনন্দিত হইয়া মহাপ্রভুকে স্বগৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গেলেন। তিনি জাতিতে সনোরিয়া ব্রাহ্মণ ছিলেন, সনোরিয়া ব্রাহ্মণগণ সমাজে হীন বলিয়া গণ্য হইতেন, তাঁহাদের হাতে উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা বা সাধুসন্ন্যাসীরা খাইতেন না। সুতরাং ব্রাহ্মণ নিজে কোন রন্ধনের আয়োজন না করিয়া প্রভুর সেবার জন্য রন্ধনের দ্রব্যাদি বলভদ্র ভট্টাচার্যের নিকটে দিয়া তাঁহাকেই রন্ধন করিতে বলিলেন। মহাপ্রভু ইহা জানিতে পারিয়া ব্রাহ্মণকে বলিলেন—আর্য, আপনিই রন্ধন করুন, স্বয়ং শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী আপনার হাতে ভিক্ষা লইয়াছেন, আমি সে সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইব কেন?

ব্রাহ্মণ বলিলেন—তুমি সন্ন্যাসী, ঈশ্বরতুল্য, সুতরাং সাধারণ বিধি-নিষেধের অতীত। কিন্তু তবুও আমার হাতে অন্নগ্রহণ করিলে দুষ্ট লোকেরা যে তোমার নিন্দা করিবে, তাহা আমি সহিতে পারিব না।

মহাপ্রভু হাসিয়া কহিলেন—আপনি ভক্ত, পরম বৈষ্ণব, সুতরাং আপনার হাতের অন্ন গ্রহণ করিলে আমার মহাপুণ্যই হইবে। আর স্বয়ং মাধবেন্দ্রপুরী যে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, তাহাই তো শ্রেষ্ঠ সদাচার!

ব্রাহ্মণ মহাপ্রভুর এই কথায় সন্তুষ্ট হইয়া পরম শ্রদ্ধাভরে তাঁহার সেবার আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন।

এদিকে মথুরায় সহস্র সহস্র লোক মহাপ্রভুকে দেখিতে আসিতে লাগিল এবং তাঁহার অপূর্ব প্রেম ও ভক্তি দেখিয়া তাহাদের চিত্ত বিগলিত হইল। যে "লোকসংঘট্টের" ভয়ে মহাপ্রভু ভীত, মথুরাতেও তাহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি নাই দেখিয়া, তিনি অবশেষে ভক্ত সনোরিয়া ব্রাহ্মণকে সঙ্গে করিয়া একান্তে বৃন্দাবন তীর্থে প্রবেশ করিলেন।

এই সেই বৃন্দাবন তীর্থ—যাহা দেখিবার জন্য মহাপ্রভুর মন বহুদিন হইতে উৎকণ্ঠিত ছিল, কিন্তু ঘটনাচক্রে নানা বাধাবিপত্তিতে তাঁহার সে বাসনা পূর্ণ হয় নাই। এই সেই বৃন্দাবন তীর্থ—যেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার বাল্যলীলা করিয়াছিলেন, যাহার প্রতি বৃক্ষপত্রে লতায় কৃষ্ণস্মৃতি জড়িত আছে। মহাপ্রভুর মন বৃন্দাবন তীর্থ দেখিয়া প্রেমে বিভোর হইল, তিনি বৃন্দাবনের বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

প্রতি বৃক্ষ লতা প্রভু করে আলিঙ্গন।
পুষ্পাদি ধ্যানে করে কৃষ্ণে সমর্পণ॥
অশ্রু কম্প পুলক প্রেমে শরীর অস্থিরে।
কৃষ্ণ বোল কৃষ্ণ বোল বলে উচ্চৈঃস্বরে॥

বৃন্দাবনের পশুপক্ষীও তাঁহার পরম প্রিয় হইয়া উঠিল। ধেনুগণকে চরিতে দেখিয়া তাঁহার মনে শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা স্মরণ হইল,—বনমধ্যে কোকিলের কুহুধ্বনি শুনিয়া, শুকসারীর ক্রীড়া দেখিয়া, ময়ূরের নৃত্য দর্শন

করিয়া, মৃগমৃগীর সভীতি চকিত চাহনি অনুভব করিয়া তাঁহার মন পুলকে পরিপূর্ণ হইল।

বৃন্দাবনে কৃষ্ণলীলার স্মৃতিমণ্ডিত যত কুঞ্জ, গুহা, নদীপুলিন, কুণ্ড প্রভৃতি ছিল, একে একে সবই তিনি দর্শন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বৃন্দাবন তীর্থ তখন লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। কতক বা বিধর্মী শাসকদের অত্যাচারে, কতক বা হিন্দুদের ঔদাসীন্যে। এই তীর্থে তখন বড় একটা কেহ আসিত না। ইহার দেবস্থান, মন্দির প্রভৃতিও ধ্বংসাবশেষে পরিণত হইয়াছিল। মহাপ্রভু প্রেমে বিভোর অবস্থায় নৃত্য ও কীর্তন করিতে করিতে সর্বত্র ভ্রমণ করিয়া এই সব লুপ্ততীর্থস্থান উদ্ধার করিতে লাগিলেন। প্রসিদ্ধ রাধাকুণ্ড তীর্থ মহাপ্রভু কিরূপে উদ্ধার করেন, 'শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে' তাহার এইরূপ বর্ণনা আছে :—

এই মত মহাপ্রভু নাচিতে নাচিতে।
আরিট গ্রামে আসি বাহ্য হৈল আচম্বিতে॥
আরিটে রাধাকুণ্ড বার্তা পুছে লোক স্থানে।
কেহ নাহি কহে সঙ্গের ব্রাহ্মণ সজ্জনে॥
তীর্থ লুপ্ত জানি প্রভু সর্বজ্ঞ ভগবান।
দুই ধান্য ক্ষেত্রে অল্পজলে কৈল স্নান॥
দেখি সব গ্রাম্যলোক বিস্ময় হৈল মন।
প্রেমে প্রভু করে রাধাকুণ্ডের স্তবন॥

এইরূপে মহাপ্রভু ক্রমে ক্রমে গিরিগোবর্ধন, শ্যামকুণ্ড, ব্রহ্মকুণ্ড, গোবিন্দ-কুণ্ড, মানসগঙ্গা, কাম্যবন, নন্দীশ্বর, গোকুল, কালীয় হ্রদ, দ্বাদশ আদিত্য, কেশীতীর্থ, অক্রূরতীর্থ প্রভৃতি মহানন্দে দর্শন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। একদিন যমুনায় স্নান করিয়া চীরঘাটে তেঁতুলতলায় বসিয়া মহাপ্রভু নাম সঙ্কীর্তন করিতেছেন, এমন সময় কৃষ্ণদাস গুঞ্জামালী নামক একজন ভক্ত বৈষ্ণব তাঁহাকে আসিয়া প্রণাম করিল। কৃষ্ণদাস গুঞ্জামালী জাতিতে রাজপুত, যমুনা নদীর অপর পারে তাহার ঘর। মহাপ্রভু তাহার ভক্তির পরিচয় পাইয়া তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিলেন। কৃষ্ণদাস সেই হইতে মহাপ্রভুর একজন অনুরক্ত ভক্ত হইল। কথিত আছে, মহাপ্রভু বৃন্দাবন ত্যাগ করিলে কৃষ্ণদাস গুঞ্জামালী সিন্ধু ও গুজরাট অঞ্চলে যান এবং সেখানে মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম প্রচার করেন। অনেকেই হয়ত জানেন না যে, পশ্চিম ভারতে, বিশেষতঃ গুজরাট অঞ্চলে মহাপ্রভুর ভক্ত বৈষ্ণব সম্প্রদায় এখনো আছেন। যতদূর জানা যায়, ইঁহারা কৃষ্ণদাস গুঞ্জামালীর শিষ্য-সম্প্রদায়।

মহাপ্রভু কিছুদিন বৃন্দাবনে থাকিয়া প্রেমধর্ম প্রচার করিতে লাগিলেন।

মথুরার যত ব্রাহ্মণ সজ্জন শীঘ্রই মহাপ্রভুর পরিচয় পাইয়া তাঁহার অনুরক্ত হইয়া উঠিল এবং সকলেই পরম সমাদরে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার সেবা করিতে লাগিল। প্রত্যহ সহস্র সহস্র লোক মহাপ্রভুকে দর্শন করিতে আসিত এবং তাঁহার অপূর্ব ভগবৎপ্রেম দেখিয়া মুগ্ধ হইত, তাঁহার মুখে কৃষ্ণনাম শুনিয়া তাহাদের হৃদয় বিগলিত হইত। কিন্তু প্রত্যহ নানাস্থানে নিমন্ত্রণ এবং দিবারাত্র লোকের ভীড় এই সব কারণে মহাপ্রভুর মন ক্লান্ত হইয়া পড়িল। একদিন তিনি নির্জনে অক্রূর তীর্থের ঘাটে বসিয়া আছেন, এমন সময় তাঁহার মনে হইল, সেই ঘাটেই ভক্তশ্রেষ্ঠ অক্রূর ভগবানের অনুগ্রহে বৈকুণ্ঠ দর্শন করিয়াছিলেন, আর ব্রজবাসিগণও গোলোক দর্শন করিয়াছিল। এইরূপ চিন্তার উদয় হইতেই ভাবোন্মত্ত মহাপ্রভু যমুনার জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। সঙ্গে ছিলেন সেই রাজপুত কৃষ্ণদাস। মহাপ্রভু অনেকক্ষণ জল হইতে উঠেন না দেখিয়া তিনি ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। বলভদ্র ভট্টাচার্য সেই চীৎকার শুনিয়া ছুটিয়া আসিলেন এবং জলে নামিয়া মহাপ্রভুকে উঠাইয়া তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। কিন্তু বলভদ্র ভট্টাচার্য এই ব্যাপারে বড়ই উদ্বিগ্ন হইলেন। তিনি সেই সনোরিয়া ব্রাহ্মণের নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন—মহাপ্রভুর আর বেশীদিন বৃন্দাবনে থাকা ভাল নয়,—

লোকের সংঘট্ট আর নিমন্ত্রণের জঞ্জাল।
নিরন্তর আবেশ প্রভুর না দেখিয়ে ভাল॥
বৃন্দাবন হৈতে যদি প্রভুকে কাড়িয়ে।
তবে মঙ্গল হয় এই ভাল যুক্তি হয়ে॥

সনোরিয়া ব্রাহ্মণও ইহাতে সায় দিয়া বলিলেন যে, বৃন্দাবনে আসিয়া মহাপ্রভু নিরন্তর কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হইয়া থাকেন, অনেক সময়ই তাঁহার বাহ্য-জ্ঞান থাকে না। কখন কোন বিপদ ঘটাও আশ্চর্য নহে। এরূপ অবস্থায় মহাপ্রভুকে আর বেশীদিন বৃন্দাবনে থাকিতে দেওয়া উচিত নয়। তাঁহাকে বৃন্দাবন হইতে প্রয়াগক্ষেত্রে লইয়া যাওয়াই ভাল।

দুইজনে এইরূপ পরামর্শ হইল। পরদিন বলভদ্র ভট্টাচার্য মহাপ্রভুকে কহিলেন—বৃন্দাবনে প্রত্যহ যেমন লোকের ভিড় ও নিমন্ত্রণের জঞ্জাল দেখিতেছি, এ আমার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। প্রভাত হইলে লোকে দলে দলে তোমাকে দেখিতে আসে, এবং তোমাকে না পাইয়া আমার প্রাণ অতিষ্ঠ করিয়া তোলে। বিশেষতঃ প্রয়াগে মকর সংক্রান্তিতে গঙ্গাস্নান করিবার আমার অত্যন্ত সাধ হইয়াছে, তুমি যদি দয়া কর, তবেই আমার বহুদিনের সেই সাধ পূর্ণ হয়।

মহাপ্রভুর বৃন্দাবন ত্যাগ করিবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু অনুরক্ত ভক্তের প্রার্থনাও তিনি অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। কহিলেন—

তুমি আমায় আনি দেখাইলে বৃন্দাবন।
এই ঋণ আমি নারিব করিতে শোধন॥
তোমার যা ইচ্ছা আমি সেইত করিব।
যাঁহা লয়ে যাহ তুমি তাঁহাই যাইব॥

মহাপ্রভু বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া প্রয়াগের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সঙ্গে রহিলেন সনোরিয়া ব্রাহ্মণ, কৃষ্ণদাস, বলভদ্র ভট্টাচার্য এবং আরও দুইজন "গৌড়িয়া" (গৌড়দেশবাসী বা বাঙ্গালী)। মহাপ্রভুর বৃন্দাবনের সেই প্রেমাবিষ্ট ভাব তখনও কাটে নাই, কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর, প্রায় বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়াই তিনি পথ চলিতে লাগিলেন। একদিন তাঁহারা এক বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। মহাপ্রভু বৃক্ষতলে বসিয়া কৃষ্ণনাম জপ করিতেছেন, এমন সময় দূরে একজন রাখাল বালক বাঁশী বাজাইল। মহাপ্রভু সেই বংশীধ্বনি শুনিয়া ভাবে বিভোর হইয়া অচেতন হইলেন। তাঁহার মুখ দিয়া ফেনা উঠিতে লাগিল, নাসায় শ্বাসপতন রুদ্ধ হইল। এই সময়ে ঘটনাক্রমে দশজন পাঠান অশ্বারোহী সৈন্য আসিয়া ঐ স্থানে ঘোড়া হইতে নামিল। একজন পরম রূপবান্, তেজঃপুঞ্জ সন্ন্যাসী বৃক্ষতলে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া আছেন, আর তাঁহার নিকটে পাঁচজন লোক বসিয়া আছে, এই দৃশ্য দেখিয়াই তাহাদের মনে ঘোর সন্দেহ হইল—এই সন্ন্যাসীর নিকটে নিশ্চয়ই অনেক স্বর্ণমুদ্রাদি ছিল। সেই লোভে এই পাঁচজন দস্যু সন্ন্যাসীকে ধুতুরা খাওয়াইয়া মারিয়া ফেলিয়া তাহার সমস্ত ধন হরণ করিয়াছে। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াই পাঠান অশ্বারোহীরা মহাপ্রভুর সঙ্গী পাঁচজনকে বাঁধিয়া ফেলিল এবং তলোয়ার খুলিয়া তাহাদিগকে কাটিতে উদ্যত হইল।

সহসা এইরূপ অতর্কিত ভাবে আক্রান্ত হইয়া মহাপ্রভুর সঙ্গী "গৌড়িয়া" তিনজন ভীত হইয়া পড়িলেন, কিন্তু রাজপুত কৃষ্ণদাস ও সনোরিয়া ব্রাহ্মণ ভীত হইলেন না। সনোরিয়া ব্রাহ্মণ পাঠানদের বলিলেন—তোমাদের বাদশাহের দোহাই, যদি তোমরা আমাদের কোনও অনিষ্ট কর। চল, এখনই শিকদারের নিকট গিয়া এ বিষয়ের নিষ্পত্তি করিব। আমি মাথুর ব্রাহ্মণ, বাদশাহের দরবারে বহুলোক আমার জানাশুনা আছে। এই সন্ন্যাসী আমার গুরু, ইঁহার মূর্ছারোগ, সেইজন্যই সময় সময় এমন অচেতন হইয়া পড়েন। তোমাদের যদি আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, তবে ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, আমার গুরুর চেতনা হইলেই সব কথা জানিতে পারিবে।

পাঠানেরা কহিল—তোমার কথা আমাদের বিশ্বাস হয় না। তোমরা দুইজন পশ্চিমা, আর এই তিনজন 'গৌড়িয়া'—তোমরা যুক্তি করিয়া সন্ন্যাসীকে মারিয়া তাহার ধন অপহরণ করিয়াছ।

নির্ভীক রাজপুত কৃষ্ণদাস দেখিলেন, একটু ভয় না দেখাইলে পাঠানেরা

নিরস্ত হইবে না। তিনি পাঠানদিগকে কহিলেন—আমার ঘর নিকটের এই গ্রামেই, আমি যে-সে লোক নহি, আমার অধীনে একশত তুরকী সৈন্য ও দুই-শত কামান আছে। আমি যদি এখনই তাহাদের ডাকি, তাহারা আসিয়া তোমাদের ঘোড়া ইত্যাদি তো কাড়িয়া লইবেই, প্রাণেও মারিয়া ফেলিবে। 'গৌড়িয়ারা' তো বাটপাড় নহে, তোমরাই বাটপাড়। তোমরাই তীর্থবাসীদের লুণ্ঠন ও হত্যা করিতে চাহিতেছ।

কৃষ্ণদাসের এই নির্ভীক স্পষ্ট কথা শুনিয়া পাঠানদের মনে একটু সঙ্কোচ হইল, তাহারা ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। এমন সময় মহাপ্রভু বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া পাইলেন এবং উঠিয়া "হরি হরি" বলিয়া প্রেমের আবেগে নৃত্য করিতে লাগিলেন। পাঠানেরা এই দৃশ্য দেখিয়া বিস্মিত হইল এবং পাঁচজনের বন্ধন খুলিয়া মুক্ত করিয়া দিল। বলভদ্র ভট্টাচার্য মহাপ্রভুকে শান্ত করিয়া সেই স্থানে বসাইলেন। পাঠান অশ্বারোহীদের দেখিয়া মহাপ্রভুও আত্মসংবরণ করিলেন।

পাঠানেরা মহাপ্রভুকে বলিল—এই পাঁচজন ঠক, প্রবঞ্চক; ইহারা তোমাকে ধুতুরা খাওয়াইয়া অজ্ঞান করিয়া তোমার ধন হরণ করিয়াছে।

মহাপ্রভু হাসিয়া বলিলেন—তোমরা ভুল বুঝিয়াছ, ইহারা প্রবঞ্চক নহে, আমার সঙ্গী। আর আমি সন্ন্যাসী, আমার নিকট এক কপর্দকও নাই যে, ইহারা অপহরণ করিবে। আমার মৃগী ব্যাধি আছে। সেই জন্য মাঝে মাঝে অচেতন হইয়া পড়ি। ইঁহারা পাঁচ জনে আমাকে পরম যত্নে রক্ষা করেন।

পাঠানদের মধ্যে একজন কৃষ্ণবস্ত্রপরিহিত গম্ভীরপ্রকৃতির লোক ছিলেন। পাঠানেরা তাঁহাকে পীর বলিত। মহাপ্রভুর রূপ দেখিয়া ও তাঁহার কথা শুনিয়া তাঁহার মনে শ্রদ্ধা হইল। তিনি মহাপ্রভুর সঙ্গে ধর্মশাস্ত্র লইয়া বিচার আরম্ভ করিলেন। কিছুক্ষণ বিচারে মহাপ্রভুর কথায় তাঁহার চিত্তে ভক্তির সঞ্চার হইল। মহাপ্রভুকে শ্রদ্ধাভরে প্রণাম করিয়া তিনি কহিলেন—জ্ঞানী বলিয়া আমার বড় অভিমান ছিল, কিন্তু তোমার কথায় আজ আমার সে অভিমান দূর হইল। আজ হইতে তুমি আমার গুরু।

কথিত আছে সেই হইতে ঐ জ্ঞানী পাঠান পরম কৃষ্ণভক্ত হইলেন। তাঁহার নাম হইল 'রামদাস'।

মহাপ্রভুর সঙ্গে জ্ঞানী পাঠানের যখন কথাবার্তা হইতেছিল, সেই সময় বিজুলী খান নামক আর একজন পাঠান সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিজুলী খাঁ তরুণবয়স্ক, তিনি রাজপুত্র, অন্যান্য পাঠানেরা তাঁহারই ভৃত্য। মহাপ্রভুকে দেখিয়া ও তাঁহার কথা শুনিয়া বিজুলী খানের মনেও ভক্তির উদয় হইল এবং তিনিও মহাপ্রভুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। সমসাময়িক গ্রন্থাদি হইতে জানা যায়, বিজুলী খাঁ দিল্লীর বাদশাহ সেকেন্দর লোদীর বংশীয়

ছিলেন এবং তাঁহার পিতা একটি বড় পরগণার জায়গীরদার ছিলেন। মহাপ্রভুর ভক্ত হইয়া বিজুলী খাঁর মনে ক্রমে ভক্তিভাব খুব প্রবল হইয়া উঠে এবং রাজ্য ঐশ্বর্যের প্রতি তাঁহার বিতৃষ্ণা জন্মে। কথিত আছে যে, পরিণত বয়সে তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে যাইয়া বাস করিতে থাকেন।

বিজুলী খাঁ ও তাঁহার পাঠান অনুচরদের বিদায় দিয়া মহাপ্রভু সৌরক্ষেত্রে আসিয়া স্নান করিলেন এবং গঙ্গাতীরের পথে প্রয়াগের দিকে অগ্রসর হইলেন। কিছুদূর আসিয়া তিনি কৃষ্ণদাস ও সনোরিয়া ব্রাহ্মণকে বিদায় দিলেন। তাঁহারা দুইজনে বলিলেন—প্রভু, আমরা তোমার সঙ্গে প্রয়াগ পর্যন্ত যাইব। এ পাঠান-অধিকৃত দেশ, পথে ঘাটে সর্বদাই এখানে নানা বিপদের সম্ভাবনা। সঙ্গে বলভদ্র ভট্টাচার্য আছেন বটে, কিন্তু তিনি ব্রাহ্মণপণ্ডিত মানুষ, চটপট কথা বলিতে জানেন না। অতএব আমাদের সঙ্গে যাওয়া প্রয়োজন। বিশেষতঃ আবার কবে তোমার দর্শন পাইব, তাহার তো ঠিক নাই, যতক্ষণ সঙ্গে থাকি, ততক্ষণই লাভ।

মহাপ্রভু তাঁহাদের কথা শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন, কহিলেন,—বেশ, তোমাদের যদি এইরূপই ইচ্ছা হয়, তবে প্রয়াগ পর্যন্ত চল।

কৃষ্ণদাস ও সনোরিয়া ব্রাহ্মণ মহাপ্রভুর কথায় আহ্লাদিত হইলেন।

মহাপ্রভু তাঁহার সঙ্গিগণ সহ প্রয়াগের পথে চলিতে লাগিলেন। যে যে গ্রাম দিয়া মহাপ্রভু যাইতেছিলেন, সেখানেই তিনি হরিনাম প্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহার অপূর্ব ভক্তি ও প্রেমদর্শনে সহস্র সহস্র গ্রামবাসী কৃষ্ণভক্ত হইল। এইরূপে মহাপ্রভু প্রয়াগ তীর্থে আসিয়া উপনীত হইলেন এবং মকর সংক্রান্তিতে গঙ্গাযমুনা-সঙ্গমে স্নান করিলেন। বলভদ্র ভট্টাচার্যেরও বহু দিনের সাধ পূর্ণ হইল।

মহাপ্রভু দশ দিন প্রয়াগ তীর্থে অবস্থান করিলেন। এই সময়ে রূপ গোস্বামী সংসার ত্যাগ করিয়া প্রয়াগে আসিয়া মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হন। তাহার কিছুদিন পরেই সনাতন গোস্বামীও সংসার ত্যাগ করিয়া কাশীতে মহাপ্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। পরম পণ্ডিত ভক্তশ্রেষ্ঠ রূপ-সনাতনের জীবন-কথা এতই মহান্ যে, তাহা শুনিলে মন পবিত্র হয়। সুতরাং পরবর্তী অধ্যায়ে তাঁহাদেরই কথা একটু বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করিব।

১৭

রূপ সনাতন

পূর্বেই বলিয়াছি, রূপ সনাতন দুই ভাইই গৌড়ের বাদশাহ হুসেন শাহের মন্ত্রী ছিলেন। রাজকার্যে তাঁহাদের খুব দক্ষতা ছিল, বাদশাহেরও তাঁহারা খুব প্রিয়পাত্র ছিলেন। গৌড় হইতে কিছু দূরে রামকেলি গ্রামে তাঁহাদের পৈতৃক বাসভূমি ছিল, কিন্তু রাজকার্যের জন্য গৌড় নগরেই অধিকাংশ সময় তাঁহাদের থাকিতে হইত। দুই ভাই মন্ত্রিত্ব করিয়া প্রভূত ধনসম্পত্তিও অর্জন করিয়াছিলেন।

মহাপ্রভু রামকেলি হইতে বিদায় গ্রহণ করিলে, রূপ সনাতনের মন সংসারে উদাসীন হইয়া উঠিল, বিষয় কার্যে মন আর বসিতে চাহে না। সমস্ত ত্যাগ করিয়া কবে তাঁহারা একান্তভাবে ভগবানের শরণ লইবেন, এই চিন্তাই তাঁহাদের মনে প্রবল হইয়া উঠিল। কিন্তু বিষয় ত্যাগ করিতে চাহিলেই তো হয় না, তাহাতে অনেক বাধা আছে। প্রথমতঃ বাদশাহ জানিতে পারিলে, কিছুতেই তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দিবেন না। দ্বিতীয়তঃ আত্মীয় বন্ধু বান্ধব কুটুম্ব, যাহারা তাঁহাদের উপর নির্ভর করিয়া আছে, তাহাদেরও সান্ত্বনা দিতে হইবে। তৃতীয়তঃ এত ধনসম্পত্তি, ইহারও সদ্ব্যয়ের একটা ব্যবস্থা করা উচিত। এই সমস্ত চিন্তা করিয়া দুই ভাই বিশেষ সাবধানতার সহিত, ক্রমে ক্রমে মনের ইচ্ছা কার্যে পরিণত করাই স্থির করিলেন।

গৌড় নগরে দুই ভাইয়ের বহু ধন সঞ্চিত ছিল। একদিন সকলের অজ্ঞাতে, রূপ গোঁসাই নৌকাতে ভরিয়া সেই ধনের অধিকাংশ রামকেলি গ্রামে নিজগৃহে লইয়া আসিলেন এবং তাহার সদ্ব্যয়ের ব্যবস্থা করিলেন। ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব সজ্জনদের কিয়দংশ দান করিলেন, কিয়দংশ কুটুম্বদের পোষণের জন্য রাখিলেন এবং অপর কিয়দংশ 'দন্ডবন্ধ' বা রাজশাসন, আপদ বিপদের জন্য সঞ্চয় করিলেন। এই টাকার অধিকাংশই সদ্-ব্রাহ্মণগৃহস্থদের নিকট গচ্ছিত রহিল। গৌড়নগরে দশ হাজার মুদ্রা বণিকদের নিকট গচ্ছিত রহিল। সনাতন এই অর্থ প্রয়োজন মত ব্যয় করিতে লাগিলেন। এই সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া রূপ গোস্বামী নীলাচলে মহাপ্রভুর নিকট দুইজন লোক পাঠাইলেন,—মহাপ্রভু যখন বৃন্দাবন যাত্রা করেন, তাহারা তাহা জানিয়া আসিয়া সংবাদ দিবে।

কিছুদিন পরে চর দুইজন নীলাচল হইতে ফিরিয়া আসিয়া রূপ গোস্বামীকে সংবাদ দিল যে, মহাপ্রভু বৃন্দাবন যাত্রা করিয়াছেন। রূপ গোস্বামী তখনই গৌড়ে সনাতনের নিকটে পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন যে, মহাপ্রভু

বৃন্দাবন যাত্রা করিয়াছেন,—আমি ও বল্লভ (রূপ সনাতনের অনুজ—ইঁহার আর এক নাম অনুপম) তাঁহার অনুসরণ করিলাম। তুমিও যত শীঘ্র পার চলিয়া আসিবে। গৌড় নগরে বণিকের নিকটে দশ হাজার মুদ্রা গচ্ছিত আছে, যদি প্রয়োজন হয়, তাহাই দিয়া মুক্তি ক্রয় করিবে।

রূপ গোস্বামী মহাপ্রভুকে দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি ধীর প্রকৃতির লোক, এই ব্যাকুলতার মধ্যেও কর্তব্যবুদ্ধি হারান নাই। সব দিক ভাবিয়া চিন্তিয়া, নিজের ও সনাতনের জন্য সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক করিয়া গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন।

রূপ গোস্বামী ও তাঁহার অনুজ বল্লভ মহাপ্রভুকে পথে ধরিতে পারিলেন না, কারণ মহাপ্রভু নীলাচল হইতে বনপথে বৃন্দাবন যাত্রা করিয়াছিলেন,— আর রূপ গোস্বামী গিয়াছিলেন, বাঙ্গালাদেশ হইতে গঙ্গাতীরের পথে। মহাপ্রভু যখন বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া প্রয়াগ তীর্থে আসিলেন, সেই সময়ে রূপ গোস্বামী তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইলেন। কিন্তু মহাপ্রভুর দর্শন লাভ করা রূপ গোস্বামীর পক্ষে সহজ হইল না। মহাপ্রভু যেখানেই যান, সহস্র সহস্র লোক সেই খানেই ভিড় করে, লোকসংঘট্টের সেই দুর্ভেদ্য দুর্গ অতিক্রম করিয়া বাহিরের কাহারও পক্ষে মহাপ্রভুর সঙ্গে নির্জনে সাক্ষাৎ করা এক প্রকার অসম্ভব। প্রয়াগেও ঠিক সেই ব্যাপার ঘটিয়াছিল। চরিতামৃতকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর ভাষাতেই তাহা বর্ণনা করি :—

প্রভু চলিয়াছেন বিন্দুমাধব দর্শনে।
লক্ষ লক্ষ লোক আইসে প্রভুর মিলনে॥
কেহ কান্দে কেহ হাসে কেহ নাচে গায়।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি কেহ গড়াগড়ি যায়॥
গঙ্গা যমুনা প্রয়াগ নারিল ডুবাইতে।
প্রভু ডুবাইলা কৃষ্ণপ্রেমের বন্যাতে॥
প্রেমাবেশে নাচে প্রভু হরিধ্বনি করি।
ঊর্ধ্ব বাহু করি বলে বল হরি হরি॥
প্রভুর মহিমা দেখি লোকে চমৎকার।
প্রয়াগে প্রভুর লীলা নারি বর্ণিবার॥

এই ভিড়ের মধ্যে রূপ গোস্বামী মহাপ্রভুকে দর্শন করিবেন কিরূপে? অবশেষে একটা উপায় হইল। স্থানীয় অধিবাসী একজন দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণ মহাপ্রভুকে চিনিতেন—মহাপ্রভুর বিন্দুমাধব দর্শন শেষ হইলে, সেই ব্রাহ্মণ আসিয়া মহাপ্রভুকে স্বগৃহে নিমন্ত্রণ করিলেন। মহাপ্রভু নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া

ব্রাহ্মণের গৃহে গেলেন—লোকের ভিড়ও অগত্যা কমিয়া গেল। এই সময়ে রূপ গোস্বামী ছোট ভাই বল্লভ বা অনুপমকে সঙ্গে করিয়া মহাপ্রভুর সম্মুখে গিয়া দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিলেন। পূর্বেই বলিয়াছি, রূপ সনাতন দুই ভাই নিজেদের নীচ পতিত বলিয়া মনে করিতেন। রূপ গোস্বামী এই ভাবের বশবর্তী হইয়া মহাপ্রভুর চরণস্পর্শ করিতে সাহস পাইলেন না, দীনাতিদীনের মত তাঁহার অনুমতির অপেক্ষায় ভূমিতলে পড়িয়া রহিলেন।

মহাপ্রভু রূপের এই ভাব দেখিয়া আনন্দিত হইলেন এবং দুই ভাইকে উঠাইয়া প্রেমভরে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। কহিলেন, কেবল মাত্র বংশ ও জাতির বিচারে কেহ উচ্চ বা নীচ হয় না। যে ভগবানের ভক্ত সে নীচজাতি চণ্ডাল হইলেও শ্রেষ্ঠ, সকলের পূজনীয়;—আর যে ভগবদ্ভক্তিহীন, সে উচ্চ জাতি ব্রাহ্মণ হইলেও পতিত। প্রিয়তম রূপ, তুমি আমার কাছে নীচ বা পতিত নহ, তুমি শ্রেষ্ঠ ভক্ত, আমার পূজ্য।

তারপর মহাপ্রভু রূপ গোস্বামীকে সাদরে নিকটে বসাইয়া কহিলেন—শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তোমার সংসার-বন্ধন ছিন্ন হইয়াছে, এ সৌভাগ্যের কথা। কিন্তু সনাতনের কি অবস্থা হইল, তাহা জানিবার জন্য আমার মন উৎকণ্ঠিত হইয়াছে।

রূপ কহিলেন—সনাতন রাজকার্য ত্যাগ করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু বাদশাহ জানিতে পারিয়া তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছেন। এখন তুমি যদি দয়া কর, তবেই সনাতনের উদ্ধার হয়।

মহাপ্রভু হাসিয়া বলিলেন—আমি তোমাকে বলিতেছি, সনাতনেরও সংসার-বন্ধন ক্ষয় হইয়াছে, তিনিও শীঘ্রই আসিবেন।

এইরূপে কথা বলিতে বলিতে মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় আসিয়া উপস্থিত হইল। দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণ রূপ ও বল্লভকেও নিমন্ত্রণ করিলেন।

সেই সময়ে প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব গোস্বামী ও পণ্ডিত, ভাগবতের টীকাকার বল্লভ ভট্ট প্রয়াগের নিকটে আউনী গ্রামে বাস করিতেছিলেন। মহাপ্রভুর কথা তিনি জানিতেন। মহাপ্রভু প্রয়াগে আসিয়াছেন জানিয়া, পরদিন তিনি মহাপ্রভুকে দর্শন করিতে আসিলেন। দুইজনে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিলেন, তারপর কৃষ্ণকথার আলোচনা হইল। রূপ ও বল্লভ দুই ভাই বল্লভ ভট্টকে ভক্তিভরে দূর হইতে প্রণাম করিলেন। বল্লভ ভট্ট তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিতে গেলেন, কিন্তু তাঁহারা আরও দূরে সরিয়া বলিলেন—আমরা নীচ অস্পৃশ্য, আপনি আমাদের স্পর্শ করিবেন না। বল্লভ ভট্ট ইহাতে বিস্মিত হইলেন। তাঁহার বিস্ময় দেখিয়া মহাপ্রভু হাসিয়া কহিলেন—ভট্ট, তুমি ইঁহাদের স্পর্শ করিও না, কেননা, ইঁহারা অতি হীন জাতি, আর তুমি শ্রেষ্ঠ কুলীন ব্রাহ্মণ,—তুমি বৈদিক যাজ্ঞিক পণ্ডিত, আর ইঁহারা নিরন্তর মুখে কৃষ্ণ নাম করিয়া থাকেন।

বল্লভ ভট্ট পণ্ডিত বুদ্ধিমান্। মহাপ্রভুর এই রহস্যময় ঈষৎ শ্লেষপূর্ণ বাক্য শুনিয়া তিনি ব্যাপারটা বুঝিতে পারিলেন; কহিলেন,—সে কি কথা, ইঁহারা নীচ পতিত হইবেন কেন? ইঁহাদের মুখে যখন সর্বদা কৃষ্ণনাম, তখন ইঁহারা তো অধম নহেন, বরং সর্বোত্তম, সকলের শ্রেষ্ঠ!

মহাপ্রভু বল্লভ ভট্টের কথা শুনিয়া পরম আনন্দিত হইয়া তাঁহার বহু প্রশংসা করিলেন।

মহাপ্রভুর অপূর্ব সৌন্দর্য, ভগবৎপ্রেম এবং মধুর বাণী শুনিয়া বল্লভ ভট্টের মন শ্রদ্ধায় নত হইল। তিনি মহাপ্রভুকে স্বগৃহে নিমন্ত্রণ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে রূপ ও বল্লভ দুই ভাইকেও নিমন্ত্রণ করিলেন। মহাপ্রভু সদলবলে বল্লভ ভট্টের সঙ্গে তাঁহার গৃহে চলিলেন। বল্লভ ভট্টের গৃহে যাইতে হইলে যমুনা নদী পার হইতে হয়। কিন্তু এই খানেই একটা বিপদ ঘটিল। মহাপ্রভু নৌকায় চড়িয়া যমুনা পার হইবার সময় যমুনার নীল জল দেখিয়া কৃষ্ণরূপ স্মরণ করিয়া প্রেমে আবিষ্ট হইলেন এবং সেই অবস্থাতে যমুনার জলে ঝাঁপ দিলেন। তখনই সকলে মিলিয়া জল হইতে তাঁহাকে টানিয়া তুলিল। কিন্তু নৌকার উপর উঠিয়াও মহাপ্রভুর আবেশ কাটিল না, তিনি কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া নৌকার উপরেই নৃত্য করিতে লাগিলেন। ভক্তগণ অনেক কষ্টে মহাপ্রভুকে শান্ত করিলেন, মহাপ্রভুও দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া অবশেষে আত্ম-সংবরণ করিলেন।

বল্লভ ভট্ট পরম সমাদরে মহাপ্রভু ও তাঁহার সঙ্গিগণের সেবা করিলেন। ভগবৎকথা, কীর্তন ও নৃত্যে সেখানে কিছুকাল যাপন করিয়া মহাপ্রভু আবার প্রয়াগে ফিরিয়া আসিলেন। সেই অল্প সময়ের মধ্যেই আউনী গ্রামের বহু-লোক মহাপ্রভুর কৃপায় কৃষ্ণভক্ত হইল।

প্রয়াগে আসিয়া মহাপ্রভু নির্জন স্থান দশাশ্বমেধঘাটে রূপ গোস্বামীকে লইয়া বসিলেন এবং তাঁহাকে ভক্তিশাস্ত্র শিক্ষা দিলেন। দশদিন ধরিয়া এই শিক্ষা দান কার্য চলিল। রূপ গোস্বামী পণ্ডিত ও বুদ্ধিমান্, তিনি সহজেই মহাপ্রভুর শিক্ষা হৃদয়ঙ্গম করিলেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে আজ্ঞা দিলেন—তুমি বৃন্দাবনে যাইয়া বাস কর, সেখানকার লুপ্ত তীর্থসমূহ উদ্ধার কর এবং প্রেমধর্ম প্রচার কর। রূপ গোস্বামী মহাপ্রভুর আজ্ঞা শিরে ধারণ করিয়া তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া প্রয়াগ হইতে বৃন্দাবনে যাত্রা করিলেন। মহা-প্রভুও প্রয়াগ হইতে কাশী ফিরিয়া আসিলেন।

এদিকে গৌড়নগরে সনাতন গোস্বামী কি উপায়ে রাজকার্য ত্যাগ করেন, ভাবিতে লাগিলেন। তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন—বাদশাহ আমাকে যে এত ভালবাসেন, ইহা আমার পক্ষে সংসার ত্যাগের প্রধান অন্তরায়। অতএব এমন কিছু করিতে হইবে, যাহাতে বাদশাহ আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হন। তাহা

হইলেই রাজকার্য হইতে তিনি আমাকে অবসর দিবেন। এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া সনাতন অস্বাস্থ্যের ভাণ করিয়া নিজ গৃহে বসিয়া রহিলেন। রাজকার্য করিতে তিনি আর যান না, তাঁহার অধীনস্থ কায়স্থ কর্মচারীরাই তাহা করে। আর তিনি বাড়ীতে বসিয়া পণ্ডিতদের সঙ্গে সর্বদা ভাগবত শাস্ত্র আলোচনা করেন।

বাদশাহ মন্ত্রী সনাতনকে কিছুদিন না দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইলেন। চর পাঠাইয়া তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেও তিনি আসিলেন না, সংবাদ দিলেন যে তাঁহার শরীর অসুস্থ। বাদশাহ এই সংবাদ পাইয়া নিজেই একদিন একজন-মাত্র অনুচর সঙ্গে লইয়া, মন্ত্রী সনাতনের গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সনাতন তখন পণ্ডিতদের লইয়া ভাগবত বিচার করিতেছিলেন। বাদশাহকে দেখিয়া আস্তেব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং সসম্ভ্রমে তাঁহাকে আসনে বসাইলেন।

বাদশাহ কহিলেন—শুনিলাম, তোমার শরীর অসুস্থ, একজন বৈদ্যও সেজন্য তোমাকে দেখিবার জন্য পাঠাইলাম। কিন্তু বৈদ্য গিয়া কহিল—তোমার কোন ব্যাধি নাই, বেশ সুস্থ আছ। আমি নিজেও তাহাই দেখিতেছি। অথচ তুমি রাজকার্যে যাও না, ঘরে বসিয়া আছ। তোমার মনের অভিপ্রায় কি, স্পষ্ট কথায় আমাকে বল। তুমি জান যে, আমার সমস্ত রাজকার্য তোমার উপর নির্ভর করে, তোমাকে ব্যতীত আর কাহাকেও আমি বিশ্বাস করিতেও পারি না।

বাদশাহের মুখে এইসব কথা শুনিবার জন্য সনাতন প্রস্তুত হইয়াই ছিলেন। তিনি উত্তর দিলেন—আমার দ্বারা রাজকার্য আর চলিবে না; কেন না, আমার মন ঐদিকে মোটেই আকৃষ্ট হইতেছে না। আমার পরিবর্তে, বরং অন্য কোন যোগ্য লোক নিযুক্ত করিয়া আপনি রাজকার্য চালাইবার ব্যবস্থা করুন।

বাদশাহ সনাতনের মুখে এই কবুল জবাব শুনিয়া বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—তোমার বড় ভাই আমার সর্বনাশ করিয়াছে, তুমিও এখন তাহাই করিতে চাহিতেছ। কিন্তু আমি তোমাকে কিছুতেই ছাড়িব না।

সনাতন বলিলেন—বাদশাহ, যে যে-কর্ম করে, সে তাহার ফল ভোগ করিতে বাধ্য। আমি যদি দোষ করিয়া থাকি, তবে আপনি আমাকে উপযুক্ত দণ্ড দিতে পারেন।

বাদশাহের ধৈর্যচ্যুতি হইল। তিনি সনাতনকে রাজকারাগারে বন্দী করিলেন। কিন্তু কারাগারে বন্দী থাকিয়াও সনাতনের মনের পরিবর্তন হইল না; বাদশাহ তাঁহাকে কিছুতেই রাজকার্যে যোগ দিতে সম্মত করিতে পারিলেন না। ইহারই কিছুদিন পরে উড়িষ্যার রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য বাদশাহকে যাইতে হইল। সনাতন গোস্বামীকেও তিনি সঙ্গে লইতে চাহিলেন,

কিন্তু সনাতন যাইতে অস্বীকার করিলেন। অগত্যা তাঁহাকে বন্দী অবস্থায় রাখিয়াই বাদশাহ উড়িষ্যার সীমান্তে যুদ্ধ করিতে গমন করিলেন।

সনাতন কারাগারে বসিয়া ভগবানের নাম জপ করিতেছেন, এমন সময় রূপ গোস্বামীর পত্র পাইলেন। পত্র পাইয়াই তিনি পলায়নের উপায় স্থির করিয়া ফেলিলেন। সেই কারাগারে যে পাঠান প্রহরী ছিল, তাহাকে ডাকিয়া নানারূপ মিষ্টবাক্যে তাহার মন ভুলাইয়া বলিলেন—ভাই, তুমি জিন্দাপীর, সিদ্ধপুরুষ। কোরাণ হদিশ প্রভৃতি শাস্ত্রে তোমার যথেষ্ট জ্ঞান আছে। তুমি তো জান, নিজের অর্থ ব্যয় করিয়াও যদি একজন বন্দীকে মুক্ত করা যায়, তবে তাহাতে কত পুণ্য হয়। এর পূর্বে আমি তোমার অনেক উপকার করিয়াছি। এখন তুমি আমাকে কারাগার হইতে ছাড়িয়া, সেই ঋণ শোধ কর। আমি কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ তোমাকে পাঁচ হাজার মুদ্রা দিব।

পাঠান রক্ষী কহিল—আমি যদি এই কার্য করি, তবে বাদশাহ আর আমাকে আস্ত রাখিবেন না। এ কার্য আমার দ্বারা অসম্ভব।

সনাতন রক্ষীকে বুঝাইয়া বলিলেন—বাদশাহ এখন গৌড়ে নাই। উড়িষ্যা-সীমান্তে যুদ্ধ করিতে গিয়াছেন। তিনি ফিরিয়া আসিবেন কি না সন্দেহ; যদি বা ফিরিয়া আসেন, কহিও, সনাতন শৌচ করিবার অছিলায় গিয়া গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া পলায়ন করিয়াছে, বহু অনুসন্ধানেও তাহাকে পাওয়া গেল না। পায়ের বেড়ীসহই সে পলায়ন করিয়াছে। আর আমি পলায়ন করিতে পারিলে এদেশে থাকিব না, একেবারে মক্কায় চলিয়া যাইব। সুতরাং তোমার ভয়ের কোনই কারণ নাই।

পাঠান রক্ষীর মনে লোভ হইল, তথাপি সে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। সনাতন তখন বণিকের গৃহ হইতে সাত হাজার মুদ্রা আনিয়া পাঠান রক্ষীকে দিলেন। এবার রক্ষীর মন ফিরিয়া গেল, সাত হাজার মুদ্রার লোভ সে সংবরণ করিতে পারিল না। সেই রাত্রিতেই পায়ের বেড়ী কাটিয়া দিয়া পাঠান রক্ষী সনাতনকে গঙ্গাপার করিয়া দিল।

গঙ্গাপার হইয়া সনাতন অবিশ্রাম দিন রাত্রি বৃন্দাবনের পথে চলিতে লাগিলেন। তিনি পলাতক রাজবন্দী, সুতরাং সদর রাজপথ দিয়া যাইবার উপায় তাঁহার নাই। বন জঙ্গল পাহাড় পর্বতের মধ্য দিয়াই তাঁহাকে যাইতে হইয়াছিল। সঙ্গে ছিল, একটি মাত্র ভৃত্য—নাম ঈশান। এইরূপে চলিতে চলিতে তাঁহারা পাতড়া পর্বতের প্রান্তে আসিয়া উপনীত হইলেন। এই পর্বত অতিক্রম না করিয়া অগ্রসর হইবার উপায় নাই। কিন্তু পথও তাঁহারা চিনেন না। সনাতন পর্বতপ্রান্তবাসী এক ভূমিকের নিকট গিয়া পথের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

ভূমিক সনাতনের প্রশ্নের কোন উত্তর দিল না। কিন্তু তাহার নিকটে

একজন হাতগণক ছিল, সে ভূমিকের কাণে কাণে গিয়া বলিল—ইহার নিকট আটটি সুবর্ণ মোহর আছে।

শুনিবা মাত্রই ভূমিক মনে মনে আনন্দিত হইল এবং সনাতনকে কহিল, গোঁসাই, আপনি যখন আমার কাছে আসিয়াছেন, তখন চিন্তার কোন কারণ নাই। আপনি রন্ধনাদি করিয়া আহার করুন, বিশ্রাম করুন—আমি নিজে লোক দিয়া রাত্রে আপনাকে পর্বত পার করিয়া দিব।

সনাতন এ প্রস্তাবে সম্মত হইয়া স্নান করিলেন। তারপর রন্ধনাদি করিয়া আহার করিলেন। ভূমিক তাঁহাকে খুবই সমাদর করিল। কিন্তু সনাতন রাজমন্ত্রী ছিলেন, বুদ্ধিমান্ লোক—তিনি ভূমিকের এই "অতিভক্তিতে" মনে মনে সন্দিহান হইলেন। তাঁহার নিজের কাছে তো এক কপর্দকও নাই। তবে কি ঈশানের সঙ্গে অর্থ আছে, সেই লোভেই ভূমিক এত সমাদর করিতেছে? এই ভাবিয়া ঈশানকে ডাকিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নিকট ধনরত্ন কিছু আছে কি? ঈশান স্বীকার করিল, তাঁহার নিকটে সাতটি স্বর্ণমুদ্রা আছে। দুর্গমপথ, কখন কি প্রয়োজন হয় বলা যায় না, সেই জন্যই সঙ্গে আনিয়াছে।

সনাতন বিষম বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—তুমি অত্যন্ত মূঢ়। চোর ডাকাতদের মধ্য দিয়া পথ চলিয়াছি। এই সব ধনরত্ন সঙ্গে থাকিলে যে প্রাণে মারা যাইতে হইবে! সনাতন সেই সাতটি মোহর ঈশানের নিকট হইতে লইয়া ভূমিকের কাছে গিয়া বলিলেন—আমার কাছে এই সাতটি সোনার মোহর ছিল, ইহাই লইয়া আপনি আমাকে পর্বত পার করিয়া দিন।

ভূমিক হাসিয়া বলিল—গোঁসাই, তুমি বুদ্ধিমান্ লোক, ভাল কাজ করিয়াছ। আমি জানিতাম, তোমার কাছে স্বর্ণমুদ্রা আছে এবং ইহার জন্য রাত্রে তোমাকে হত্যা করিতাম।—ভাল হইল, তুমি আমাকে সেই পাপ হইতে রক্ষা করিয়াছ। এজন্য তোমার সোনার মোহর আমি আর লইব না, তোমাকে এখনই পর্বত পার করিয়া দিব।

সনাতন কিছুতেই ছাড়িলেন না, অনেক বলিয়া কহিয়া ভূমিকের হাতে তিনি সেই সাতটি সোনার মোহর দিলেন। ভূমিকও সনাতনের বিনয় ও মধুর বচনে সন্তুষ্ট হইয়া চারিজন পাইক সঙ্গে দিয়া বনপথের ভিতর দিয়া রাত্রিতে তাঁহাকে পর্বত পার করিয়া দিল। পর্বতের এপারে আসিয়া সনাতন, ভৃত্য ঈশানকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমার নিকট আরও মোহর আছে কি?

ঈশান ভয়ে ভয়ে কহিল—আর একটি মাত্র মোহর আছে।

সনাতন কহিলেন—বেশ, এই মোহর লইয়া তুমি এখন দেশে ফিরিয়া যাও, আমার সঙ্গে আসিবার আর প্রয়োজন নাই। ঈশান কাঁদিতে কাঁদিতে দেশে ফিরিয়া গেল।

সনাতন একা পথ চলিতে লাগিলেন। চলিতে চলিতে কিছু দিন পরে তিনি হাজিপুর সহরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এইখানে সনাতন গোস্বামীর ভগিনীপতি শ্রীকান্ত রাজকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। সনাতন গোস্বামীর সঙ্গে সন্ধ্যার পর তাঁহার দেখা হইল। সনাতন তাঁহাকে পলায়নের বৃত্তান্ত সমস্তই কহিলেন। শ্রীকান্ত শুনিয়া বলিলেন—তোমার সঙ্গে দেখা হইয়া ভালই হইল। তুমি দুই দিন এখানে থাক। ভিক্ষুকের বেশ ছাড়িয়া ভদ্রবেশ পরিধান কর।

কিন্তু সনাতন মহাপ্রভুর দর্শনের জন্য ব্যাকুল,—বিশ্রাম বা উত্তম বেশভূষা কোন কিছুর চিন্তাই তাঁহার মনে স্থান পাইতেছিল না। তিনি কেবল শ্রীকান্তকে সেই রাত্রেই তাঁহাকে গঙ্গাপার করিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। শ্রীকান্ত অগত্যা তাহাই করিলেন, কিন্তু বিদায়ের সময় বহু অনুরোধ উপরোধ করিয়া একখানি ভোট-কম্বল সনাতনের গায়ে জড়াইয়া দিলেন।

সনাতন চলিতে চলিতে বারাণসী আসিয়া শুনিলেন যে, মহাপ্রভু সেখানে আছেন। শুনিয়া তিনি মহা আনন্দিত হইলেন। সন্ধান করিয়া জানিলেন, মহাপ্রভু বৈদ্য চন্দ্রশেখরের গৃহে আছেন। সনাতন মহাপ্রভুর দর্শন লাভ করিবার জন্য চন্দ্রশেখরের গৃহদ্বারে গিয়া বসিয়া রহিলেন। এদিকে সনাতনের আগমনবার্তা মহাপ্রভু জানিতে পারিয়া চন্দ্রশেখরকে বলিলেন—তুমি বহির্দ্বারে গিয়া দেখ, কোন বৈষ্ণব সেখানে বসিয়া আছেন কিনা। চন্দ্রশেখর বাহিরে যাইয়া দেখিলেন কোন বৈষ্ণব সেখানে নাই। প্রভুর নিকটে গিয়া সংবাদ দিলেন—কোন বৈষ্ণবকে দেখিলাম না, কেবল একজন দরবেশ বাহিরে বসিয়া আছেন বটে!

মহাপ্রভু কহিলেন—সেই দরবেশকেই ভিতরে লইয়া আইস।

চন্দ্রশেখর দরবেশরূপী সনাতনকে ভিতরে ডাকিয়া লইয়া আসিলে প্রভু ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। সনাতনও প্রভুর স্পর্শে প্রেমাবিষ্ট হইলেন, কিন্তু নিজে নীচ পতিত—এই ভাব তাঁহার মন হইতে যায় নাই,—তাই মহাপ্রভুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, প্রভু, আমাকে ছুঁইও না, আমি হীন, অধম পাপী। মহাপ্রভু সনাতনের সে কথায় কাণ না দিয়া তাঁহাকে পরম সমাদরে নিকটে বসাইলেন এবং স্বহস্তে অঙ্গমার্জনা করিতে করিতে বলিলেন—তুমি ভক্তশ্রেষ্ঠ, নিজে পবিত্র হইবার জন্যই তোমার অঙ্গ আমি স্পর্শ করিতেছি। শ্রীকৃষ্ণ যে তোমার সংসার-বন্ধন ছিন্ন করিয়াছেন, এ অতি সৌভাগ্যের কথা।

চন্দ্রশেখর ও তপন মিশ্র উভয়েই এই ব্যাপার দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। মহাপ্রভু সনাতনকে তাঁহাদের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিলেন। তপন মিশ্র সনাতনকে নিজগৃহে নিমন্ত্রণ করিলেন। চন্দ্রশেখরকে মহাপ্রভু বলিলেন—

সনাতনের এই দরবেশ বেশ ত্যাগ করাইয়া তাহার স্নান ও ক্ষৌর কার্যাদির ব্যবস্থা কর।

চন্দ্রশেখর মহাপ্রভুর আজ্ঞামত সনাতনকে গঙ্গাতীরে লইয়া গেলেন এবং ক্ষৌরকার্য ও স্নানের পর তাঁহার পরিবার জন্য একখানি নূতন বস্ত্র আনিয়া দিলেন। সনাতন কিন্তু সে নূতন বস্ত্র গ্রহণ করিলেন না; বলিলেন—আমি গৃহত্যাগী বৈরাগী, নূতন বস্ত্রে আমার কোন প্রয়োজন নাই।

মধ্যাহ্নে মহাপ্রভু সনাতনকে সঙ্গে করিয়া তপন মিশ্রের গৃহে 'ভিক্ষা' করিতে গেলেন। মিশ্রকে কহিলেন,—আগে সনাতনকে ঠাকুরের প্রসাদ দাও, সে বহু পথ হাঁটিয়া শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু সনাতন কিছুতেই সে প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন না। মহাপ্রভুর ভোজনের পর, তিনি তাঁহার প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। সনাতন তখনও সেই আর্দ্র বস্ত্র পরিয়াই ছিলেন। তপন মিশ্র নিজে একখানি নূতন বস্ত্র আনিয়া সনাতনকে তাহা পরিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। এবারও সনাতন তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না। বলিলেন—যদি আমাকে বস্ত্র দিতেই তোমার ইচ্ছা হয়, তবে একখন্ড পুরাতন বস্ত্র দাও। অগত্যা তপন মিশ্র তাহাই করিলেন।

তপন মিশ্রের গৃহেই মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণগণের সঙ্গে সনাতনের পরিচয় হইল। তাঁহারা তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইলেন। একজন সনাতনকে বলিলেন—তুমি যতদিন কাশীতে থাকিবে, আমার গৃহেই তোমার নিমন্ত্রণ রহিল। কিন্তু সনাতন তাহাতে সম্মত হইলেন না, কহিলেন—আমি বৈরাগী, ভিক্ষা করিয়া উদর পূর্ণ করাই আমার উচিত।

যিনি এককালে গৌড়ের বাদশাহের মন্ত্রী ছিলেন এবং ঐশ্বর্য বৈভবের মধ্যে দিনযাপন করিতেন, তাঁহার এই নিষ্কাম বৈরাগ্য, কাহার না শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে? মহাপ্রভুও সনাতনের বৈরাগ্য দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। কিন্তু সনাতনের গায়ে ভগিনীপতি শ্রীকান্তের প্রদত্ত সেই ভোট-কম্বলখানি তখনও ছিল। মহাপ্রভু সেই "ভোট-কম্বলের" দিকে ঘন ঘন চাহিতে লাগিলেন। বুদ্ধিমান্ সনাতন প্রভুর ভাব দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন, ভোট-কম্বলখানি মহাপ্রভুর ভাল লাগিতেছে না। বৈরাগীর দেহে মূল্যবান ভোট-কম্বল মোটেই মানায় না। সনাতন মনে মনে লজ্জিত হইয়া গঙ্গাতীরে গেলেন। সেখানে দেখিলেন, একজন বাঙ্গালী ভিক্ষুক নিজের ছেঁড়া কাঁথা রৌদ্রে শুকাইতেছে। সনাতন তাহাকে কহিলেন—ভাই, আমার একটি উপকার কর। এই ভোট-কম্বলখানি রাখিয়া তার পরিবর্তে তোমার ঐ ছেঁড়া কাঁথাখানি আমাকে দাও।

এই অদ্ভুত প্রস্তাবে ভিক্ষুকের মনে সন্দেহ হইবারই কথা। সে কহিল—আপনি প্রবীণ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি হইয়া আমার ন্যায় দরিদ্রের প্রতি উপহাস

করিতেছেন কেন? আপনার বহুমূল্য ভোট-কম্বলখানি দিয়া তাহার বদলে আপনি আমার ছেঁড়া কাঁথা লইবেন, এ কি একটা বিশ্বাসযোগ্য কথা?

সনাতন হাসিয়া বলিলেন—ভাই, অবিশ্বাস করিও না, আমি সত্য কথাই বলিতেছি। এই ভোট-কম্বলে আমার কোন প্রয়োজন নাই। এই বলিয়া ভোট-কম্বলখানি ভিক্ষুকের হাতে দিয়া তাহার ছেঁড়া কাঁথাখানি গায়ে দিলেন। সনাতন ফিরিয়া আসিলে মহাপ্রভু কহিলেন—একি, তোমার ভোট-কম্বল কোথায় গেল? ছেঁড়া কাঁথাই বা কোথায় পাইলে?

সনাতন সমস্ত বৃত্তান্ত মহাপ্রভুকে বলিলেন। মহাপ্রভু শুনিয়া সানন্দে বলিলেন—ভালই হইয়াছে, ভগবান তোমার মনে বৈরাগ্য সঞ্চার করিয়াছেন। এটুকু ত্রুটিই বা তিনি রাখিবেন কেন?—যে বৈরাগী ভিক্ষা করিয়া খায়, তাহার দেহে বহুমূল্য ভোট-কম্বল মানাইবে কেন?

এইরূপে রাজমন্ত্রী সনাতন বিষয় ত্যাগ করিয়া মহাপ্রভুর চরণে আশ্রয় লইলেন। মহাপ্রভুও তাঁহাকে যোগ্যপাত্র মনে করিয়া দুই মাস কাল পর্যন্ত কাশীতে রাখিয়া, তাঁহাকে বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্ব, কৃষ্ণতত্ত্ব ও রাধাতত্ত্ব শিক্ষা দিলেন। সনাতনকে শিক্ষাদান কালে মহাপ্রভু প্রেমধর্মের যে তত্ত্ব বিবৃত করিয়াছেন, জগতে তাহার তুলনা নাই। শিক্ষাদান শেষ হইলে রূপ গোস্বামীর ন্যায় তাঁহাকেও আদেশ দিলেন—বৃন্দাবনে যাইয়া প্রেম-ধর্ম ও বৈষ্ণব-শাস্ত্র প্রচার কর এবং লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার কর।

রূপ সনাতন দুই ভাই বৃন্দাবনে যাইয়া বাস করিলেন এবং কায়মনোবাক্যে মহাপ্রভুর আদেশ পালন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের দুইজনের কার্যকলাপ এক অদ্ভুত ব্যাপার। সহায় নাই, সম্পদ নাই, বৃন্দাবন তীর্থ তখন লুপ্তপ্রায়। কিন্তু রূপ সনাতন নিজেদের অসাধারণ শক্তি বলে সেই লুপ্ত তীর্থকে উদ্ধার করিলেন; পুনর্বার তাহা সমগ্র ভারতের হিন্দুদের প্রধান তীর্থে পরিণত হইল। তাঁহাদের দুই ভাইয়ের সর্বতোমুখী প্রতিভা, অপূর্ব শাস্ত্রজ্ঞান ও অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁহারা বহু লুপ্ত শাস্ত্র উদ্ধার করিলেন, নিজেরাও সংস্কৃত ভাষায় বহু কাব্য, নাটক ও বৈষ্ণবধর্মগ্রন্থ প্রণয়ন করিলেন। মহাপ্রভুর প্রেম-ধর্মের মূল তত্ত্ব তাঁহারাই প্রথমে গ্রন্থাকারে লিপিবন্ধ করেন। পরবর্তী কালে তাঁহাদের ভ্রাতুষ্পুত্র পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ শ্রীজীব গোস্বামী নানা দার্শনিক গ্রন্থ লিখিয়া সেই কার্যের পূর্ণতা সাধন করেন। রূপ সনাতনের অদ্ভুত বৈরাগ্য ও কঠোর সাধনার কথা চিন্তা করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। বৃন্দাবনে বৃক্ষতলে তাঁহারা বাস করিতেন, দিবা-রাত্রির মধ্যে অতি সামান্যই নিদ্রা যাইতেন, অবশিষ্ট সময় সর্বদা সাধন ভজন ও গ্রন্থ প্রণয়ন করিতেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী ইঁহাদের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

মহাপ্রভুর যত বড় বড় ভক্তমাত্র।
রূপ সনাতন হয়, সবার গৌরবপাত্র॥
* * *
অনিকেত দোঁহে রয় যথা বৃক্ষগণ।
একেক বৃক্ষের তলে একরাত্রি শয়ন॥
বিপ্রগৃহে স্থূল ভিক্ষা কাঁহা মাধুকরী।
শুষ্ক রুটী চানা চিবায় ভোগ পরিহরি॥
করোয়া মাত্র হাতে, কাঁথা ছিঁড়া বহির্বাস।
কৃষ্ণনাম কৃষ্ণকথা নর্তন উল্লাস॥
অষ্ট প্রহর কৃষ্ণ ভজন চারি দণ্ড শয়নে।
নাম সঙ্কীর্তন প্রেম সেহ নহে কোন দিনে॥
কভু ভক্তি রস শাস্ত্র করয়ে লিখন।
চৈতন্য কথা শুনে, করে চৈতন্য চিন্তন॥

মহাপ্রভুর আজ্ঞায় রূপ সনাতন বৃন্দাবন ছাড়িয়া কোথাও যাইতেন না। একবার মাত্র উভয়ে নীলাচলে মহাপ্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের মহান্ চরিত্রের কাহিনী শীঘ্রই বৃন্দাবন হইতে সমগ্র ভারতে ছড়াইয়া পড়িল এবং তাহার প্রভাবে উত্তর ও মধ্য ভারতে বৈষ্ণবধর্ম বহুল প্রচারিত হইল। রূপ সনাতন জগতের মহাপুরুষদের মধ্যে অগ্রগণ্য ব্যক্তি। মহাপ্রভুর প্রেমধর্মের প্রচারক হিসাবে, নিত্যানন্দের পরেই তাঁহাদের স্থান। তাঁহারা আমাদের সকলেরই নমস্য।

১৮

প্রকাশানন্দ সরস্বতী ও কাশীতে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার

মহাপ্রভু বৃন্দাবন দর্শন করিয়া কাশীতে ফিরিয়া আসিলেন। চন্দ্রশেখরের কথা পূর্বেই বলিয়াছি, তাঁহার গৃহেই মহাপ্রভু রহিলেন এবং তপন মিশ্রের গৃহে তাঁহার সেবার ব্যবস্থা হইল। কাশীতে আসিয়াই সনাতনের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয় এবং প্রায় দুই মাস কাল নিকটে রাখিয়া মহাপ্রভু তাঁহাকে বৈষ্ণবধর্ম ও ভক্তিশাস্ত্র শিক্ষাদান করেন। এদিকে চন্দ্রশেখর, তপন মিশ্র প্রভৃতি ভক্তগণের মনে বিষম দুঃখ যে, কাশীতে কেবলই মায়াবাদের প্রচার হইতেছে, প্রেম ও ভক্তির নামগন্ধও সেখানে নাই। মহাপ্রভুর বৃন্দাবন যাইবার সময়েই তাঁহারা তাঁহার নিকট এই নিবেদন করিয়াছিলেন, কিন্তু মহাপ্রভু সেবার কাশীতে অল্প কয়েক দিন মাত্র ছিলেন, এদিকে মন দিবার অবসর তাঁহার হয় নাই, এবার মহাপ্রভু ফিরিয়া আসিলে চন্দ্রশেখর ও তপন মিশ্র উভয়েই তাঁহাকে বলিলেন—প্রভু, ভক্তিধর্ম প্রচার করিয়া এই মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের উদ্ধার করিতে হইবে, নতুবা আমরা এ জীবন রাখিব না। দাম্ভিক সন্ন্যাসীরা যে তোমাকে অনর্থক নিন্দা করিবে, তাহা আমরা সহ্য করিতে পারিব না।

মহাপ্রভু ভক্তদের এই অভিমান শুনিয়া ঈষৎ হাসিলেন, কিন্তু মুখে কিছুই বলিলেন না। এমন সময় একজন ব্রাহ্মণ আসিয়া মহাপ্রভুর নিকটে করযোড়ে নিবেদন করিল—প্রভু, আমাকে একটি ভিক্ষা দিতে হইবে। আমি কাশীর সমস্ত সন্ন্যাসীকে নিমন্ত্রণ করিয়াছি, এখন তুমি যদি আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ কর, তবেই আমার মনোবাসনা পূর্ণ হয়। তুমি সন্ন্যাসী গোষ্ঠীতে যাও না, ইহা আমি জানি, কিন্তু তবু আমার প্রতি দয়া করিয়া তোমাকে এ নিমন্ত্রণ স্বীকার করিতে হইবে।

মহাপ্রভু হাসিয়া ব্রাহ্মণের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন।

নিমন্ত্রণের দিন মহাপ্রভু সেই ব্রাহ্মণের গৃহে গেলেন। সন্ন্যাসীরা সকলে পূর্বেই আসিয়া সভা করিয়া বসিয়াছিলেন। মহাপ্রভু সভার নিকটে গিয়া সন্ন্যাসীদের নমস্কার করিয়া পা ধুইতে গেলেন। পা ধুইয়া তিনি সেই স্থানেই বসিয়া পড়িলেন, সন্ন্যাসীদের সভার মধ্যে আর গেলেন না। এই ব্যাপার দেখিয়া সন্ন্যাসীরা সকলেই বিস্মিত, মনে মনে একটু কুণ্ঠিত হইয়াও উঠিলেন। এই তেজোময়, অপূর্বদর্শন, কাঞ্চনকান্তি সন্ন্যাসী—সভা ছাড়িয়া এমন অপবিত্র স্থানে বসিলেন কেন! একি এঁর বিনয়, দৈন্য, না আরো কিছু? সন্ন্যাসিগণ কিন্তু সভায় বসিয়া থাকিতে পারিলেন না, তাঁহারা সকলেই মহাপ্রভুকে

সম্বর্ধনা করিয়া আনিবার জন্য উঠিয়া পড়িলেন। সন্ন্যাসীদের প্রধান প্রকাশানন্দ সরস্বতী সকলের পুরোভাগে গিয়া মহাপ্রভুকে সসম্মানে কহিলেন :

শ্রীপাদ, তুমি এরূপ অপবিত্র স্থানে বসিলে কেন?—এ তোমার যোগ্য স্থান নয়। উঠিয়া আসিয়া সভার মধ্যে আমাদের নিকটে বস।

মহাপ্রভু সবিনয়ে বলিলেন—আমি হীন সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী, তোমাদের মত বড় বড় সন্ন্যাসীদের সভায় একসঙ্গে বসিবার যোগ্যতা আমার নাই। অতএব এই স্থানে বসাই আমার পক্ষে ভাল।

প্রকাশানন্দ সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া মহাপ্রভুর হাত ধরিয়া টানিয়া একেবারে সভার মধ্যস্থলে বসাইয়া দিলেন, ও কহিলেন—

আমরা জানি তোমার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, সন্ন্যাসী কেশব ভারতীর তুমি শিষ্য, এই কারণে তুমি সকলের সম্মানের পাত্র। কিন্তু তুমি সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসী হইয়াও এবং এই কাশীতে বাস করিয়াও আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর না কেন? আরও শুনিয়াছি, তুমি সন্ন্যাসী হইয়াও নৃত্য কীর্তন কর, যত সব ভাবকদের সঙ্গে লইয়া উচ্চ সংকীর্তন করিয়া বেড়াও। এ সব তো সন্ন্যাস-ধর্মের বিপরীত! সন্ন্যাসীর প্রধান কর্তব্য বেদান্ত পাঠ, তাহা ছাড়িয়া তুমি এই সব ভাবকদের কর্ম করিতেছ কেন? তুমি যে সাধারণ লোক নও, তোমার অপূর্ব প্রভাব দেখিয়াই তাহা বুঝা যায়, অথচ তোমার ব্যবহারে আমরা মনে মনে অত্যন্ত দুঃখিত।

সন্ন্যাসীপ্রধান প্রকাশানন্দের এই মৃদু তিরস্কারপূর্ণ উপদেশ শুনিয়া মহাপ্রভু পরম বিনীতভাবে বলিলেন—আমি সন্ন্যাসী হইলেও মূর্খ, বেদান্তে আমার অধিকার নাই। আমার গুরু আমার এই মূর্খতা ও অযোগ্যতা দেখিয়া দয়া করিয়া উপদেশ দিলেন—বেদান্ত পড়িয়া তোমার কাজ নাই। তুমি শুধু সদাসর্বদা কৃষ্ণনাম জপ করিবে, এই কৃষ্ণনাম জপ করিলেই তোমার সংসারবন্ধন মোচন ও ধর্ম লাভ হইবে। এই কলিযুগে কৃষ্ণনামই একমাত্র ধর্ম।

আমি গুরুর আদেশ পালন করিয়া সর্বদা কৃষ্ণনাম জপ করিতে লাগিলাম। নাম লইতে লইতে আমার মন উদ্‌ভ্রান্ত হইল। আমি ধৈর্য ধারণ করিতে পারিলাম না, পাগলের মত নৃত্য-গীত-কীর্তন করিতে লাগিলাম। গুরুকে যাইয়া বলিলাম, গুরুদেব! আমার একি করিলে, কি মন্ত্র আমার কানে দিলে?

কিবা মন্ত্র দিলে গোঁসাই কিবা তার বল।
জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল॥
হাসায় নাচায় মোরে করায় ক্রন্দন।

গুরু হাসিয়া উত্তর দিলেন—বৎস. ভয় নাই, কৃষ্ণনামের এই তো স্বভাব, যে কৃষ্ণনাম জপ করে, তার ভগবানে এইরূপ প্রেমই জন্মে। তুমি ধন্য যে, এই

কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিয়াছ।

তোমার প্রেমেতে আমি হৈলাম কৃতার্থ॥
নাচ গাও ভক্ত সঙ্গে কর সঙ্কীর্তন।
কৃষ্ণনাম উপদেশে তার' ত্রিভুবন॥

সেই হইতে গুরুর বাক্যে দৃঢ়বিশ্বাস করিয়া আমি কৃষ্ণনাম জপ করি, নিরন্তর কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্তন করি। আমি যে নৃত্য কীর্তন করি—সে আমার দোষ নয়, কৃষ্ণ নামের দোষ, কৃষ্ণ নামই আমাকে ঐরূপ করায়।

প্রভুর এই মধুর বাক্য শুনিয়া সন্ন্যাসীদের মন ফিরিয়া গেল। এমন যে বিনয়ী, এমন মিষ্ট কথা যে বলে, তাহার উপর কে রাগ করিতে পারে? প্রকাশানন্দ সরস্বতী কহিলেন—

শ্রীপাদ, তুমি যে সমস্ত কথা বলিলে, তাহা সবই সত্য। যে কৃষ্ণপ্রেম লাভ করে, সে পরম সৌভাগ্যবান্। তুমি কৃষ্ণভক্তি কর, ইহাতে আমাদের সকলেরই সন্তোষ। কিন্তু বেদান্ত পড় না কেন? বেদান্ত কি দোষ করিল? বেদান্ত পড়িলে কি কৃষ্ণভক্তি লাভ করা যায় না?

প্রকাশানন্দের এই কথা শুনিয়া প্রভু মধুর হাসিয়া বলিলেন—যদি তোমরা মনে দুঃখ না পাও, তবে এ কথার উত্তর আমি দিতে পারি।

সন্ন্যাসীরা বলিলেন—সে কি কথা! তোমার কথা শুনিয়া আমরা মনে দুঃখ পাইব কেন? তোমাকে আমরা সাক্ষাৎ নারায়ণের মতই দেখিতেছি। তোমার মধুর কথা শুনিয়া কান জুড়ায়, তোমার রূপ-মাধুরী দেখিয়া নয়ন আনন্দিত হয়, আর তোমার প্রভাবে সকলের মন মুগ্ধ। তোমার কথা কখনই অসঙ্গত হইতে পারে না। অতএব তুমি কোন দ্বিধা না করিয়া যাহা বলিতে চাও বল।

মহাপ্রভু তখন বেদান্তের ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। বাসুদেব সার্বভৌমের নিকট যেমন করিয়াছিলেন, এখানেও তেমনি বেদান্তের শঙ্করাচার্য-কৃত মায়াবাদের ব্যাখ্যা খণ্ডন করিয়া ভক্তিশাস্ত্র-সম্মত ব্যাখ্যা করিলেন। সমস্ত সন্ন্যাসী মুগ্ধচিত্তে তাঁহার ব্যাখ্যা শুনিতে লাগিলেন। মহাপ্রভুর অপূর্ব পাণ্ডিত্য, গভীর শাস্ত্রজ্ঞান, অদ্ভুত প্রতিভা দেখিয়া তাঁহারা চমৎকৃত হইলেন। তাঁহাদের মনের ভ্রম দূর হইল, মায়াবাদের মোহ ত্যাগ করিয়া তাঁহারা সকলেই কৃষ্ণভক্ত হইয়া উঠিলেন। স্বয়ং প্রকাশানন্দ সরস্বতীর মনের সর্বাপেক্ষা বেশী পরিবর্তন হইল। তিনি যেমন ঘোর তার্কিক ও মায়াবাদী পণ্ডিত ছিলেন, তেমনি ভক্তিধর্মে দৃঢ় বিশ্বাসী হইলেন। সন্ন্যাসীরা সকলে মহা সমাদরে মহাপ্রভুকে মধ্যে বসাইয়া ভোজন করিলেন, সেদিনকার মত সভা শেষ হইল।

কিন্তু এই সভার কথা চারিদিকে লোকমুখে ছড়াইয়া পড়িল। প্রকাশানন্দ সরস্বতী ও অন্যান্য সন্ন্যাসীরা মহাপ্রভুর উপদেশে কৃষ্ণভক্ত হইয়াছেন, এ

সংবাদ শুনিয়া লোকে যেমন বিস্মিত হইল, তেমনি মহাপ্রভুর উপরে তাহাদের ভক্তি শতগুণে বাড়িয়া গেল। তিনি যে সাক্ষাৎ নারায়ণ, এই বিশ্বাস তাহাদের মনে দৃঢ় হইল। মহাপ্রভুর নামে ধন্য ধন্য রব পড়িয়া গেল, কাশীর সন্ন্যাসীরা যে যেখানে ছিল, দলে দলে মহাপ্রভুকে দেখিতে আসিল। লক্ষ লক্ষ লোক তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য ভিড় জমাইতে লাগিল। মহাপ্রভু দশাশ্বমেধ ঘাটে স্নান করিতে যান, বিশ্বেশ্বরমন্দির বা বিন্দুমাধব দর্শন করিতে যান, কোথাও তাঁহার এই জনারণ্যের হস্ত হইতে পরিত্রাণ নাই। সেই জনতার মধ্যে—

বাহু তুলে বলে প্রভু বল হরি হরি।
হরিধ্বনি করে লোক স্বর্গ মর্ত ভরি॥

একদিন মহাপ্রভু স্নান করিয়া বিন্দুমাধব দর্শন করিতে চলিয়াছেন, এমন সময় একজন ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহাকে কহিল—প্রভু, তোমার কৃপায় সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দের মনের অদ্ভুত পরিবর্তন হইয়াছে। তিনি পূর্বে মায়াবাদ ছাড়া কখনও কিছু বলিতেন না, আর এখন তিনিই মায়াবাদকে উড়াইয়া দিয়া ভক্তি-শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতেছেন।

মহাপ্রভু একথা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া বিন্দুমাধব দর্শন করিতে গেলেন। বিন্দুমাধবের সৌন্দর্য দেখিয়া তাঁহার মন মুগ্ধ হইল, তিনি প্রেমে আবিষ্ট হইয়া মন্দিরের আঙিনায় নৃত্য ও কীর্তন করিতে লাগিলেন। চন্দ্রশেখর, তপন মিশ্র প্রভৃতিও সেই কীর্তনে যোগ দিলেন। ক্রমে চারিদিক হইতে সহস্র সহস্র লোক আসিয়া কীর্তনে যোগ দিল এবং হরিধ্বনিতে আকাশ বাতাস পূর্ণ হইয়া উঠিল। প্রকাশানন্দ সরস্বতীর আশ্রম বিন্দুমাধব মন্দিরের নিকটেই। তিনি এই হরিধ্বনি ও কীর্তনের রোল শুনিয়া শিষ্যবৃন্দ সহ আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং দণ্ডায়মান হইয়া সেই অপূর্ব দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু বেশীক্ষণ সেই ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না, তিনিও শিষ্যগণসহ সঙ্কীর্তনে যোগ দিলেন। মহাপ্রভুর মোহিনী আকর্ষণশক্তি, প্রেমের সে প্রবল বন্যা রোধ করিবার সাধ্য প্রকাশানন্দ ও তাঁহার শিষ্য সন্ন্যাসীদের কোথায়? তাঁহারাও সকলের সঙ্গে প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া "হরি হরি" বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। কাশীর সকল লোকে এই দৃশ্য দেখিয়া অবাক হইল। পরম জ্ঞানী, বৈদান্তিক, প্রবীণ সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ—তিনিও শেষে নৃত্য করিতে লাগিলেন; তাঁহার কিছুমাত্র লোকলজ্জা হইল না! তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যেও এই ভাব সঞ্চারিত হইল।

অবশেষে মহাপ্রভু লোকের ভিড় দেখিয়া আত্মসংবরণ করিলেন। প্রকাশানন্দকে সম্মুখে দেখিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। প্রকাশানন্দও শশব্যস্তে মহাপ্রভুকে প্রণাম করিলেন। মহাপ্রভু কহিলেন—তুমি জগদ্গুরু, আমি তোমার শিষ্যানুশিষ্যের সমানও নহি। তুমি আমাকে প্রণাম করিতেছ কেন? আমি

জানি, তুমি জগৎকে ব্রহ্মময় দেখ এবং সেই বুদ্ধিতেই তুমি আমাকে প্রণাম করিয়াছ। কিন্তু লোকশিক্ষার জন্য তোমার এরূপ দৃষ্টান্ত স্থাপন করা উচিত হয় না।

প্রকাশানন্দ কহিলেন—প্রভু, আমি পূর্বে তোমার অনেক নিন্দা করিয়াছি। তোমার চরণস্পর্শ করিয়া সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলাম।

মহাপ্রভু কহিলেন—বিষ্ণু বিষ্ণু, আমি হীন জীব, আমাকে ঈশ্বরতুল্য জ্ঞান করিলে আমার অপরাধ হয়।

প্রকাশানন্দের মন তখন ভক্তিতে পূর্ণ। মহাপ্রভুর এইসব কথায় কান না দিয়া তিনি তাঁহার চরণে ভক্তিভরে আশ্রয় লইলেন। মহাপ্রভু কৃপা করিয়া তাঁহাকে প্রেমধর্ম ও ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে শিক্ষা দিলেন।

এদিকে মহাপ্রভুর নাম বারাণসী হইতে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল, দূর-দূরান্তর হইতে অসংখ্য লোক তাঁহাকে দেখিতে আসিতে লাগিল।

বারাণসী গ্রামে যদি কোলাহল হৈল।
শুনি গ্রামী দেশী লোক আসিতে লাগিল॥
লক্ষকোটী লোক আইসে নাহিক গণন।
সঙ্কীর্ণ স্থানে প্রভুর না পায় দর্শন॥
প্রভু যবে স্নানে যান বিশ্বেশ্বর দর্শনে।
দুই দিকে লোক করে প্রভু বিলোকনে॥
বাহু তুলি প্রভু কহে বোল কৃষ্ণ হরি।
দণ্ডবৎ করে লোক হরিধ্বনি করি॥

শেষে লোকের ভিড় এমন বাড়িতে লাগিল যে, মহাপ্রভুর পক্ষে আর কাশীতে থাকা অসম্ভব হইল। একদিন রাত্রিকালে উঠিয়া তিনি সকলের অলক্ষ্যে কাশী ত্যাগ করিয়া নীলাচলের পথে যাত্রা করিলেন। তপন মিশ্র, তাঁহার পুত্র রঘুনাথ, মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ, চন্দ্রশেখর, পরমানন্দ কীর্তনীয়া ইঁহারা সকলেই মহাপ্রভুর সঙ্গে নীলাচলে যাইবার জন্য উৎসুক। কিন্তু তিনি অনেক বুঝাইয়া তাঁহাদিগকে পথ হইতে বিদায় দিলেন। বলিলেন—আমি একা ঝারিখণ্ডের পথে নীলাচলে ফিরিয়া যাইব, তোমরা গৃহে যাও। এরপর যদি নীলাচলে আমাকে দেখিতে যাইতে ইচ্ছা হয়, যাইও।

সকলেই প্রভুর বিরহে কাতর চিত্তে কাশীতে প্রত্যাগমন করিলেন। মহাপ্রভু সেই ঝারিখণ্ডের পথ দিয়া একাকী নীলাচলে ফিরিয়া গেলেন।

মহাপ্রভু কাশীতে সুবুদ্ধি রায় নামক একজন সমাজে পতিত, "ধর্মভ্রষ্ট" গৌড়দেশবাসীকে কিরূপে উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেই কাহিনী বলিয়া আমরা এই অধ্যায় শেষ করিব। সুবুদ্ধি রায় পূর্বে গৌড়ের অধিকারী ছিলেন, সৈয়দ হুসেন খাঁ তাঁহার অধীনে চাকরী করিতেন। একবার সৈয়দ হুসেন খাঁর

কার্যের ত্রুটি দেখিয়া সুবুদ্ধি রায় চাবুক মারিয়া তাঁহাকে দণ্ড দিয়াছিলেন। পরে যখন এই হুসেন খাঁই ঘটনাচক্রে গৌড়ের বাদশাহ হইলেন, তখন তিনি সুবুদ্ধি রায়কে বহু সম্মান করিলেন, তাঁহার মন মহৎ হইল; সুবুদ্ধি রায়ের প্রদত্ত দণ্ডের কথা তিনি ভুলিয়াই গেলেন। কিন্তু তিনি ভুলিলেও, তাঁহার পত্নী সে কথা ভুলেন নাই, তিনি সুবুদ্ধি রায়কে শাস্তি দিবার জন্য স্বামীকে প্ররোচিত করিতে লাগিলেন। বাদশাহ কহিলেন—হাজার হোক, সুবুদ্ধি রায় আমার পালক প্রভু ছিলেন, তাঁহার প্রাণ আমি কিরূপে লইব?

বাদশাহ-পত্নী কহিলেন—প্রাণ লইতে আমি কহিতেছি না, ইঁহার 'জাতি' লও, তাহা হইলেও শাস্তি হইবে।

বাদশাহ বলিলেন—'জাতি' লইলে সঙ্গে সঙ্গে ইহার প্রাণও যাইবে, সুতরাং তাহাও আমি পারিব না।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্ত্রীর উপরোধ তাঁহাকে রক্ষা করিতে হইল। একদিন বাদশাহ জোর করিয়া সুবুদ্ধি রায়ের মুখে মুসলমানের দ্বারা "করোয়ার পানি" বা জল ঢালিয়া দিলেন। কঠোর লোকাচারের মাপকাঠিতে সুবুদ্ধি রায়ের জাতি ধর্ম সব গেল। তিনি সমস্ত বিষয় সম্পত্তি ত্যাগ করিয়া কাশীতে আসিলেন। কাশীর পণ্ডিতদের নিকট তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার এই অনিচ্ছাকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি?

কাশীর বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা শাস্ত্র ঘাঁটিয়া পাঁতি দিলেন, তুমি তপ্ত ঘৃত খাইয়া প্রাণত্যাগ কর, তাহা হইলেই তোমার প্রায়শ্চিত্ত হইবে।

এই ভয়াবহ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা শুনিয়া সবুদ্ধি রায়ের প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। কেহ কেহ তাঁহাকে বলিলেন, তোমার এই অনিচ্ছাকৃত দোষ অতি সামান্য ব্যাপার, ইহার জন্য এমন কঠোর শাস্তি হইবে কেন?

সুবুদ্ধি রায় যখন এইরূপে সংশয় দোলায় দোল খাইতেছিলেন, সেই সময় মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ কাশীতে আসিলেন। সুবুদ্ধি রায় তাঁহার নিকট আপন অপরাধের বৃত্তান্ত কহিয়া প্রায়শ্চিত্তের বিধান চাহিলেন।

মহাপ্রভু সমস্ত শুনিয়া বলিলেন—রায়, তোমাকে তপ্ত ঘৃত খাইয়া প্রাণ-ত্যাগ করিতে হইবে না। তুমি বৃন্দাবনে যাও এবং সেখানে থাকিয়া নিরন্তর কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্তন কর। তাহা হইলেই তোমার সমস্ত পাপ দূর হইবে। এমন কোন অপরাধ নাই, যাহা কৃষ্ণ নাম লইলে দূর না হয়।

সুবুদ্ধি রায় মহাপ্রভুর আদেশ শিরোধার্য করিয়া বৃন্দাবনে গেলেন এবং শীঘ্রই একজন পরম কৃষ্ণভক্ত হইয়া উঠিলেন। অর্থহীন নিষ্ঠুর লোকাচার নহে, ভগবানে ভক্তিই যে প্রকৃত ধর্ম, সুবুদ্ধি রায়কে উদ্ধার করিয়া মহাপ্রভু জগৎকে এই শিক্ষা দান করিয়াছেন।

১৯

রঘুনাথ দাস ও ছোট হরিদাস

চব্বিশ বৎসর বয়সে ১৫০৯-১০ খৃষ্টাব্দে মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নীলাচলে আসিয়াছিলেন। ১৫০৯ খৃঃ—১৫১৫ খৃঃ এই ছয় বৎসরকাল দক্ষিণ-দেশ, গৌড়দেশ ও বৃন্দাবন, কাশী অঞ্চলে তীর্থভ্রমণ ও প্রেমধর্ম প্রচারে অধিকাংশ সময় কাটাইয়াছেন। তারপর ১৫১৫ খৃঃ হইতে ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই আঠার বৎসর কাল, মহাপ্রভু নিরন্তর নীলাচলক্ষেত্রে ছিলেন—নীলাচল ছাড়িয়া কোথাও গমন করেন নাই। এইখানেই বাঙ্গালাদেশ ও ভারতের অন্যান্য স্থান হইতে ভক্ত, সাধু-সন্ন্যাসী ও পণ্ডিতগণ তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন এবং তাঁহার অপূর্ব প্রেম ও লোকোত্তর চরিত্র দেখিয়া ধন্য হইতেন। ভারতের সকল প্রদেশের—দূর দূরান্তের গ্রাম হইতেও—লক্ষ লক্ষ লোক জগন্নাথ দর্শনে আসিয়া 'সচলজগন্নাথ' মহাপ্রভুকে দেখিয়া কৃতার্থ হইতেন। সুতরাং মহাপ্রভু নীলাচলে থাকিয়াই সমস্ত ভারতবর্ষে তাঁহার প্রেম-ধর্মের প্রভাব বিস্তার করিতেন, একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে।

যে সব শক্তিশালী সাধুপুরুষ ও ভগবদ্‌ভক্তের সহায়ে মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম প্রচার লাভ করিয়াছিল ও তাহার গৌরব বর্ধিত হইয়াছিল, তাঁহাদের অনেকেই এই সময়ে নীলাচলে আসিয়া মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হইয়াছিলেন। ইঁহাদের এক একজন এক এক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন এবং নিজেদের জীবন ও আচরণের দ্বারা লোকের সম্মুখে আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন। শ্রীমৎ রঘুনাথ দাস মহাপ্রভুর শ্রেষ্ঠ ভক্তগণের মধ্যে অন্যতম, তিনি ছিলেন কঠোর বৈরাগ্যের আদর্শ। তাঁহার অপূর্ব জীবন-কাহিনীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিবার লোভ আমরা সংবরণ করিতে পারিতেছি না। রঘুনাথ দাস ধনীর সন্তান, জাতিতে কায়স্থ, সপ্তগ্রামে নিবাস। তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত হিরণ্য দাস ও পিতা গোবর্ধন দাস সপ্তগ্রাম পরগণার মালিক ছিলেন। তাঁহারা লক্ষপতি লোক। রাঢ় অঞ্চলে তাঁহাদের ঐশ্বর্য ও প্রতাপ বিখ্যাত ছিল। রঘুনাথ দাস তাঁহাদের একমাত্র বংশধর, সুতরাং পরম স্নেহের পাত্র ছিলেন। অল্পবয়সেই রঘুনাথের বিবাহ হইয়াছিল, ঘরে "অপ্সরাসমা সুন্দরী" পত্নীও ছিল। কিন্তু এই ভোগ ও ঐশ্বর্যের মধ্যে বাস করিয়াও রঘুনাথের মনে শান্তি ছিল না। তরুণ বয়স হইতেই তাঁহার চিত্ত ভগবানে উন্মুখ হইয়াছিল। রাজ্য ঐশ্বর্য তাঁহার মনকে আকৃষ্ট করিতে পারে নাই। মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ বৃন্দাবন গমনের সঙ্কল্প করিয়া নীলাচল হইতে যখন গৌড়দেশে আসিয়াছিলেন, সেই সময়ে

শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্যের গৃহে মহাপ্রভুর সঙ্গে রঘুনাথ দাসের সাক্ষাৎ হয়। দর্শনমাত্রই তিনি মহাপ্রভুর পরমভক্ত হইলেন এবং তাঁহার নিকট নিজের মনোভাব নিবেদন করিলেন। মহাপ্রভু এই তরুণ ধনী-সন্তানকে সহসা সংসার ত্যাগ করিতে উপদেশ দিলেন না, বরং বলিলেন—বাহ্য বৈরাগ্য করিয়া কোন ফল নাই, অনাসক্ত হইয়া কর্তব্যসাধন করাই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পন্থা।

প্রভুর শিক্ষাতে তেঁহো নিজ ঘরে যায়।
মর্কট বৈরাগ্য ছাড়ি হৈলা বিষয়ীর প্রায়॥
ভিতরে বৈরাগ্য, বাহিরে করে সর্বকর্ম।
দেখিয়া ত পিতা মাতার আনন্দিত মন॥

রঘুনাথের মন এই ভাবে সংসারে টিকিল না। তিনি গৃহ ছাড়িয়া পলাইতে চেষ্টা করিলেন। ধনীর দুলাল একমাত্র বংশধরের উপর পিতা ও জ্যেঠার কড়া পাহারা ছিল। সুতরাং পুনঃ পুনঃ রঘুনাথের পলায়ন চেষ্টা ব্যর্থ হইল, প্রহরীরা তাঁহাকে ধরিয়া আনিল। রঘুনাথের মাতা স্বামীকে কহিলেন—ছেলে পাগল হইয়াছে, তাহাকে রীতিমত বাঁধিয়া রাখ, কখন আবার পলাইবে, ঠিক কি? রঘুনাথের পিতা বিষণ্ণ চিত্তে কহিলেন—

ইন্দ্র সম ঐশ্বর্য স্ত্রী অপ্সরা সম।
এ সব বান্ধিতে নারিলেক যার মন॥
দড়ির বন্ধনে তারে রাখিবে কেমতে।
জন্মদাতা পিতা নারে প্রারব্ধ খণ্ডাতে॥

রঘুনাথের পিতা যে ঠিকই বুঝিয়াছিলেন, তাহা কে অস্বীকার করিবে?

এই সময়ে নিত্যানন্দ প্রভু নীলাচল হইতে আসিয়া পাণিহাটী গ্রামে হরিনাম প্রচার করিতেছিলেন। রঘুনাথ দাস তাঁহাকে দর্শন করিতে চলিলেন। তাঁহার সরল অন্তঃকরণ ও বিশুদ্ধ ভক্তি দেখিয়া নিত্যানন্দ প্রভু আনন্দিত হইলেন এবং কৌতুক করিয়া তাঁহাকে বলিলেন—আজি আমি তোমাকে কঠোর দণ্ড দিব, তুমি আমার সঙ্গে সমস্ত ভক্তগণকে দধি চিড়া ভক্ষণ করাও। ধনী-সন্তান রঘুনাথ নিত্যানন্দ প্রভুর এই আজ্ঞায় কৃতার্থ হইলেন।

পাণিহাটী গ্রামে মহোৎসবের আয়োজন হইল। দধি, চিড়া, কদলী, দুগ্ধ, সন্দেশ ইত্যাদি দ্রব্য রঘুনাথের আদেশে ভারে ভারে আসিল। বৈষ্ণবভক্তগণ পরমানন্দে কীর্তন মহোৎসব করিয়া 'দধি চিড়া' প্রসাদ পাইলেন। মহোৎসবের পর নিত্যানন্দ প্রভু আশীর্বাদ করিয়া রঘুনাথকে বিদায় দিলেন। সেই হইতে, এই ঘটনা স্মরণার্থ, প্রতি বৎসর পাণিহাটীতে "দণ্ড মহোৎসব" ভক্তগণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

নিত্যানন্দ প্রভুর নিকট হইতে বিদায় লইয়া সপ্তগ্রামে স্বগৃহে আসিয়া রঘুনাথের মন সংসার ত্যাগ করিবার জন্য আরও উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল।

তিনি অন্তঃপুরে গমন বন্ধ করিলেন, বাহিরেই দুর্গামণ্ডপে শয়ন করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভাব গতিক দেখিয়া বাড়ীর লোকের মনে সন্দেহ হইল। রক্ষকগণ সারারাত্রি জাগিয়া তাঁহাকে পাহারা দিতে লাগিল। রঘুনাথ এই কঠোর বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। একদিন সুযোগও আসিয়া জুটিল। রঘুনাথের কুলপুরোহিত রাত্রিকালে আসিয়া তাঁহাকে নিজের কোন প্রয়োজনে বাহিরে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। প্রহরিগণ কোন সন্দেহ করিল না, ভাবিল, পুরোহিতের সঙ্গে রঘুনাথ ফিরিয়া আসিবেন। কিন্তু রঘুনাথ আর ঘরে ফিরিলেন না, একাকী গভীর নিশীথে নীলাচলের পথে পলায়ন করিলেন। প্রভাতে উঠিয়া রঘুনাথের বাড়ীতে হাহাকার পড়িয়া গেল, পিতা ও জ্যেঠা চারিদিকে লোকজন পাইক বরকন্দাজ তাঁহাকে ধরিয়া আনিবার জন্য পাঠাইলেন। কিন্তু কোথাও রঘুনাথের সন্ধান পাওয়া গেল না।

এদিকে রঘুনাথ অপরিচিত বন্য পথ দিয়া দিনরাত্রি ক্রমাগত নীলাচলের দিকে ছুটিতে লাগিলেন।

কথিত আছে, প্রত্যহ গড়ে ১৫ ক্রোশ পথ তিনি পদব্রজে অতিক্রম করিতেন। এইরূপে মাত্র বার দিনে তিনি নীলাচলে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। এই বার দিনের মধ্যে পথে তিনদিন মাত্র কিছু আহার করিয়াছিলেন, বাকী কয়েকদিন তাঁহার ক্ষুধাতৃষ্ণার জ্ঞানই ছিল না।

নীলাচলে মহাপ্রভু ভক্তগণের সঙ্গে বসিয়া আছেন, এমন সময় রঘুনাথ দাস যাইয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। মুকুন্দ দত্ত মহাপ্রভুকে বলিলেন—এই দেখ রঘুনাথ দাস সংসার ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন।

মহাপ্রভু শুনিয়া সানন্দে রঘুনাথ দাসকে আলিঙ্গন করিলেন, অন্যান্য ভক্তেরাও তাঁহাকে স্নেহভরে আলিঙ্গন করিলেন।

মহাপ্রভু কহিলেন—শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তুমি যে বিষয়-কূপ হইতে মুক্তি পাইয়াছ, এ অতি সৌভাগ্যের কথা।

রঘুনাথ সবিনয়ে বলিলেন—প্রভু, তোমার দয়াতেই এরূপ সম্ভব হইয়াছে, আমার কোন কৃতিত্ব নাই।

মহাপ্রভু দেখিলেন, ধনীর দুলাল রঘুনাথের কয়েকদিনের পথশ্রমে, অনাহারে ও ক্লান্তিতে দেহ কৃশ ও মলিন হইয়াছে। তিনি স্বরূপ গোস্বামীর হাতে রঘুনাথকে সমর্পণ করিয়া বলিলেন—স্বরূপ, এই রঘুনাথ বালক, তুমি পুত্ররূপে ইহাকে অঙ্গীকার করিবে এবং সর্বদা যত্ন লইবে। আমি ইহার নাম দিলাম—স্বরূপের রঘু।

স্বরূপ গোস্বামী সানন্দে এই আদেশ মাথায় লইয়া রঘুনাথকে পুনর্বার আলিঙ্গন করিলেন।

রঘুনাথ দাস মহাপ্রভুর নিকটেই রহিয়া গেলেন। সমুদ্রস্নান, জগন্নাথ

দর্শন, সাধন-ভজন, নামকীর্তনেই তাঁহার সময় কাটিত। মহাপ্রভুর সেবক গোবিন্দ তাঁহাকে মহাপ্রসাদ দিতেন। রঘুনাথ দাস এইরূপে চারিদিন মাত্র গোবিন্দের নিকট হইতে মহাপ্রসাদ লইলেন। পঞ্চম দিন হইতে তিনি জগন্নাথ মন্দিরের সিংহদ্বারে মহাপ্রসাদ ভিক্ষা করিয়া খাইতে লাগিলেন। জগন্নাথ দর্শন করিতে যেসব বিষয়ী লোক আসিতেন, তাঁহারা রঘুনাথকে মহাপ্রসাদ ভিক্ষা দিতেন, সময়ে সময়ে দোকানী পসারীরাও দিত। এরূপ বিষয়-বিরক্ত তরুণ যুবককে দেখিয়া কাহার না চিত্ত স্নেহার্দ্র হয়? মহাপ্রভু সেবক গোবিন্দ ও স্বরূপ গোস্বামীর মুখে রঘুনাথের এই বৈরাগ্য শুনিয়া পরম আনন্দিত হইলেন।

এইরূপে কিছুদিন অতীত হইলে, রঘুনাথ মহাপ্রভুর নিকটে আসিয়া নিবেদন করিলেন—প্রভু, আমার জীবনের কর্তব্য উপদেশ করুন।

মহাপ্রভু রঘুনাথকে যে উপদেশ দেন, তাহা গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী ভক্তের পক্ষে আদর্শস্বরূপ :—

গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে॥
অমানী মানদ কৃষ্ণ নাম সদা লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা মানসে করিবে॥

রঘুনাথ মহাপ্রভুর চরণ বন্দনা করিয়া বিদায় লইলেন এবং তাঁহার উপদেশ অনুসারে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহার বৈরাগ্য ক্রমেই কঠোর হইতে কঠোরতর হইতে লাগিল। সমস্তদিন তিনি অনাহারে সাধন ভজন ও জগন্নাথ দর্শনাদি করিতেন। তারপর—

দশদণ্ড রাত্রি গেলে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া।
সিংহদ্বারে খাড়া হয় আহার লাগিয়া॥
কেহ যদি দেয় তবে করয়ে ভক্ষণ।
কভু উপবাস, কভু করেন চর্বণ॥

কয়েক মাস পরে শিবানন্দ সেন প্রভৃতি ভক্তগণ নীলাচল হইতে গৌড়ে ফিরিয়া গেলে, রঘুনাথের পিতা শিবানন্দের নিকটে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার পুত্র রঘুনাথ নীলাচলে মহাপ্রভুর নিকটে গিয়াছেন কিনা? শিবানন্দ কহিলেন, রঘুনাথ নীলাচলেই আছেন এবং সেখানে তিনি সকলেরই পরম স্নেহভাজন হইয়াছেন। এই বলিয়া তিনি রঘুনাথের কঠোর বৈরাগ্যের কথা বর্ণনা করিলেন। পুত্রের এই কঠোর বৈরাগ্যের বিবরণ শুনিয়া রঘুনাথের পিতার মনে অত্যন্ত দুঃখ হইল। রঘুনাথের মাতার মনে যে কষ্ট হইল তাহা বর্ণনাতীত। তিনি চারিশত মুদ্রা, দুইজন ভৃত্য ও একজন ব্রাহ্মণ শিবানন্দের নিকট পাঠাইয়া দিয়া সংবাদ দিলেন, তিনি (শিবানন্দ) যেন এই সমস্ত রঘুনাথের

জন্য নীলাচলে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করেন। এই মুদ্রা, ভৃত্য ও ব্রাহ্মণ পাঠাইয়া পুত্রের কঠোর সন্ন্যাসের কষ্ট কিছু লাঘব করিবেন, ইহাই বোধ হয় রঘুনাথের মাতার ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা ছিল। হায়, সন্তান কিরূপে সুখী হইবে, এই চিন্তাতেই মায়ের মন যে সর্বদা উদ্বিগ্ন!

পর বৎসর শিবানন্দ অন্যান্য ভক্তগণের সঙ্গে যখন নীলাচলে গেলেন, তখন রঘুনাথের মাতার প্রেরিত মুদ্রা, ভৃত্যদ্বয় ও ব্রাহ্মণ সঙ্গে লইয়া চলিলেন, রঘুনাথের নিকট তাঁহার মাতার মনের আকাঙ্ক্ষাও তিনি ব্যক্ত করিলেন। কিন্তু সন্ন্যাসী রঘুনাথ সেই মুদ্রা, ভৃত্য প্রভৃতি অঙ্গীকার করিলেন না। ভৃত্য ও ব্রাহ্মণ অগত্যা মুদ্রা লইয়া নীলাচলেই অপেক্ষা করিতে লাগিল। তাহাদের আগ্রহ দেখিয়া ও মাতার কথা চিন্তা করিয়া রঘুনাথের মন অবশেষে একটু নরম হইল। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন, ইহাদের নিকট কিছু অর্থ লইয়া মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া সেবা করিবেন। তাহাই হইল। রঘুনাথ মাসে দুইবার মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিতেন এবং এই দুইবারের নিমন্ত্রণের ব্যয় নির্বাহের জন্য মাতার প্রেরিত ব্রাহ্মণ ও ভৃত্যের নিকট হইতে "অষ্টপণ কৌড়ি"* লইতেন। এইরূপে দুই বৎসর পর্যন্ত মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া অবশেষে রঘুনাথ নিমন্ত্রণ করা ছাড়িয়া দিলেন।

রঘুনাথ নিমন্ত্রণ বন্ধ করিয়াছেন জানিয়া, মহাপ্রভু স্বরূপকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। স্বরূপ কহিলেন—বিষয়ীর দ্রব্য লইয়া তাহার দ্বারা মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলে তাঁহার চিত্ত হয়ত প্রসন্ন হয় না, রঘুনাথের মনে এই সন্দেহ হইয়াছে। সেই জন্যই সে নিমন্ত্রণ করা বন্ধ করিয়াছে।

মহাপ্রভু হাসিয়া কহিলেন—রঘুনাথ ঠিকই করিয়াছে, বিষয়ীর অন্নে সন্ন্যাসীর মন প্রসন্ন হয় না, বরং তাহাতে কিছু মলিন হয়।

এদিকে রঘুনাথ সিংহদ্বারে মহাপ্রসাদ ভিক্ষা করাও ছাড়িয়া দিলেন। তিনি দ্বিপ্রহরে একবার সাধারণ ভিখারীর মত, ছত্রে যাইয়া বসিয়া খাইতেন। অবশিষ্ট সময় কৃষ্ণভজন ও কীর্তনে কাটাইতেন। এই সময়ে তাঁহার সন্ন্যাসের কঠোর নিয়ম সম্বন্ধে কবিরাজ গোস্বামী 'চরিতামৃতে' লিখিয়াছেন :—

অনন্তগুণ রঘুনাথের কে করিবে লেখা।
রঘুনাথের নিয়ম যেন পাষাণের রেখা॥
সাড়ে সাত প্রহর যায় যাহার স্মরণে।
আহার নিদ্রা চারিদণ্ড সেহো কোন দিনে॥
বৈরাগ্যের কথা তার অদ্ভুত কথন।
আজন্ম না দিল জিহ্বায় রসের স্পর্শন॥

---

* আটপণ কৌড়ি = প্রায় অর্ধমুদ্রা বা আট আনা। ষোলপণ কৌড়িতে এক কাহন বা মুদ্রা হইত।

কানি কাঁথা বিনা না পরিবে বসন।
সাবধানে প্রভুর কৈল আজ্ঞার পালন॥
প্রাণরক্ষা লাগি যেবা করেন ভক্ষণ।
তাহা খাইয়া আপনাকে করে নির্বেদন॥

কিছু দিন পরে রঘুনাথ ছত্রে আসিয়া খাওয়াও ছাড়িয়া দিলেন। পসারীদের যে সব প্রসাদান্ন বিক্রয় হয় না, তাহারা সেগুলি সিংহদ্বারে গাভীদের খাইবার জন্য ফেলিয়া দেয়। অনেক সময় তাহাতে এমন দুর্গন্ধ হয় যে, গাভীরাও তাহা খাইতে পারে না। রঘুনাথ সেই গলিত দুর্গন্ধময় প্রসাদান্ন সিংহদ্বার হইতে কুড়াইয়া জলে ধুইয়া লবণ সহযোগে খাইতেন। মহাপ্রভু এই কথা শুনিয়া একদিন নিজে আসিয়া রঘুনাথের পাত্র হইতে সেই গলিত প্রসাদান্ন লইয়া মুখে দিয়া বলিলেন—এমন অমৃততুল্য প্রসাদ আর কখনও খাই নাই, রঘুনাথ ধন্য তুমি!

বস্তুতঃ রঘুনাথের কঠোর বৈরাগ্য দেখিয়া মহাপ্রভু অন্তরে সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন।

মহাপ্রভুর তিরোভাবের পর রঘুনাথ দাস বৃন্দাবনে যাইয়া রূপ সনাতনের নিকট বাস করেন। এখানেও তাঁহার কঠোর বৈরাগ্য দেখিয়া লোকে চমৎকৃত হইত। বৃদ্ধকালে তিনি বৃন্দাবনে রাধাকুণ্ডের তীরে থাকিতেন এবং সর্বদা ভজন সাধন করিতেন। লক্ষপতি ধনীর সন্তান, অতুল ঐশ্বর্যের অধিপতি রঘুনাথ প্রথম যৌবনেই ভোগ-বিলাস ও পরমাসুন্দরী পত্নী ত্যাগ করিয়া এই যে কঠোর সন্ন্যাস জীবন যাপন করিয়াছিলেন, জগতে ইহার অনুরূপ দৃষ্টান্ত খুব বেশী নাই। রঘুনাথের মনে যে প্রবল ভগবৎপ্রেমের সঞ্চার হইয়াছিল, কেবল তাহার বলেই এরূপ সম্ভবপর হইতে পারে। মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ শিষ্য ভক্তগণের মধ্যে রঘুনাথ দাস কঠোর বৈরাগ্য ও সন্ন্যাসের আদর্শস্বরূপ ছিলেন।

মহাপ্রভু সকলকে গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে উপদেশ দিতেন না। যোগ্য পাত্র বাছিয়া দুই চারিজনকে মাত্র সন্ন্যাসের উপদেশ দিয়াছিলেন। আর অধিকাংশ ভক্তকেই তিনি গৃহে থাকিয়াই ধর্মাচরণ করিবার উপদেশ দিতেন। এবং সেই বিষয়ে পথ দেখাইবার জন্য স্বয়ং নিত্যানন্দ প্রভুকে তিনি সন্ন্যাস ত্যাগ করিয়া গৃহী হইতে বাধ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু যে একবার সকল দিক বিবেচনা করিয়া সন্ন্যাস লইত, তাহাকে সন্ন্যাসীর কঠোর আদর্শ পালন করিতে হইত। এই ছিল তাঁহার আদেশ। বৈরাগ্যের সামান্য ত্রুটিবিচ্যুতিও তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। 'ছোট হরিদাস' নামে পরিচিত একজন ভক্ত বৈষ্ণবকে এই কারণে তিনি কঠোর দণ্ড দিয়াছিলেন।

ছোট হরিদাস মহাপ্রভুর একজন সন্ন্যাসী বা বৈরাগী ভক্ত ছিলেন। তাঁহার

সুমধুর কণ্ঠের কীর্তন শুনিয়া মহাপ্রভুর মনে আনন্দ হইত। সন্ন্যাসধর্ম পালনে ত্রুটি দেখিয়া এই ছোট হরিদাসের প্রতি মহাপ্রভু কঠোর দণ্ড বিধান করিয়াছিলেন।

ভগবান আচার্য নামে মহাপ্রভুর একজন ভক্ত ছিলেন। তিনি একদিন মহাপ্রভুকে স্বগৃহে নিমন্ত্রণ করেন। মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, অথচ উত্তম চাউল নাই। ভগবান আচার্য ছোট হরিদাসকে বলিলেন, তুমি মাধবী দেবীর নিকটে গিয়া আমার নাম করিয়া এক মণ উত্তম তণ্ডুল চাহিয়া আন। মাধবী দেবী মহাপ্রভুর অন্যতম পরম ভক্ত শিখি মাহিতীর ভগিনী। মাধবী নিজেও পরম ভক্তিমতী এবং বয়সে প্রবীণা। ছোট হরিদাস ভগবান আচার্যের অনুরোধ মত মাধবী দেবীর নিকটে গিয়া উত্তম চাউল চাহিয়া আনিলেন। আচার্য মহাপ্রভুর জন্য সেই চাউলের অন্ন রন্ধন করিলেন।

মধ্যাহ্নে মহাপ্রভু ভগবান আচার্যের গৃহে খাইতে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—এ চাউল কোথায় পাইলে, আচার্য? আচার্য বলিলেন—ছোট হরিদাস গিয়া মাধবী দেবীর নিকট হইতে চাহিয়া আনিয়াছে।

মহাপ্রভু চাউলের প্রশংসা করিয়া আহার শেষ করিলেন, আর কোন কথা বলিলেন না। নিজ গৃহে ফিরিয়া আসিয়া মহাপ্রভু সেবক গোবিন্দকে আদেশ দিলেন—আজ হইতে ছোট হরিদাসকে আমার নিকটে আসিতে দিবে না। ছোট হরিদাস এই আদেশ জানিতে পারিয়া মনে মনে অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন, তিনি বুঝিতে পারিলেন না, মহাপ্রভু কি অপরাধে তাঁহার প্রতি এই কঠোর দণ্ড বিধান করিয়াছেন। মনের ক্ষোভে ছোট হরিদাস তিনদিন উপবাস করিয়া রহিলেন।

ছোট হরিদাসের এই অবস্থা এবং মহাপ্রভুর আজ্ঞা শুনিয়া স্বরূপ গোস্বামী প্রভৃতি মহাপ্রভুর নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—ছোট হরিদাস কি অপরাধ করিয়াছে যে, তাহার প্রতি এই দণ্ড হইল?

মহাপ্রভু কহিলেন—ছোট হরিদাস ঘোর অধর্মাচরণ করিয়াছে,—সে মাধবীর নিকটে গিয়া উত্তম চাউল মাগিয়া আনিয়াছে। বৈরাগী হইয়া যে স্ত্রীলোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ বা সম্ভাষণ করে, সে ধর্মত্যাগী অধম।

ক্ষুদ্র জীব সব মর্কট বৈরাগ্য করিয়া,
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া।*

আমি এমন ধর্মত্যাগী, মর্কট বৈরাগীর মুখ দর্শন করিতে চাই না।

মহাপ্রভু ভিতরে চলিয়া গেলেন।

আর একদিন স্বরূপ গোস্বামী মহাপ্রভুর নিকট পুনর্বার ছোট হরিদাসের

---

* মর্কট বৈরাগ্য—নকল বৈরাগ্য, বৈরাগ্যের ভাণ। প্রকৃতি—স্ত্রীজাতি।

হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, বলিলেন—এই অল্প অপরাধে এবার তাহাকে ক্ষমা কর, ভবিষ্যতে সে আর এরূপ করিবে না।

মহাপ্রভু কহিলেন—যে বৈরাগী নারীকে সম্ভাষণ করে, সেই ভ্রষ্টচরিত্র বৈরাগীর দর্শন বা স্পর্শ আমি সহ্য করিতে পারি না। ছোট হরিদাসের জন্য আর আমাকে বলিও না, নিজের নিজের কাজে যাও। যদি পুনরায় একথা উত্থাপন কর, তবে আমি এস্থান পরিত্যাগ করিব।

স্বরূপ গোঁসাই মহাপ্রভুর এই উত্তর শুনিয়া সভয়ে ফিরিয়া আসিলেন।

পরমানন্দ পুরী মহাপ্রভুর গুরুভাই, মহাপ্রভু তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করেন। সকল ভক্ত যাইয়া পরমানন্দ পুরীকে বলিলেন, মহাপ্রভুকে ছোট হরিদাসের জন্য অনুরোধ করুন, নতুবা সে উপবাসে প্রাণত্যাগ করিবে।

পরমানন্দ পুরীর মনে দয়া হইল। তিনি একাকী মহাপ্রভুর নিকটে গিয়া একথা সেকথার পর ছোট হরিদাসের প্রসঙ্গ উঠাইলেন এবং তাহাকে ক্ষমা করিতে অনুরোধ করিলেন।

মহাপ্রভু কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন—গোঁসাই, আপনি অন্যান্য ভক্তদের লইয়া এই পুরীতে বাস করুন, আমি পুরী ছাড়িয়া আলালনাথে গিয়া থাকিব। সঙ্গে কেবলমাত্র গোবিন্দ রহিবে। মহাপ্রভুর এই ভাব দেখিয়া পুরী গোঁসাই আর কিছু না বলিয়া আস্তে-ব্যস্তে উঠিয়া আসিলেন। স্বরূপ গোঁসাই প্রভৃতি ছোট হরিদাসকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন—মহাপ্রভু সদয়হৃদয়, আজ তোমার উপর তাঁহার ক্রোধ হইয়াছে বটে, কিন্তু কিছুদিন অপেক্ষা করিলে, তিনি তোমার অপরাধ ক্ষমা করিবেন ও তোমার প্রতি প্রসন্ন হইবেন। অতএব উপবাস ত্যাগ করিয়া অন্নজল গ্রহণ কর। উহাতে মহাপ্রভু আরও বেশী বিরক্ত হইবেন। ছোট হরিদাস অন্নজল গ্রহণ করিলেন।

কিন্তু দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, মহাপ্রভু ছোট হরিদাসের প্রতি প্রসন্ন হইলেন না। ছোট হরিদাস মহাপ্রভুর নিকটে যাইতে পারেন না, তাঁহাকে দর্শন করিবার অধিকারও তাঁহার নাই। ছোট হরিদাস এই কঠোর দন্ড সহ্য করিতে না পারিয়া পুরীত্যাগ করিয়া প্রয়াগ তীর্থে গমন করিলেন এবং ত্রিবেণী সঙ্গমে দেহত্যাগ করিলেন।

এক বৎসর পরে মহাপ্রভু একদিন বলিলেন—ছোট হরিদাস কোথায়? তাহাকে আমার নিকট লইয়া আইস।

ছোট হরিদাস কোথায় কেহই জানে না। অবশেষে প্রয়াগ হইতে প্রত্যাগত একজন বাঙ্গালী ভক্ত ছোট হরিদাসের ত্রিবেণী তীর্থে দেহত্যাগের বিবরণ জানাইলেন! মহাপ্রভু উত্তরে শুধু বলিলেন—সন্ন্যাসী হইয়া নারী সম্ভাষণ করিলে এইরূপ প্রায়শ্চিত্তই করিতে হয়।

অনেকেরই মনে হইতে পারে, ভক্তিমতী প্রবীণা মাধবী দেবীর সঙ্গে

সাক্ষাৎ করিয়া ছোট হরিদাস বিশেষ কিছু অপরাধ করে নাই; সুতরাং তাহার জন্য কঠোর দন্ড বিধান করা মহাপ্রভুর অন্যায় হইয়াছে। কিন্তু মহাপ্রভু লোক-শিক্ষার জন্যই এরূপ করিয়াছিলেন। তিনি বোধ হয় লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, তাঁহার সন্ন্যাসী শিষ্যগণ কোন কোন স্থানে শিথিলচরিত্র ও সংযমভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছে। সুতরাং তাহাদিগকে সন্ন্যাসের আদর্শ শিখাইবার জন্য ছোট হরিদাসের প্রতি এই কঠোর দন্ড দিলেন। এই দন্ড দেখিয়া অন্যান্য সন্ন্যাসী ভক্তদের মনে ভয় হইল, তাহারা সন্ন্যাসের আদর্শ পালন করিবার জন্য পূর্বাপেক্ষা অধিকতর সাবধান হইল। কেবল সেকালের নয়, একালের সন্ন্যাসী ও বৈরাগীরাও মহাপ্রভুর এই আচরণ হইতে অনেক শিক্ষা লাভ করিতে পারেন।

২০

নীলাচলে রূপসনাতন ও হরিদাস ঠাকুর

মহাপ্রভু রূপসনাতনকে বৃন্দাবনে বাস করিয়া প্রেম ও ভক্তি প্রচার করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। রূপসনাতনও সে আদেশ মানিয়া লইয়াছিলেন। মহাপ্রভুর অনুমতিক্রমে একবার মাত্র তাঁহারা নীলাচলে মহাপ্রভুকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। প্রথমে রূপ গোস্বামী মহাপ্রভুকে দর্শন করিবার জন্য নীলাচলে গমন করেন। মহাপ্রভু মহাসমাদরে তাঁহাকে সম্বর্ধনা করিলেন এবং হরিদাস ঠাকুরের কুটীরে তাঁহাকে আশ্রয় দিলেন। রূপ গোস্বামী নিজেকে অন্ত্যজ পতিত মনে করিতেন, জগন্নাথ মন্দিরেও তিনি সাহস করিয়া প্রবেশ করিতেন না। সুতরাং অন্যান্য ভক্তগণের সঙ্গে না থাকিয়া "যবন হরিদাস ঠাকুরের" নিকটে থাকাই তাঁহার পক্ষে ভাল হইল। হরিদাস ঠাকুর ও তিনি উভয়ে সর্বদা ভগবানের কথা আলোচনা করিতেন, একসঙ্গে কীর্তন ভজন করিতেন। ক্রমে অন্যান্য ভক্তগণও আসিয়া হরিদাস ঠাকুরের কুটীরে কীর্তন ভজন প্রভৃতিতে যোগ দিতে লাগিলেন এবং শীঘ্রই ঐ কুটীর ভক্তদের প্রধান মিলন-কেন্দ্র হইয়া উঠিল। স্বয়ং মহাপ্রভুও অনেক সময়ে আসিয়া এই মিলনানন্দে যোগ দিতেন। এইখানে বসিয়াই রূপ গোস্বামী 'ললিত মাধব' ও 'বিদগ্ধ মাধব' নামক তাঁহার দুইখানি প্রসিদ্ধ নাটক রচনা করেন। মহাপ্রভু, রায় রামানন্দ ও অন্যান্য ভক্তগণ সকলেই এই নাটক শুনিয়া শতমুখে প্রশংসা করিয়াছিলেন। এইরূপে কয়েকমাস নীলাচলে মহাপ্রভুর সঙ্গে কাটাইয়া রূপ গোস্বামী গৌড়ের পথে বৃন্দাবনে ফিরিয়া গেলেন। তারপর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বৃন্দাবনে রাধাকুণ্ডে থাকিয়া তিনি বৈষ্ণবধর্মপ্রচারে নিরত ছিলেন।

রূপ গোস্বামী যখন গৌড়ের পথ দিয়া বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসিতেছিলেন, তখন সনাতন গোস্বামী কাশী হইয়া সেই "ঝারিখণ্ডের পথে" নীলাচলে মহাপ্রভুকে দর্শন করিতে আসিলেন। পূর্বেই বলিয়াছি, এই ঝারিখণ্ড ভীষণ জঙ্গলপরিপূর্ণ, হিংস্রজন্তু প্রভৃতির আবাসভূমি, খাদ্যাদিরও এখানে অভাব। তার উপরে, এখানকার জল ভাল নয়। এই পথে আসিতে আসিতে দূষিত খনিজ পদার্থ মিশ্রিত জল পান করিয়া সনাতনের দেহে ব্রণ ও কণ্ডূয়ন প্রভৃতি চর্মরোগ হইল। তাহা হইতে রস রক্ত প্রভৃতি ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

সনাতন একেই নিজেকে 'নীচজাতি' মনে করেন, তার উপরে এই অবস্থা দেখিয়া তাঁহার মনে বিষম দুঃখ হইল। ভাবিলেন—নীলাচলে গিয়া জগন্নাথ দর্শন আমার পক্ষে সম্ভব নয়; কেননা আমার ন্যায় নীচজাতির মন্দিরে

প্রবেশের অধিকার নাই। মহাপ্রভুকেও সর্বদা দর্শন করিতে পারিব না, কেননা মহাপ্রভুর বাসা জগন্নাথ মন্দিরের নিকটে এবং সেই পথ দিয়া জগন্নাথের সেবকগণ সর্বদাই যাতায়াত করেন। আমার এই অপবিত্র, রক্তরসপূর্ণ দেহের স্পর্শ হইলে তাঁহাদের দেহ অপবিত্র হইতে পারে। অতএব আমার পক্ষে শ্রীজগন্নাথের রথযাত্রার সময়ে রথচক্রতলে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করাই ভাল।

এই সব ভাবিয়া সনাতন গোস্বামী পুরীতে আসিয়া মহাপ্রভুর নিকটে না গিয়া নীচ পতিত সকলের আশ্রয় হরিদাস ঠাকুরের বাসার আশ্রয় লইলেন। হরিদাস তাঁহাকে পরম স্নেহে অভ্যর্থনা করিলেন। মহাপ্রভুকে দেখিবার জন্য সনাতনের প্রাণ উৎকণ্ঠিত, অথচ নিজে তাঁহার নিকটে যাইতে সাহস করিতেছেন না। এমন সময় স্বয়ং মহাপ্রভুই হরিদাসের কুটীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সনাতন দূর হইতে মহাপ্রভুকে দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিলেন। মহাপ্রভুও সনাতনকে আলিঙ্গন করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। কিন্তু সনাতন পিছু হটিয়া গেলেন, বলিলেন—

মোরে না ছুঁইও প্রভু পড়ি তোমার পায়।
একে নীচ অধম, তায় কণ্ডুরসা গায়॥

মহাপ্রভু সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না, জোর করিয়া সনাতনকে আলিঙ্গন করিলেন, সনাতনের গায়ের কণ্ডুরস মহাপ্রভুর দেহে লাগিল।

মহাপ্রভু কহিলেন—সনাতন তুমি আসিয়াছ, ভালই করিয়াছ। এখানে হরিদাসের কুটীরেই থাক। তাঁহার সঙ্গে কৃষ্ণকথা-আলোচনায় ও কৃষ্ণনাম-কীর্তনে কালযাপন কর।

সনাতন হরিদাসের কুটীরেই রহিয়া গেলেন। তিনি জগন্নাথমন্দিরে যাইতেন না, দূর হইতেই মন্দিরের নীল-চক্র দেখিয়া আনন্দ অনুভব করিতেন। মহাপ্রভু প্রায়ই হরিদাসের কুটীরে আসিতেন এবং হরিদাস ও সনাতনের সঙ্গে কৃষ্ণকথা আলোচনা করিতেন। অন্যান্য ভক্তগণও আসিয়া যোগদান করিতেন।

একদিন মহাপ্রভু কথায় কথায় সহসা সনাতন গোস্বামীকে বলিলেন—তুমি কি মনে কর, দেহত্যাগ করিলেই শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া যায়? শ্রীকৃষ্ণকে পাইবার একমাত্র উপায় প্রেম ও ভক্তি। অতএব আত্মহত্যা করিবার দুর্বুদ্ধি ছাড়িয়া নিরন্তর কৃষ্ণভজনা কর, তাহা হইলে তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে, তুমি কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিবে।

সনাতন আশ্চর্য হইয়া গেলেন, তিনি যে জগন্নাথের রথের তলে পড়িয়া আত্মহত্যার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তাহা মহাপ্রভু জানিলেন কিরূপে? তিনি কি অন্তর্যামী? সনাতন অধোমুখে নীরব হইয়া রহিলেন।

মহাপ্রভু পুনরায় কহিলেন—তুমি যে নিজেকে নীচ মনে কর, এ তোমার পরম ভ্রম। কে নীচ, আর কে উচ্চ? ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিলেই সে 'উচ্চ'

হয় না, আর শূদ্রের গৃহে জন্মিলেই কেহ নীচ হয় না। যে ভগবানে ভক্তি করে, সেই শ্রেষ্ঠ, সেই কুলীন। বরং দীন পতিতকেই ভগবান অধিক দয়া করেন, কুলীন ও পণ্ডিত অভিমানীর প্রতি ভগবান প্রসন্ন হন না।

নীচ জাতি নহে কৃষ্ণ ভজনের অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥
যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতিকুলাদি বিচার॥
দীনেরে অধিক দয়া করেন ভগবান।
কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান॥*

সনাতন কাতর ভাবে বলিলেন—প্রভু, আমি অধম, পাপী, আমার এই অপবিত্র দেহে আপনার কোন্ কার্য সাধিত হইবে?

মহাপ্রভু হাসিয়া বলিলেন—সনাতন, তোমার কি মনে নাই যে, তুমি তোমার দেহমনপ্রাণ আমাকেই সমর্পণ করিয়াছ? অতএব তোমার দেহের পবিত্রতা বা যোগ্যতা সম্বন্ধে তোমার বিচার করিবার অধিকার নাই। তোমার দেহ আমার সম্পত্তি, এই দেহে আমার বহু প্রয়োজন আছে, আমি ইহাকে ভগবানের কার্যে নিয়োজিত করিব। আমি তোমাকে পূর্বেই আজ্ঞা দিয়াছি যে, বৃন্দাবনে থাকিয়া প্রেমভক্তি প্রচার করিতে হইবে। এখন পুনরায় সেই আজ্ঞা দিতেছি।

মহাপ্রভু চলিয়া গেলে, হরিদাস ঠাকুর সনাতনকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—তুমি ধন্য, তোমার দেহ প্রভুর কাজে লাগিবে। কিন্তু আমি অধম, আমার এই অপবিত্র দেহে প্রভুর কোন প্রয়োজন নাই।

সনাতন কহিলেন—ঠাকুর, তোমার মত ভাগ্যবান আর কে আছে? তোমার এই দেহের দ্বারাই মহাপ্রভু হরিনাম প্রচার করিতেছেন। তুমি প্রত্যহ তিন লক্ষ নাম জপ কর, এর চেয়ে মহাযজ্ঞ আর কি হইতে পারে? তুমি সকলের গুরু, জগতের সাধকদের শ্রেষ্ঠ।

এইরূপে সনাতন হরিদাসের কুটীরে থাকিয়া মহাপ্রভুকে দর্শন ও ভজন সাধন করিতে লাগিলেন। রায় রামানন্দ, গদাধর, জগদানন্দ, পুরী, ভারতী প্রভৃতি ভক্তগণের সঙ্গেও ক্রমে ক্রমে তাঁহার পরিচয় হইল। পরম বৈষ্ণব সনাতন নিজেকে যে সত্যই "তৃণবৎ নীচ" মনে করিতেন, তাহার একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়া স্বয়ং মহাপ্রভু ও ভক্তগণ চমৎকৃত হইলেন। জ্যৈষ্ঠমাস, দ্বিপ্রহর হইতে না হইতেই সমুদ্রতীরের বালি তাতিয়া অগ্নিতুল্য হইয়া উঠে। কাহার সাধ্য সে সময়ে সমুদ্রতীরের পথে যাতায়াত করে! এই সময়ে একদিন মহাপ্রভু সকাল বেলায় সমুদ্রতীরে যমেশ্বর টোটায় আসিলেন। ক্রমে সেখানে বেলা দ্বিপ্রহর

---

* মহাপ্রভুর এই বাণী চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হইয়া থাকিবার যোগ্য। মানব-ধর্মের এত বড় আদর্শ আর কেহ কখনও দেখাইয়াছেন কি?

হইল। ভক্তগণ অনুরোধ করিলেন, সেইখানেই মধ্যাহ্নভোজন করিতে হইবে। মহাপ্রভু স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু কহিলেন যে, সনাতনকে ডাকিয়া পাঠাও, সেও এখানে আসিয়া মধ্যাহ্ন ভোজন করিবে। মহাপ্রভুর আহ্বানে সনাতনের বড় আনন্দ হইল। কিন্তু তিনি তো মন্দিরের পথ দিয়া যমেশ্বর টোটায় যাইবেন না, নীচ পতিত তিনি, যদি কোন জগন্নাথ সেবকের দেহে তাঁহার স্পর্শ লাগে। অতএব সোজা সমুদ্রতীরে বালির মধ্য দিয়াই তিনি যাইতে লাগিলেন। বেলা দ্বিপ্রহর, বালি একেবারে আগুন হইয়া উঠিয়াছে, নগ্নপদ সনাতনের পা পুড়িয়া ফোস্কা পড়িয়া গেল। কিন্তু মনের আনন্দে তাঁহার সে জ্ঞান ছিল না। যমেশ্বর টোটায় আসিয়া পৌঁছিলে, মহাপ্রভু তাঁহার অবস্থা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—সনাতন, কোন্ পথে আসিয়াছ?

সনাতন উত্তর দিলেন,—সমুদ্রতীরের পথে। মহাপ্রভু বিস্মিত হইয়া বলিলেন—সে কি? সমুদ্রতীরের অগ্নিতুল্য বালুকার উপর দিয়া এই দ্বিপ্রহরে তুমি আসিলে কিরূপে? তোমার পায়ে যে ফোস্কা পড়িয়াছে, তুমি ভাল করিয়া হাঁটিতে পারিতেছ না।

সনাতন লজ্জিত ভাবে বলিলেন—বিশেষ কিছু কষ্ট হয় নাই, পায়ে যে ফোস্কা পড়িয়াছে, তাহাও আমি জানিতে পারি নাই। আমি অস্পৃশ্য পতিত, মন্দিরের পথ দিয়া আসিবার অধিকার তো আমার নাই। কাজেই সমুদ্রতীরের পথেই আসিয়াছি।

মহাপ্রভু সনাতনের এই দৈন্য ও বিনয়ে পরম সন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—সনাতন, তুমিই ধন্য, এরূপ ভক্তি ও বৈরাগ্য আর কয়জনের আছে? কিন্তু তুমি নীচ পতিত নহ, ভক্তশ্রেষ্ঠ, তোমাকে স্পর্শ করিলে লোকে পবিত্র হয়।

কথিত আছে, মহাপ্রভুর আলিঙ্গনে সনাতনের দেহের কণ্ডুরসা দূর হইয়া তাহা নির্মল চন্দনের মত সুগন্ধ হইয়াছিল।

নীলাচলে কয়েক মাস থাকিয়া সনাতন বৃন্দাবনে ফিরিয়া গেলেন এবং মহাপ্রভুর আজ্ঞামত প্রেম ও ভক্তি প্রচার করিতে লাগিলেন।

এদিকে মহাপ্রভুর অন্যতম শ্রেষ্ঠভক্ত হরিনামপ্রচারক হরিদাস ঠাকুর ক্রমে অতিবৃদ্ধ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার দেহ ক্রমে ব্যাধিগ্রস্ত ও অপটু হইতে লাগিল। একদিন মহাপ্রভুর সেবক গোবিন্দ হরিদাসের জন্য তাঁহার কুটীরে মহাপ্রসাদ লইয়া গিয়া দেখিলেন, হরিদাস ঠাকুর শয়ন করিয়া আছেন এবং মৃদুস্বরে হরিনাম উচ্চারণ করিতেছেন। গোবিন্দ কহিলেন—হরিদাস ঠাকুর, উঠিয়া ভোজন কর। হরিদাস বলিলেন, তিনি সেদিন উপবাস করিবেন, তবে মহাপ্রসাদ অবজ্ঞা করিতে পারেন না, এই বলিয়া মহাপ্রসাদকে শিরে ধারণ করিয়া এক কণিকা মুখে দিলেন।

মহাপ্রভু হরিদাসের এই অসুখের কথা শুনিয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন—হরিদাস, ভাল আছ? হরিদাস নমস্কার করিয়া বলিলেন—আমার শরীর সুস্থ আছে, কিন্তু মন অসুস্থ। আমি সংখ্যাকীর্তন পূর্ণ করিতে পারিতেছি না।

মহাপ্রভু বলিলেন—এখন বৃদ্ধ হইয়াছ, শরীর অপটু, নাম সংখ্যা কমাইয়া দাও। আর তুমি তো সিদ্ধপুরুষ, সাধনার আর তোমার প্রয়োজনই বা কি? হরিনাম প্রচার করিবার জন্য তুমি আসিয়াছিলে, সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। এখন যতটুকু পার, নাম সংকীর্তন কর।

হরিদাস বলিলেন—আমি নীচ অধম পতিত জাতি, তুমি আমাকে ভক্তরূপে গণ্য করিয়া আমার বহু সম্মান করিয়াছ। কিন্তু কিছুদিন হইতে আমার মনে এক আশঙ্কা হইয়াছে। আমার মনে হইতেছে, তুমি শীঘ্র এ পৃথিবীর লীলা সংবরণ করিবে। আমার একান্ত ইচ্ছা, তোমার পূর্বেই এই দেহ ত্যাগ করি। এ ইচ্ছা তোমাকে পূর্ণ করিতেই হইবে।

মহাপ্রভু বিষণ্ণচিত্তে বলিলেন—হরিদাস, শ্রীকৃষ্ণ দয়াময়, তোমার প্রার্থনা তিনি অবশ্যই পূর্ণ করিবেন। কিন্তু তুমি আমাকে ছাড়িয়া যাইবে, এ আমি কিরূপে সহ্য করিব? তোমাদের লইয়াই তো আমার যাহা কিছু সুখ—আনন্দ!

হরিদাস বলিলেন—প্রভু, তোমার ভক্তগণের মধ্যে আমি তুচ্ছ, নগণ্য, আমার অভাবে তোমার কোনই ক্ষতি হইবে না। অতএব আমাকে প্রসন্ন মনে বিদায় দাও। তোমাকে সম্মুখে দেখিতে দেখিতে যেন আমি এই দেহ ত্যাগ করিতে পারি।

মহাপ্রভু বুঝিলেন, হরিদাসের ইহলোক হইতে বিদায় লইবার দিন সমাগত। পরদিন প্রভাতে মহাপ্রভু সমস্ত ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়া হরিদাসের কুটীরে আসিলেন। হরিদাস অঙ্গনে শয়ন করিলেন এবং তাঁহার চতুর্দিকে বেড়িয়া ভক্তগণ কীর্তন আরম্ভ করিলেন। মহাপ্রভু সকলের সম্মুখে হরিদাসের মহিমা কীর্তন করিতে লাগিলেন। হরিদাস মহাপ্রভু ও ভক্তবৃন্দের চরণরেণু মাথায় লইয়া হরিনাম শুনিতে শুনিতে প্রাণত্যাগ করিলেন। পূর্বকালে ভীষ্মের যেমন ইচ্ছামৃত্যু হইয়াছিল, হরিদাসের মৃত্যুও তাহারই সঙ্গে তুলনীয়। মহাযোগীর মতই তিনি মৃত্যুকে স্বচ্ছন্দে বরণ করিলেন।

মহাপ্রভু হরিদাসের মৃতদেহ কোলে করিয়া প্রেমাবেশে অঙ্গনে নৃত্য করিতে লাগিলেন। অন্যান্য ভক্তগণও নৃত্য ও কীর্তন করিতে লাগিলেন। এইরূপে কতক্ষণ নৃত্য ও কীর্তনের পর, হরিদাস ঠাকুরের মৃতদেহ 'বিমানে' চড়াইয়া সকলে মিলিয়া সমুদ্রতীরে লইয়া গেলেন। সেখানে মহাসমারোহে সঙ্কীর্তন সহ হরিদাসের শবদেহ বালুকামধ্যে সমাহিত করা হইল।

সৎকারের পর সমুদ্রজলে স্নান করিয়া মহাপ্রভু ভক্তগণসহ জগন্নাথ মন্দিরের সিংহদ্বারে আসিলেন এবং নিজে অঞ্চল পাতিয়া দোকানীদের নিকট বলিলেন—আমার হরিদাসের শ্রাদ্ধ, তোমাদিগকে কিছু কিছু ভিক্ষা দিতে হইবে। দোকানীরা মহাপ্রভুর এই দৈন্য দেখিয়া বিগলিতচিত্ত হইয়া, যাহার যে দ্রব্য—প্রচুর পরিমাণে দান করিল। এইরূপে নানাপ্রসাদ লইয়া মহাপ্রভু হরিদাসের কুটীরের অঙ্গনে উপস্থিত হইলেন এবং সমস্ত বৈষ্ণবকে সারি দিয়া ভোজনে বসাইয়া দিলেন। কাশীনাথ মিশ্র, বাণীনাথ পট্টনায়ক প্রভৃতিও সংবাদ পাইয়া, আরও অনেক মহাপ্রসাদ পাঠাইয়া দিলেন। মহাপ্রভু নিজে সেই সব মহাপ্রসাদ সকলকে পরিবেশন করিলেন, বৈষ্ণবেরা তৃপ্তি সহকারে ভোজন করিয়া হরিদাসের মহিমা স্মরণ করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু সেই শ্রাদ্ধসভায় হরিদাসের মহিমা কীর্তন করিয়া বলিলেন—

হরিদাসের বিজয়োৎসব যে কৈল দর্শন।
যে তাঁহা নৃত্য কৈল যে কৈল কীর্তন॥
যে তারে বালুকা দিতে করিল গমন।
তার মধ্যে—মহোৎসবে যে কৈল ভোজন॥
অচিরে সবাকার হইবে কৃষ্ণ প্রাপ্তি।
হরিদাস দরশনে হয় ঐছে শক্তি॥
কৃপা করি কৃষ্ণ মোরে দিয়াছিল সঙ্গ।
স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা হৈল সঙ্গভঙ্গ॥
হরিদাসের ইচ্ছা যবে হৈল চলিতে।
আমার শকতি তারে নারিল রাখিতে॥
ইচ্ছামাত্র কৈল নিজ প্রাণ নিষ্ক্রামণ।
পূর্বে যেন শুনিয়াছি ভীষ্মের মরণ॥
হরিদাস আছিল পৃথিবীর শিরোমণি।
তাহা বিনা রত্নশূন্য হইল মেদিনী॥
জয় জয় হরিদাস বলি কর ধ্বনি।
এত বলি মহাপ্রভু নাচেন আপনি॥
সবে গায় জয় জয় জয় হরিদাস।
নামের মহিমা সেই করিল প্রকাশ॥

এইরূপে ভক্তশ্রেষ্ঠ নামমাহাত্ম্য-প্রচারকারী হরিদাস ঠাকুর ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। মহাপ্রভু হরিদাসকে হারাইয়া অন্তরে অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন।

২১

নীলাচলে ভক্তসমাগম

বল্লভ ভট্ট বৈষ্ণব ও পণ্ডিত, তাঁহার ভাগবতের টীকা বিখ্যাত। মহাপ্রভু যখন বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া প্রয়াগে আসেন, তখন বল্লভ ভট্টের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া সাদরে স্বগৃহে লইয়া যান,—এসব কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। সেই বল্লভ ভট্ট নীলাচলে শ্রীজগন্নাথ ও মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গকে দর্শন করিতে আসিলেন।

মহাপ্রভু ভক্তগণের সঙ্গে বসিয়াছেন, এমন সময় বল্লভ ভট্ট আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। মহাপ্রভুও প্রেমভরে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া সসম্মানে নিকটে বসাইলেন। বল্লভ ভট্ট সবিনয়ে বলিলেন, তোমাকে বহুদিন হইতে দেখিবার ইচ্ছা হইয়াছিল, এবার জগন্নাথ সে বাসনা পূর্ণ করিলেন। তোমার কথা যে স্মরণ করে, সেই পবিত্র হয়, তোমার দর্শনে যে মন পবিত্র হইবে, সে আর আশ্চর্য কি! কলিকালে নামসঙ্কীর্তনই পরম ধর্ম, তুমিই সেই নাম-সঙ্কীর্তনের প্রবর্তক। তুমি যে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের মত শক্তিধর, তাহাতে সন্দেহ নাই।

মহাপ্রভু বল্লভ ভট্টের এই প্রশংসার উত্তরে বলিলেন—ভট্ট, তুমি মহামতি, সুতরাং তুমি যে আমাকে প্রশংসা করিবে, তাহা আশ্চর্য নয়। কিন্তু আমি তোমার প্রশংসার যোগ্য পাত্র নহি। আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী, কৃষ্ণভক্তি আমার নাই। যে সব কৃষ্ণভক্ত সাধু ব্যক্তিগণ এখানে রহিয়াছেন, তাঁহাদেরই সঙ্গগুণে ও মহৎ দৃষ্টান্তে আমার মন কিছু নির্মল হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছে। ভক্তিশাস্ত্রে পণ্ডিত অদ্বৈত আচার্য, প্রেমের সাগর অবধূত নিত্যানন্দ, ষড়দর্শন-বেত্তা জগদ্‌গুরু বাসুদেব সার্বভৌম, রসিকশ্রেষ্ঠ ভক্ত রায় রামানন্দ, মূর্তিমান্ প্রেমরস স্বরূপ দামোদর, মহাভাগবত হরিদাস ঠাকুর,—ইঁহারাই জগতে কৃষ্ণনাম ও প্রেম প্রচার করিতেছেন,—আমার যদি কিছু কৃষ্ণভক্তি হইয়া থাকে, তবে তাঁহাদের প্রভাবেই হইয়াছে, আমার নিজের কোন গুণ নাই।

বল্লভ ভট্টের মনে মনে অভিমান ছিল যে, তিনি পণ্ডিত, বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত সমস্ত জানেন, ভাগবতের অর্থ তাঁহার মত কেহ করিতে পারে নাই। মহাপ্রভু বল্লভ ভট্টের মনের এই অভিমান জানিতেন, সেই কারণেই তাঁহার গর্ব দূর করিবার জন্য তিনি অদ্বৈতাচার্য প্রভৃতি ভক্তগণের গুণকীর্তন করিলেন। মহাপ্রভুর মুখে ভক্তগণের এই মহিমা শুনিয়া বল্লভ ভট্টের তাঁহাদিগকে দেখিবার ইচ্ছা হইল। জিজ্ঞাসা করিলেন—ইঁহারা সব কোথায় থাকেন, আমি তাঁহাদিগকে

দর্শন করিব। মহাপ্রভু কহিলেন—ইঁহারা সকলে বর্তমানে নীলাচলেই রহিয়াছেন, কেহ কেহ গৌড় হইতে রথযাত্রা দেখিবার জন্য আসিয়াছেন।

মহাপ্রভু বল্লভ ভট্টের প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন,—একদিন ভক্তগণ সকলে মহাপ্রভুকে দর্শন করিতে আসিলে মহাপ্রভু বল্লভ ভট্টকে সকলের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিলেন। বল্লভ ভট্ট বৈষ্ণবগণের তেজ দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন এবং নিজে প্রচুর মহাপ্রসাদ আনিয়া সকলকে পরম যত্নে ভোজন করাইলেন।

রথযাত্রার দিনে মহাপ্রভু ভক্তগণকে লইয়া সাত সম্প্রদায়ে বিভক্ত করিয়া প্রতিবৎসরের ন্যায় রথের অগ্রে কীর্তন ও নৃত্য করিলেন। বল্লভ ভট্ট সে দৃশ্য দেখিয়া পুলকিত হইলেন।

কিন্তু বল্লভ ভট্টের মনের অভিমান দূর হয় না। একদিন ভট্ট মহাপ্রভুর নিকটে গিয়া সবিনয়ে নিবেদন করিলেন—আমি ভাগবতের টীকা কিছু লিখিয়াছি। যদি তুমি অনুগ্রহ করিয়া শ্রবণ কর, আমি ধন্য হই।

মহাপ্রভু কহিলেন—ভাগবতের অর্থ বুঝিবার অধিকার আমার নাই, কেবলমাত্র শুনিবার অধিকার আছে। কৃষ্ণনাম জপ আমার জীবনের একমাত্র ধর্ম, সেই ধর্মই আমি ঠিকমত পালন করিতে পারি না, ভাগবতের টীকা শুনিবার অবসর আমার কোথায়?

বল্লভ ভট্ট এইরূপে প্রত্যাখ্যাত হইয়া গদাধর পণ্ডিতের কুটীরে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে ভাগবতের টীকা শুনাইতে লাগিলেন। গদাধর অতি নিরীহ ভাল মানুষ, শুনিবার ইচ্ছা ও সময় না থাকিলেও তিনি ভট্টকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারিতেন না। গদাধরকে জোর করিয়া ভাগবতের টীকা শুনাইয়া বল্লভ ভট্টের মন কথঞ্চিৎ শান্ত হইত।

বল্লভ ভট্ট প্রতিদিন মহাপ্রভুর সভায় যাইতেন এবং অদ্বৈত আচার্য প্রভৃতি ভক্তগণের সঙ্গে নানা বিষয়ে বিচার করিতেন। কিন্তু বিচারে তাঁহারই হার হইত। ইহাতে তিনি অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ণ হইতেন। ভাবিতেন—আমার পাণ্ডিত্য বৃথা হইল, ইঁহাদিগকে আমি পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতে পারিলাম না।

একদিন বল্লভ ভট্ট দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া ভাগবতের টীকা শুনাইবার জন্য মহাপ্রভুর সভায় গেলেন। অন্যান্য ভক্তগণও সেখানে বসিয়াছিলেন। বল্লভ ভট্ট সভায় বসিয়া মহাপ্রভুকে নমস্কার করিয়া বলিলেন,—আমি ভাগবতের শ্রীধর স্বামিকৃত ব্যাখ্যা খণ্ডন করিয়া এই টীকা লিখিয়াছি, আপনারা শ্রবণ করুন। শ্রীধর স্বামীর ব্যাখ্যা ভ্রান্ত, তাহার সর্বত্র সামঞ্জস্য নাই। অতএব স্বামীকে আমি মানি না।

মহাপ্রভু মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—যে স্বামীকে মানে না, সে বেশ্যা মধ্যে গণ্য। মহাপ্রভু উঠিয়া গেলেন। বল্লভ ভট্ট লজ্জিত হইয়া গৃহে ফিরিলেন।

সমস্ত রাত্রি মহাপ্রভুর কথা তাঁহার মনে হইতে লাগিল, আর বৃশ্চিক

দংশনের জ্বালা অনুভূত হইতে লাগিল। তাঁহার পাণ্ডিত্য-গর্ব চূর্ণ হইল, মনে মনে ভাবিলেন, আমি বৈষ্ণব হইয়া পাণ্ডিত্যের অভিমান করি, আমার মত মূর্খ আর কে আছে? মহাপ্রভু আমার মঙ্গলের জন্যই আমার এই অভিমান চূর্ণ করিয়াছেন। পর দিন প্রভাতে উঠিয়া বল্লভ ভট্ট মহাপ্রভুর নিকটে গেলেন এবং তাঁহার চরণ ধারণ করিয়া মিনতিপূর্বক কহিলেন—আমি অজ্ঞ, হীনমতি, তোমার নিকটে পাণ্ডিত্য-গর্ব করিয়াছিলাম। তাহার শাস্তিও আমি পাইয়াছি, তোমার কৃপায় আমার পাণ্ডিত্য-গর্ব দূর হইয়াছে। আমার অপরাধ ক্ষমা কর, আমি তোমার চরণে শরণ লইলাম।

মহাপ্রভু তাঁহাকে বহু সম্মান করিয়া বলিলেন—তুমি পণ্ডিত, মহাভাগবত। এত গুণ যাঁহার মধ্যে, তাঁহার চিত্তে অভিমান শোভা পায় না। শ্রীধর স্বামী ভাগবত ব্যাখ্যাতা, বৈষ্ণবদের গুরু, তাঁহাকে অবজ্ঞা করা তোমার মত পণ্ডিতের উচিত নহে। যাহা হউক, তোমার যে গর্ব দূর হইয়াছে, ইহাতে আমি পরম আনন্দিত। অভিমান ছাড়িয়া তুমি নিরন্তর কৃষ্ণ ভজনা কর, শ্রীকৃষ্ণ শীঘ্রই তোমার প্রতি কৃপা করিবেন।

বল্লভ ভট্ট কৃতকৃতার্থ হইয়া স্বগণ সহিত মহাপ্রভুকে নিজগৃহে নিমন্ত্রণ করিলেন, মহাপ্রভুও প্রসন্নচিত্তে সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। বল্লভ ভট্ট মহাপ্রভুর আদেশ পালন করিয়া শীঘ্রই পরমবৈষ্ণব কৃষ্ণভক্ত হইয়া উঠিলেন।

কিছুদিন পরে আর একজন সন্ন্যাসী সাধু নীলাচলে মহাপ্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। ইঁহার নাম রামচন্দ্র পুরী, শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য, মহাপ্রভুর গুরু ঈশ্বরপুরীর গুরুভাই। মহাপ্রভু তাঁহাকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করিলেন। কিন্তু রামচন্দ্রপুরীর অন্যান্য অনেক গুণ থাকিলেও, তিনি নিন্দুক স্বভাবের লোক ছিলেন, সন্ন্যাসীদের আচরণের ত্রুটি ধরিয়া বেড়ান তাঁহার একটি বদ অভ্যাস ছিল। মহাপ্রভুর নিকটে আসিয়া তাঁহার ত্রুটি অন্বেষণ করিতেও তিনি ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

জগদানন্দ নিমন্ত্রণ করিয়া রামচন্দ্রপুরীকে খাওয়াইলেন। রামচন্দ্রপুরী পরিতোষ সহকারে আকণ্ঠ ভোজন করিলেন এবং আহার শেষে জগদানন্দকে প্রসাদ পাইতে অনুমতি দিলেন। জগদানন্দ আহারে বসিলে রামচন্দ্রপুরী স্বহস্তে তাঁহাকে পরিবেশন করিয়া তাঁহাকে আহার করাইলেন। কিন্তু আহারের পর নিজেই বলিতে লাগিলেন, পূর্বে শুনিয়াছি, চৈতন্যের ভক্তেরা প্রচুর পরিমাণ আহার করে, এখন দেখিতেছি, সে কথা সত্য। সন্ন্যাসী এত খাইলে তাহার ধর্মনাশ হয়। জগদানন্দ অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন।

এইরূপে রামচন্দ্রপুরী সন্ন্যাসীদের আহারব্যবহারের ত্রুটির বিষয় সকলের নিকট নিন্দা করিয়া বেড়াইতেন। নীলাচলে থাকার সময় মহাপ্রভু ও তাঁহার ভক্তগণের নিন্দা করাই তাঁহার প্রধান কাজ হইয়া দাঁড়াইল। মহাপ্রভু কি খান,

কি করেন, কতটুকু নিদ্রা যান—এই সব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তিনি অনুসন্ধান করিতেন। মহাপ্রভুর সেবার জন্য চারি পণ মূল্যের মহাপ্রসাদ লাগিত। এই মহাপ্রসাদ মহাপ্রভু একা খাইতেন না, কাশীশ্বর, গোবিন্দ প্রভৃতি মহাপ্রভুর সেবকেরাও খাইতেন। বলা বাহুল্য, মহাপ্রসাদের সঙ্গে মিষ্টান্নাদিও যথারীতি থাকিত। রামচন্দ্রপুরী মহাপ্রভুর কোন গুণের মহিমা উপলব্ধি করিতে পারিলেন না, কিন্তু তাঁহার 'আহারের' দোষ খুঁজিয়া বাহির করিয়া নিন্দা করিতে লাগিলেন। বলিলেন, সন্ন্যাসী হইয়া মিষ্টান্ন ভক্ষণ করে, তাহার ইন্দ্রিয়সংযম কিরূপে হইবে? মহাপ্রভুকে রামচন্দ্রপুরী প্রত্যহ দেখিতে আসিতেন, মহাপ্রভু তাঁহাকে গুরুবুদ্ধিতে সম্মান করিতেন, পুরীও তাঁহাকে আশীর্বাদ করিতেন। কিন্তু অন্তরালে সর্বত্র তাঁহার নিন্দা করিয়া বেড়াইতেন। একদিন প্রাতঃকালে মহাপ্রভুকে দেখিতে আসিয়া রামচন্দ্রপুরী গৃহের মধ্যে যাইয়া দেখিলেন—কয়েকটি পিপীলিকা বেড়াইতেছে। অমনি সেই সুযোগ লইয়া রামচন্দ্রপুরী বলিলেন—কাল রাত্রিতে এই গৃহে মিষ্টান্ন ছিল, তাই পিপীলিকা বেড়াইতেছে; অহো, সন্ন্যাসীদের কি ইন্দ্রিয়-লালসা! এই বলিয়া রামচন্দ্রপুরী চলিয়া গেলেন।

রামচন্দ্রপুরী অন্তরালে নিন্দা করেন, ইহা মহাপ্রভু শুনিয়াছেন। এখন স্বকর্ণেই তাঁহার নিন্দা শুনিলেন। মহাপ্রভু অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া সেবক গোবিন্দকে ডাকিয়া বলিলেন—আজি হইতে আমার আহার কমাইয়া চার ভাগের এক ভাগ কর। তাহার বেশী দিলে, আমাকে আর এখানে দেখিতে পাইবে না। ভক্তগণ সকলে শুনিয়া পরম দুঃখিত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। সেবক গোবিন্দ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। কিন্তু মহাপ্রভুর সঙ্কল্প অটল, তিনি আহার কমাইয়া চার ভাগের এক ভাগ করিলেন। গোবিন্দ, কাশীশ্বর প্রভৃতি সেবকদের বলিলেন,—তোমরা অন্যত্র ভিক্ষা মাগিয়া খাও।

রামচন্দ্রপুরী শুনিলেন, মহাপ্রভু এইরূপে অর্ধাশন করিতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সেবক ও অন্যান্য ভক্তগণও অর্ধাশন করিতেছেন। রামচন্দ্রপুরী নিন্দা করিবার আর একটি সুযোগ পাইলেন। তিনি আর একদিন মহাপ্রভুর নিকটে আসিয়া বলিলেন—সন্ন্যাসীর ধর্ম ইন্দ্রিয়সেবা নহে, সে যেমন তেমন করিয়া উদর পূর্ণ করে। কিন্তু তাই বলিয়া অনাহারে বা অর্ধাহারে থাকাও সন্ন্যাসীর ধর্ম নহে, তাহা শুষ্ক কপট বৈরাগ্য মাত্র। সন্ন্যাসী যদি অনাসক্ত ভাবে দেহ-রক্ষার জন্য আহার করিয়া ভগবানের ভজনা করেন, তবেই তাঁহার সিদ্ধি লাভ হয়।

মহাপ্রভু সবিনয়ে কহিলেন—আমি তোমার শিষ্য, তোমার নিকট অজ্ঞ বালকতুল্য। তুমি যে আমাকে ধর্মশিক্ষা দিতেছ, এ আমার পরম ভাগ্য।

রামচন্দ্রপুরী কিছুদিন থাকিয়া নীলাচল হইতে অন্যত্র চলিয়া গেলেন। তখন মহাপ্রভুর ভক্তগণ আসিয়া তাঁহাকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া বলিলেন—রামচন্দ্রপুরীর কথায় আহার ত্যাগ করিয়া তোমার দেহক্ষয় হইতেছে। রামচন্দ্র-

পুরীর নিন্দা করাই স্বভাব, অতএব তাঁহার কথায় এরূপ করা তোমার উচিত নয়। আমরা সকলে মিলিয়া তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, তুমি এই অতিরিক্ত কৃচ্ছ্রতা—অনশন ও অর্ধাশন ত্যাগ কর। নতুবা আমরাও তোমার সঙ্গে সঙ্গে না খাইয়া থাকিব।

মহাপ্রভু ভক্তদের এই কথা শুনিয়া অগত্যা আহার কিছু বাড়াইলেন। এক চতুর্থাংশের স্থলে অর্ধভাগ আহার হইল। পূর্বে মহাপ্রভুর সেবার জন্য চারি-পণ কৌড়ির মহাপ্রসাদ লাগিত, এখন মাত্র দুইপণ কৌড়ির মহাপ্রসাদের ব্যবস্থা হইল। কেহ নিমন্ত্রণ করিলেও, এই দুইপণ কৌড়ির মহাপ্রসাদই আনিতে হইত, তাহার বেশী নহে। মহাপ্রভুর অগণিত ভক্ত—প্রত্যহই তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিতেন। তিনি সকলের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতেন না, করিতে পারিতেনও না। শেষে তিনি এক নিয়ম করিয়া সকলকে বলিলেন—যে 'লক্ষপতি', কেবল তাহার গৃহেই আমি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিব। বলা বাহুল্য মহাপ্রভুর এই "লক্ষপতি" অর্থ—"লক্ষ মুদ্রার মালিক" নহে; যিনি প্রত্যহ অন্ততঃ একলক্ষ হরিনাম জপ করিতেন, মহাপ্রভু তাঁহাকেই "লক্ষপতি" বলিতেন এবং এইরূপ "লক্ষপতির" গৃহেই কেবল তিনি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতেন।

শয়ন সম্বন্ধেও মহাপ্রভু এই সময়ে খুব কঠোরতা অবলম্বন করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু কাশীমিত্রের বাড়ীতে (ঐ বাড়ী এখনও আছে, উহার বর্তমান নাম 'রাধাকান্ত মঠ') যে কক্ষে থাকিতেন, তাহার নাম ছিল 'গম্ভীরা'—উড়িয়া ভাষায় গম্ভীরা অর্থ ভিতরের কক্ষ। সেই গম্ভীরার মেঝেতে অনাবৃত ভূমির উপরেই তিনি রাত্রে শয়ন করিতেন। কোনরূপ উপাধান বা শয্যা ব্যবহার করিতেন না। জগদানন্দ প্রভৃতি অন্তরঙ্গ ভক্তগণের মনে ইহাতে বড় কষ্ট হইত। একদিন জগদানন্দ অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছু সূক্ষ্ম বস্ত্র কিনিয়া আনিয়া তাহা গৈরিক রঙে ছোপাইলেন এবং তাহার ভিতর শিমুল তুলা ভরিয়া লেপ ও তোষক তৈরী করিলেন।

প্রভুর সেবক গোবিন্দের হাতে তাহা দিয়া বলিলেন, প্রভুর শয্যা ইহার দ্বারাই করিও। মহাপ্রভু শয়ন করিবার সময় সেই লেপ ও তোষক দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—এ কি? গোবিন্দ বলিলেন—আপনার শয়ন করিবার জন্য পণ্ডিত জগদানন্দ তৈরী করাইয়াছেন। মহাপ্রভু সেই তোষক ও বালিশ সরাইয়া রাখিতে বলিয়া ভূমিতেই শয়ন করিলেন। স্বরূপ গোস্বামী বলিলেন—এরূপ করিলে, পণ্ডিত মনে অত্যন্ত দুঃখ পাইবেন।

মহাপ্রভু বিরক্তচিত্তে বলিলেন—হ্যাঁ, সঙ্গে সঙ্গে একখানি খাটও আন, নহিলে ঐ শয্যা কিসে পাতিবে? জগদানন্দ কি শেষে আমাকে বিষয় ভোগ করাইতে চাহে? আমি সন্ন্যাসী মানুষ, ভূমিতে শয়নই আমার কর্তব্য। আমার উপাধান মুণ্ডিত মস্তক।

অবশেষে অনেক মান অভিমানের পর জগদানন্দ ও স্বরূপ গোস্বামী পরামর্শ করিয়া শুষ্ক কদলীপত্র চিরিয়া সেগুলি মহাপ্রভুর বহির্বাসে পুরিয়া বালিশ ও তোষক তৈরী করিলেন। মহাপ্রভু ভক্তদের মন রক্ষার্থ অবশেষে তাহার উপরে শয়ন করিতে সম্মত হইলেন।

মহাপ্রভু যাহাতে একটু সুখে থাকেন, সরল প্রকৃতির জগদানন্দের কেবল এই চেষ্টা। একবার তিনি নবদ্বীপে গিয়া শিবানন্দ সেনের নিকট হইতে এক কলসী সুগন্ধি চন্দনাদি তৈল লইয়া নীলাচলে আসিলেন। মহাপ্রভুর সেবক গোবিন্দকে সেই তৈল দিয়া বলিলেন—মহাপ্রভুর মস্তকে স্নানের পূর্বে ইহা মাখাইও, তাহা হইলে মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ থাকিবে। পরদিন মহাপ্রভুর নিকটে সেই চন্দনাদি তৈলের কলস রাখিতেই মহাপ্রভু কহিলেন—ইহা কে আনিয়াছে? গোবিন্দ কহিলেন—আপনার ব্যবহারের জন্য জগদানন্দ পণ্ডিত নবদ্বীপ হইতে বহুযত্ন করিয়া আনিয়াছেন। মহাপ্রভু শুনিয়া বলিলেন—সন্ন্যাসীর তৈল মাখিবারই অধিকার নাই, তাতে আবার সুগন্ধি তৈল। এই তৈল জগন্নাথকে দাও, মন্দিরের দীপাধারে এই তৈল জ্বলিলে পরম আনন্দ হইবে, জগদানন্দও ধন্য হইবেন। গোবিন্দ কিছু না বলিয়া তৈল উঠাইয়া রাখিলেন। কয়েক দিন পরে মহাপ্রভুকে বলিলেন—পণ্ডিত বড় সাধ করিয়া চন্দনাদি তৈল আনিয়াছেন, তুমি না মাখিলে তিনি মনে বড়ই কষ্ট পাইবেন। মহাপ্রভু ক্রুদ্ধচিত্তে বলিলেন—হ্যাঁ, এই ভাবেই জগদানন্দ প্রভৃতি আমাকে সন্ন্যাসধর্ম পালন করাইবে। তৈল আনিয়াছে, এখন একজন "মর্দনিয়া" রাখিতে বল। তাহা হইলেই সোনায় সোহাগা হইবে। সুগন্ধি তৈল মাখিয়া যখন পথে বাহির হইব, লোকে বলিবে 'ভণ্ড সন্ন্যাসী' যাইতেছে। জগদানন্দকে ডাকিয়া বলিলেন—আমি সন্ন্যাসী, তোমার তৈল গ্রহণ করিতে পারি না। তুমি জগন্নাথের দীপাধারে জ্বালিবার জন্য ঐ তৈল দান কর। তাহা হইলেই তোমার শ্রম সফল হইবে।

জগদানন্দের মনে বড় অভিমান হইল। তিনি চন্দনাদি তৈলের কলসী ঘর হইতে আনিয়া উঠানে সশব্দে ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন এবং গৃহে যাইয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন। জগদানন্দ এইরূপে দুই দিন উপবাস করিয়া থাকিলেন। তৃতীয় দিবসে মহাপ্রভু স্বয়ং তাঁহার গৃহদ্বারে গিয়া বলিলেন—জগদানন্দ, উঠ, আজ মধ্যাহ্নে তোমার এখানেই আমি প্রসাদ পাইব, তুমি রন্ধনাদি কর। মহাপ্রভুর এই আহ্বানের পর জগদানন্দ আর রাগ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। উঠিয়া স্নান ও রন্ধন করিয়া মহাপ্রভুর সেবার উদ্যোগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেদিন যতক্ষণ পর্যন্ত জগদানন্দ আহার না করিলেন, ততক্ষণ মহাপ্রভু নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। ভক্তগণের প্রতি মহাপ্রভুর এমনই অসীম স্নেহ ছিল, তাহাদের জন্য তিনি সর্বস্ব ত্যাগ করিতে পারিতেন।

২২

মহাপ্রভুর শেষ জীবন ও লীলাবসান

জীবনের শেষ কয়েক বৎসর মহাপ্রভু অধিকাংশ সময়ই ভগবৎপ্রেমে বিভোর হইয়া থাকিতেন;—বাহ্যজ্ঞানশূন্য সমাধিমগ্ন অবস্থায় তিনি মনে করিতেন, তিনি শ্রীরাধা, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। কৃষ্ণবিরহে রাধার মনে যে প্রকার উদ্বেগ ও আকুল উৎকণ্ঠার ভাব জাগিত, মহাপ্রভুর মধ্যেও সেই ভাব মূর্তিমান হইয়া উঠিত। অনেক সময় তিনি সেই ভাবে মত্ত হইয়া হাস্য, ক্রন্দন, বিলাপ প্রভৃতি করিতেন। বৈষ্ণব ভক্তগণ প্রভুর এই অবস্থার নাম দিয়াছেন "দিব্যোন্মাদভাব"। জীবনের শেষ কয়েক বৎসর এই "দিব্যোন্মাদভাব" ক্রমেই তাঁহার মধ্যে বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

মহাপ্রভু প্রায়ই নিজের শয়নকক্ষ গম্ভীরায় নিভৃতে বসিয়া কৃষ্ণ-বিরহে তন্ময় হইয়া থাকিতেন। রায় রামানন্দ ও স্বরূপ গোস্বামী ইঁহারা দুইজন কেবলমাত্র তাঁহার সংগী থাকিতেন। মহাপ্রভু তাঁহাদের দুইজনের নিকটে নিজের বিরহ বেদনা ব্যক্ত করিতেন, তাঁহাদের গলা ধরিয়া ক্রন্দন করিতেন অথবা কৃষ্ণগুণ গান করিতেন।

একদিন রাত্রিতে মহাপ্রভু স্বপ্ন দেখিলেন যে, তিনি শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়াছেন,—সেই ভাবে বিভোর হইয়া তিনি আনন্দসাগরে ডুবিয়া গেলেন। কিন্তু জাগিয়া উঠিয়া যখন জানিলেন যে, সে ভাব স্বপ্ন মাত্র, তখন তাঁহার মনে অত্যন্ত দুঃখ হইল। মহাপ্রভু সেই ভাবমত্ত অবস্থায় মন্দিরে জগন্নাথ দর্শন করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভুর জগন্নাথ দর্শন—সে এক অদ্ভুত ব্যাপার! গরুড়স্তম্ভের নিকট দাঁড়াইয়া দুই নেত্র দিয়া তিনি যেন জগন্নাথের রূপসুধা পান করিতেছেন—দর্শন করিয়া তাঁহার আর কিছুতেই তৃপ্তি হইতেছে না। এক জন উড়িয়া স্ত্রীলোকের জগন্নাথ দর্শনের আগ্রহ অত্যন্ত প্রবল। সে ভীড়ের মধ্যে দর্শনের সুযোগ না পাইয়া, অবশেষে মহাপ্রভুর কাঁধে এক পা দিয়া, আর এক পা গরুড়স্তম্ভে রাখিয়া তন্ময় চিত্তে জগন্নাথ দর্শন করিতে লাগিল। মহাপ্রভুর সেবক গোবিন্দ এই ব্যাপার দেখিয়া স্ত্রীলোকটিকে তিরস্কার করিয়া টানিয়া নামাইতে উদ্যত হইল। মহাপ্রভু ইঙ্গিতে তাহাকে নিষেধ করিয়া বলিলেন—গোবিন্দ, ইহাকে নামাইও না, এ মনের সাধে জগন্নাথ দর্শন করুক। ধন্য এই নারী, ধন্য ইহার ভগবানে প্রেম ও ভক্তি। ইহার একবিন্দু প্রেমও যদি আমি পাইতাম, তবে আমিও ধন্য হইয়া যাইতাম। আমি ইহার চরণ বন্দনা করি।

স্ত্রীলোকটি এই সময়ে বাহ্যজ্ঞান পাইয়া আস্তে-ব্যস্তে মহাপ্রভুর স্কন্ধ হইতে নামিয়া পড়িল।

একদিন মহাপ্রভুর কৃষ্ণবিরহে তন্ময় ভাব বড় প্রবল হইয়া উঠিল। স্বরূপ গোস্বামী ও রায় রামানন্দ অর্ধরাত্রি পর্যন্ত তাঁহার নিকটে থাকিয়া তাঁহাকে নানারূপে সান্ত্বনা দিলেন। অবশেষে একটু শান্ত হইলে তাঁহাকে "গম্ভীরায়" শয়ন করাইয়া তিন দ্বারে কপাট লাগাইয়া স্বরূপ গোস্বামী ও রায় রামানন্দ বিদায় গ্রহণ করিলেন। স্বরূপ গোস্বামী নিকটেই অপর কক্ষে শয়ন করিয়াছিলেন। শেষ রাত্রে তিনি উঠিয়া মহাপ্রভুর কোন সাড়াশব্দ না পাইয়া, 'গম্ভীরায়' গিয়া দেখেন যে মহাপ্রভু নাই! স্বরূপ গোঁসাই বিষম উদ্বিগ্ন হইলেন এবং অন্যান্য ভক্তগণকে জাগাইয়া মহাপ্রভুর সন্ধানে বাহির হইলেন। অনেক সন্ধানের পর, অবশেষে জগন্নাথ মন্দিরের সিংহদ্বারের সম্মুখে মহাপ্রভুকে বাহ্যজ্ঞানশূন্য অবস্থায় পাওয়া গেল। ভক্তেরা সকলে হরিনাম সঙ্কীর্তন করিয়া তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিলেন এবং অনেক কষ্টে তাঁহাকে গৃহে লইয়া আসিলেন।

আর একদিন মহাপ্রভু সমুদ্রে স্নান করিতে যাইবার সময়ে অদূরে চটক পর্বত দেখিয়া ভাবোন্মত্ত হইলেন। তাঁহার মনে হইল, এই চটক পর্বত বৃন্দাবনের গোবর্ধনগিরি, শ্রীকৃষ্ণ সেখানে বিরাজ করিতেছেন। এইরূপ মনে হইবামাত্র মহাপ্রভু সমুদ্রতীর দিয়া চটক পর্বতের দিকে ছুটিতে লাগিলেন। কিন্তু একে শরীর দুর্বল, তাহাতে ভাবোন্মত্ত অবস্থা, সুতরাং বেশী দূর যাইতে না পারিয়া সমুদ্রতীরে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়া গেলেন। স্বরূপ গোস্বামী, জগদানন্দ, গোবিন্দ, শঙ্কর প্রভৃতি ভক্ত ও সেবকগণ তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিয়া তাঁহাকে ধরিলেন। তাঁহারা উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম সঙ্কীর্তন করিতে থাকিলে, তবে মহাপ্রভুর চেতনা হইল। এই সময়ে পুরী গোঁসাই ও ভারতী গোঁসাই সংবাদ পাইয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহাপ্রভু বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া পাইয়া তাঁহাদিগকে দেখিয়া লজ্জিত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনারা এতদূরে আসিয়াছেন কেন? পুরী গোঁসাই ও ভারতী গোঁসাই রহস্য করিয়া উত্তর দিলেন—তোমার নৃত্য দেখিবার জন্য আসিয়াছি।

তার পর সকলে মিলিয়া সমুদ্রস্নান করিয়া গৃহে ফিরিলেন।

জ্যোৎস্না রাত্রিতে মহাপ্রভুর তন্ময়ভাব অত্যন্ত প্রবল হইত। পুরীর সমুদ্রতীরে ও তাহার নিকটে যে সব "টোটা" বা উদ্যান আছে, তিনি সমস্ত-রাত্রি ভক্তগণসহ সেই সব স্থানে কীর্তন করিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার মনে হইত, এ বৃন্দাবনের বনভূমি এবং তিনি সেখানে শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছেন।

রাত্রিতে বিরহ, তন্ময়ভাব বা দিব্যোন্মাদ অবস্থা তাঁহার মধ্যে ক্রমেই প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল। তিনি সারারাত্রি ঘুমাইতেন না, জাগিয়া বসিয়া কৃষ্ণনাম জপ বা সংকীর্তন করিতেন। কখন কৃষ্ণবিরহে উন্মত্তবৎ ঘরের দেয়ালে বা মেঝেতে মুখ ঘসিতেন। কখন কখন রাত্রে ঘর হইতে বাহির হইয়া জগন্নাথ মন্দিরের দিকে বা সমুদ্রতীরে যাইতেন।

একদিন মহাপ্রভু শরৎকালের জ্যোৎস্না রাত্রিতে কৃষ্ণনাম গান করিতে করিতে সমুদ্রতীরে উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছিলেন। কখন কখন ভাবের আবেগে নৃত্য করিতেছিলেন। এমন সময় 'আই টোটা' নামক উদ্যান হইতে তিনি সমুদ্র দেখিতে পাইলেন। শরতের নির্মল জ্যোৎস্নায় সমুদ্র ঝলমল করিতেছে, যতদূর দৃষ্টি চলে, সেই অনন্তবিস্তার বারিরাশি চন্দ্রকিরণে যেন স্নান করিতেছে।

চন্দ্রকান্ত্যে উথলিল তরঙ্গ উজ্জ্বল।
ঝলমল করে যেন যমুনার জল॥

সেই অপূর্ব শোভা দেখিয়া মহাপ্রভুর ভাবোন্মত্ত চিত্তে উদয় হইল—এ যেন চন্দ্রালোকিত যমুনার জল, শ্রীকৃষ্ণ সেখানে লীলা করিতেছেন। এইরূপ ভাবিয়া মহাপ্রভু ছুটিয়া গিয়া সমুদ্রের জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই সময়ে কোন ভক্ত বা সেবক মহাপ্রভুর সঙ্গে ছিল না। সুতরাং তাঁহার এই সমুদ্রে পতন কেহই দেখিতে পাইল না।

মহাপ্রভু সমুদ্রের জলে ডুবিয়া কণারকের দিকে তরঙ্গ-মুখে ভাসিয়া চলিলেন। তাঁহার তখন বাহ্যজ্ঞান শূন্য অবস্থা, মনে হইতেছে যে, যমুনার জলে শ্রীকৃষ্ণকে তিনি পাইয়াছেন। সুতরাং সমুদ্রের জল হইতে উঠিবার কোন চেষ্টাই তিনি করিলেন না।

এদিকে স্বরূপ গোস্বামী, জগদানন্দ, গোবিন্দ প্রভৃতি মহাপ্রভুকে কোথাও দেখিতে না পাইয়া অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইলেন। জগন্নাথ মন্দিরে, উদ্যানে বা সমুদ্রতীরে—যেখানে যেখানে মহাপ্রভুর যাওয়া সম্ভব—কোথাও তাঁহাকে পাওয়া গেল না। কেহ কেহ চটক পর্বতের দিকে ধাবিত হইলেন, আবার একদল স্বরূপ গোস্বামীর নেতৃত্বে কণারকের দিকে চলিলেন। সকলেরই চিত্তে আশঙ্কা হইল, মহাপ্রভু বুঝি সত্যই তাঁহাদের চিরদিনের মত ত্যাগ করিয়া গেলেন।

স্বরূপ গোস্বামীর দল কণারকের দিকে উদ্বিগ্ন চিত্তে চলিয়াছেন, কিছুদূর গিয়া তাঁহারা দেখিলেন—একজন জালিয়া জাল কাঁধে করিয়া আসিতেছে,—আর "হরি হরি" বলিয়া কখন হাস্য, কখন ক্রন্দন, কখন নৃত্য করিতেছে! তাহার এই অবস্থা দেখিয়া স্বরূপ গোঁসাইয়ের মনে সন্দেহ হইল। তিনি

জালিয়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন—ভাই, তোমার এদশা কেন হইল বল তো? তুমি কি এদিকে কোন লোক দেখিয়াছ?

জালিয়া বলিল—জীবিত মনুষ্য কাহাকেও দেখি নাই, তবে সমুদ্রের জলে জাল ফেলিয়া টানিয়া তুলিতেই এক মৃতদেহ উঠিয়া আসিল। আমি প্রথমে বড় মাছ মনে করিয়া খুশী হইয়াছিলাম, কিন্তু মৃতদেহ দেখিয়া মনে ভয় হইল। তাড়াতাড়ি জাল হইতে সেই মৃতদেহ নামাইতেই তাহার স্পর্শ আমার দেহে লাগিয়া গেল। তাহার পর হইতেই আমার এই দশা হইয়াছে, আমি কেবলই 'হরি হরি' বলিয়া নৃত্য করিতেছি। সম্ভবতঃ কোন অপদেবতা সেই মৃতদেহের মধ্যে ছিল। সেই মৃতদেহ পাঁচ সাত হাত দীর্ঘ, অচেতন—কিন্তু মনে হয় মাঝে মাঝে 'গোঁ' 'গোঁ' শব্দ করিতেছে। আমি নির্জন রাত্রে সমুদ্র-তীরে মাছ ধরিয়া বেড়াই, কোন দিন ভূতের ভয় করে না, 'নৃসিংহ' নাম স্মরণ করিলেই সব ভয় দূর হয়। কিন্তু এই ভূতের প্রভাব 'নৃসিংহ' নাম লইতে আরো বাড়ে, আমার আরো বেশী 'হরি হরি' বলিতে ইচ্ছা হয়। হায়, হায়, আমার কি হইবে, আমি মরিয়া গেলে আমার 'স্ত্রী পুত্র' বাঁচিবে কিরূপে? তারপর একটু থামিয়া স্বরূপ গোঁসাই প্রভৃতির দিকে চাহিয়া বলিল—তোমরাও ওদিকে যাইও না, গেলে অত্যন্ত বিপদে পড়িবে, সেই ভূত ঘাড়ে চাপিয়া বসিবে।

স্বরূপ গোস্বামী জালিয়াকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন—তোমার কোন ভয় নাই, ভাই! আমি ওঝা, ভূত ছাড়াইতে জানি। এই বলিয়া জালিয়ার মাথায়—তিন চাপড় মারিয়া তিনি মন্ত্র পড়িতে লাগিলেন। জালিয়ার মন সুস্থির হইল, তাহার সাহস ফিরিয়া আসিল। স্বরূপ গোস্বামী তখন তাঁহাকে বলিলেন—ভাই, তুমি যাহাকে দেখিয়াছ, সে ভূত নয়, তিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভু। প্রেমাবেশে সমুদ্রের জলে পড়িয়া গিয়াছেন, তাঁহাকেই তুমি জালে উঠাইয়াছ এবং তাঁহার স্পর্শেই তোমার এই 'দশা' হইয়াছে। তুমি মহা-ভাগ্যবান্।

জালিয়া শুনিয়া মহা আনন্দিত হইল। তারপর সকলে জালিয়াকে সঙ্গে করিয়া যেখানে মহাপ্রভু সমুদ্রতীরে পড়িয়াছিলেন, সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। মহাপ্রভুর অবস্থা দেখিয়া ভক্তগণের মনে অত্যন্ত কষ্ট হইল। তাঁহার দীর্ঘ দেহ অচেতন অবস্থায় সমুদ্রতীরে পড়িয়া আছে। তাহাতে সমুদ্রের বালি লাগিয়াছে, চর্ম যেন শিথিল হইয়া গিয়াছে। সেই অবস্থায় অতদূর হইতে তাঁহাকে গৃহে বহন করিয়া আনা অসম্ভব। ভক্তগণ ভিজা কৌপীন ছাড়াইয়া মহাপ্রভুর দেহে নূতন কৌপীন ও বহির্বাস পরাইলেন, অঙ্গের বালি ঝাড়িয়া শোয়াইলেন। তার পর সকলে মিলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ভগবানের নাম সংকীর্তন করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ নামকীর্তনের পর মহাপ্রভুর চেতনা হইল, তিনি

"হরিধ্বনি" করিয়া উঠিয়া বসিলেন। ভক্তগণকে বলিলেন—তোমরা আমাকে কেন চেতন করিলে? আমি অন্তর্জগতে রাধাকৃষ্ণ লীলা দেখিয়া পরমানন্দ উপভোগ করিতেছিলাম।

ভক্তগণ কহিলেন—প্রভু, তুমি যে সমুদ্রজলে ভাসিতে ভাসিতে প্রায় কণারকের নিকটে চলিয়া আসিয়াছ।

মহাপ্রভু শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর, ভক্তগণের সঙ্গে তিনি গৃহে ফিরিলেন।

* * *

ইহার পর কোন বৈষ্ণবগ্রন্থে মহাপ্রভুর জীবনী সম্বন্ধে আর কিছু পাওয়া যায় না।

মহাপ্রভু যে কিরূপে লীলাসংবরণ করিয়াছিলেন, তাহার সঠিক বিবরণ কোন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয় নাই। মনে হয়, বৈষ্ণব ভক্ত ও গ্রন্থকারগণ এই পরম গূঢ় বেদনার কথা ইচ্ছা করিয়াই অপ্রকাশ রাখিয়াছেন। মহাপ্রভুর তিরোধান সম্বন্ধে বর্তমানে কয়েকটি মত প্রচলিত আছে :—

(১) তিনি একদিন জগন্নাথ মন্দির দর্শন করিতে যাইয়া অকস্মাৎ অন্তর্ধান করিয়াছিলেন। (২) গুণ্ডিচা মন্দিরে তাঁহার দেহত্যাগ হইয়াছিল। (৩) সমুদ্রে পতনের ফলেই তাঁহার দেহত্যাগ হইয়াছিল, ইহার পর আর তিনি চেতনা লাভ করেন নাই।

সমস্ত দিক বিবেচনা করিয়া, আমাদের মনে হয়, শেষোক্ত মতই ঠিক। সমুদ্রতীরে স্বরূপ গোস্বামী প্রভৃতি যখন মহাপ্রভুকে পাইলেন, তখন তিনি সম্পূর্ণ অচেতন। সেই চেতনা আর ফিরিয়া আসে নাই।

মহাপ্রভু সমস্ত জগৎ-সংসারকে কাঁদাইয়া এইরূপে ৪৮ বৎসর বয়সে লীলা-সংবরণ করিলেন। মাত্র ৪৮ বৎসর তিনি ধরাধামে ছিলেন,—কিন্তু এই অল্পায়ু জীবনেই পৃথিবীতে তিনি যে যুগান্তরের সূচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহার ফল অনন্তকালব্যাপী। তাঁহার প্রেম-ধর্ম মানুষকে একদিন যথার্থ শান্তি ও মুক্তির পথ প্রদর্শন করিবে।

শ্রীগৌরাঙ্গ বাঙ্গলাদেশ ও বাঙ্গালী জাতির গৌরব, তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ কৌস্তুভ মণি। ষোড়শ শতাব্দীতে মহাপ্রভুর প্রভাবে যে সভ্যতা বাঙ্গালী সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা এখনও আমাদিগকে পথ প্রদর্শন করিতেছে। বাঙ্গালীর সাহিত্য, ধর্ম, সমাজ মহাপ্রভুর প্রচারিত আদর্শ দ্বারা যে রূপে প্রভাবিত হইয়াছে, এমন আর কখনও কিছুতেই হয় নাই। সর্বোপরি,—

বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য যেন মহাপ্রভুর মধ্যে মূর্তিমান্ হইয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গালী ভাবপ্রবণ, কোমল-হৃদয়, আবেগময়, আদর্শবাদী জাতি,—মহাপ্রভুর জীবন ও তাঁহার প্রবর্তিত প্রেমধর্মে সেই সমস্তই বিচিত্ররূপে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে। মহাপ্রভুর জীবনী আলোচনা করিলে সকলেই এ কথা উপলব্ধি করিতে পারিবেন ও বাঙ্গালী কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া বলিবেন :—

বাঙ্গালী-হৃদয়-অমিয়া ছানিয়া
নিমাই লভিছে কায়া।

॥ সম্পূর্ণ ॥